

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

সূচীপত্র

সত্যনিষ্ঠায় অনন্য নেতাজী-চরিত্র*

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। মহাবরেণ্য মহাপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবসে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া আমি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ। সুভাষচন্দ্রের জীবনকাহিনী এত বিচিত্র, তাহাতে এত বর্ণের সমাবেশ, এত আলো-আঁধারির রহস্য যে একটি প্রবন্ধে সে বিস্ময়কর ঐশ্বর্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি লইয়াই এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব। সে বৈশিষ্ট্য—তাঁহার চারিত্রিক সাধুতা, তাঁহার নির্মল সততা, ইংরেজী ভাষায় বলিলে বলিতে হয় তাঁহার integrity; তিনি জীবনে যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা শত দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও ত্যাগ করেন নাই। সত্যের প্রতি এই অবিচল নিষ্ঠাই সুভাষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষ সত্যের স্বরূপ কি তাহা সহজে নির্ণয় করিতে পারে না। তপস্বীরাই পরম সত্যের, absolute truth-এর—স্বরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম। সাধারণ মানুষের নিকট সত্য মানেই আপেক্ষিক সত্য—relative truth—তাহা বহুরূপীর মতো—তাহা বার বার বর্ণ পরিবর্তন করে। বড় বড় দার্শনিকরাও এই সত্যের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্যের এই বিবিধ রূপ সুভাষচন্দ্রকেও বারবার বিভ্রান্ত করিয়াছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই যে যখনি যেটাকে তিনি সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তখনই তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াছেন—কিন্তু যখনই বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে গিয়া সে সত্যের মেকিত্ব বা অসম্পূর্ণতা ধরা পড়িয়াছে তখনই তাহা ত্যাগ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন—"If we accept an idea we have to give

ourselves wholly to it and allow it to transform our entire life: A light brought into a dark room will necessarily illuminate every portion of it—"[1]

এই লাইটের সন্ধানই তিনি সারাজীবন করিয়াছেন এবং এই সন্ধানে তিনি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিজ্ঞানীসুলভ। Experiment করিতে করিতে বিজ্ঞানীরা যখন উপলব্ধি করেন যে নূতন কোন আবিষ্কারের আলোকে পুরাতন আবিষ্কার মিথ্যা হইয়া গিয়াছে তখন সে পুরাতন আবিষ্কারকে ত্যাগ করিতে তাঁহারা দ্বিধা করেন না। সুভাষচন্দ্রের জীবনেও ইহা লক্ষ্য করি। বাল্যকালে তিনি মোটেই সপ্রতিভ ছিলেন না, অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং লাজুক বালক ছিলেন তিনি—আত্মচরিতে নিজেকে তিনি introvert বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই লাজুক অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বটি কিন্তু বাল্যকাল হইতেই মনে মনে সদা-জাগ্রত এবং সদা-উৎসুক ছিলেন, অহরহ সন্ধান করিতে-ছিলেন এমন একটা আদর্শের সত্য রূপ যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে জীবন সার্থক হইয়া যাইবে। ছেলেবেলায় তাঁহাকে সাহেবী স্কুলে পড়িতে হইয়াছিল। সে স্কুলে ভাল ছেলে ছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে তিনি এরূপ কোন উচ্চ আদর্শের সন্ধান পান নাই। সেখানে তিনি স্বস্তিই পাইতেন না। সেখানে সাহেবী আমলের বর্ণ-বৈষম্য তাঁহার মনকে বিষাইয়া তুলিত। তিনি অনুভব করিতেন যে সাহেবের ছেলেরা এবং এদেশের ছেলেরা আলাদা জগতের লোক। ভলান্টিয়ার কোরে রাইফেল কাঁধে করিয়া Anglo-Indian ছেলেদের প্রবেশাধিকার আছে ভারতীয় ছেলেদের নাই। Anglo-Indian ছেলেদের সহিত প্রায়ই মন কষাকষি ও রেষারেষি হইত—তাহাদের সহিত তিনি স্নেহের বা প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন নাই। যদিও তিনি আত্মজীবনীতে উক্ত সাহেবী স্কুলের হেডমাষ্টার মিষ্টার ইয়ংয়ের এবং মিসেস ইয়ংয়ের প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের আচরণে তিনি কোনও বৃহৎ আদর্শের সন্ধান পান নাই।

1. An Indian Pilgrim: An unfinished Autobiography & Collected letters 1897-1921, p. 18.

বরং এই কথাই বারবার তাঁহার মনে হইয়াছে যে ইংরেজরা আমাদের আত্মীয় নহেন। সাহেবী স্কুল হইতে পড়া শেষ করিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন কটকের Ravenshaw কলেজিয়েট স্কুলে। সেইখানে গিয়াই প্রথমে তিনি সেই সুধার আস্বাদ পাইলেন যাহার জন্য মনে মনে তিনি পিপাসিত ছিলেন। An Indian Pilgrim এ লিখিয়াছেন—যে এই স্কুলে তিনি অনুভব করিলেন—"that I was worth something and was not an insignificant creature।"[1] এই অনুভূতিই তাঁহাকে সেই মনুষ্যত্ব-মর্যাদার স্বাদ দিল যাহার জন্য তিনি মনে মনে আকুল হইয়া ছিলেন। তাঁহার চিত্ত বিকশিত হইয়া উঠিল। স্কুলে তাঁহাকে ঘিরিয়া একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু গোষ্ঠীও রূপ পরিগ্রহ করিল। স্কুলের হেডমাষ্টার বেণীমাধব দাসকে দেখিয়া তিনি অনুভব করিলেন—'এই তো সেই ব্যক্তি যাঁহাকে এতদিন আমি সন্ধান করিতেছি।' An Indian Pilgrim গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"I felt what I should now call an irresistible moral appeal in his personality. Up till then I had never experienced what it was to respect a man. But for me to see Benimadhab Das was to adore him."[2]

এই শিক্ষকের মহৎ আদর্শ এবং বিরাট ব্যক্তিত্ব কিশোর সুভাষচন্দ্রের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া দিল। বেণীমাধব দাস কটক স্কুলে বেশী দিন থাকেন নাই, অন্যত্র বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তাঁহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিয়াছিলেন তিনি। গুরুর নিকট হইতে তিনি নির্দেশ পাইয়াছিলেন—'প্রকৃতিকে ভালবাস, প্রকৃতির রহস্যময় বৈচিত্র্য তোমার সৌন্দর্যবোধ এবং নীতিবোধ উদ্বুদ্ধ করুক।' সুভাষচন্দ্র কিছুকাল নিষ্ঠাভরে এ নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন। খেলার মাঠে না গিয়া তিনি নদীর ধারে, পাহাড়ের উপর নির্জন প্রান্তরে মনোরম সূর্যাস্তের মহিমায়, জ্যোৎস্নায়, অন্ধকারে সেই আনন্দময় সত্যকে অনুভব করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন যাহা Words-

1. An Indian Pilgrim, p. 26.
2. Ibid, pp 28-9.

worth, Shelley, Keats, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্পর্শে পৃথিবীর সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ছিল না এবং তিনি ভণ্ডও ছিলেন না। যাহা তিনি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাহাকে গ্রহণ করিতে তিনি সর্বদাই ইতস্ততঃ করিয়াছেন। শিক্ষক বেণীমাধব দাসের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা চিরকাল অটুট ছিল, কিন্তু তাঁহার নির্দেশকে তিনি জীবনের পাথেয় রূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আত্মজীবনীতে (An Indian Pilgrim) তিনি লিখিয়াছেন "Nature worship was elevating and therefore helpful to a certain point, but it was not enough. What I required and what I was unconsciously groping after was a central principle which I could use as a peg to hang my whole life on and a firm resolve to have no other distractions in life."[1]

এই 'peg'-এর সন্ধান তিনি সারাজীবন করিয়াছেন। এ জন্য তিনি পথ হইতে পথান্তরে মত হইতে মতান্তরে উপনীত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। খুব ছেলেবেলায় তিনি পিতামাতার বাধ্য ছিলেন, পিতামাতার আদেশ অমান্য করা অন্যায় মনে করিতেন। সুভাষচন্দ্রের পিতামাতা চাহিতেন না যে বাড়ির ছেলেরা বাহিরের ছেলেদের সঙ্গে মিশুক। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের দাদারা এবং কাকারা লুকাইয়া বাহিরের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতেন। সুভাষচন্দ্র এটা পছন্দ করিতেন না। তিনি বাড়িতেই থাকিতেন এবং বাগানের কাজ করিতে ভালবাসিতেন। অনেক সংস্কৃত শ্লোকও মুখস্থ করিতেন তখন। এইটি তাঁহার প্রিয় শ্লোক ছিল—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা।

তাঁহার এই মনোভাব ছিল যখন তিনি সাহেবী স্কুলে পড়িতেন। কিন্তু স্বদেশী স্কুলে আসিয়া তিনি যখন একটি বন্ধু-গোষ্ঠী গঠন করিলেন এবং সেই বন্ধু-গোষ্ঠীর সহায়তায় যখন সমাজ-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত

1. An Indian Pilgrim, p. 2.

করা কর্তব্য মনে করিলেন, যখন মুষ্টি-ভিক্ষা করা কলেরা এবং বসন্ত রোগীর সেবার জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়া তাঁহার নিকট বিবেকসম্মত অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া মনে হইল তখন পিতামাতার অসন্তোষ বা অনিচ্ছাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না। নব-আবিষ্কৃত আদর্শের প্রেরণায় পিতামাতার মনে কষ্ট দিয়া নিজেও তিনি কম কষ্ট পান নাই। জীবনে বারবার তাঁহাকে পিতামাতার অবাধ্য হইতে হইয়াছে। কারণ, যে আত্ম-ত্যাগের আদর্শে বারংবার তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন সে আদর্শের প্রবল প্লাবনে পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিজের স্বার্থ, নিজের ভবিষ্যৎ সবই খড়কুটার মত ভাসিয়া গিয়াছে। আত্মত্যাগমূলক স্বার্থ-লেশহীন আদর্শ লাভই সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। সারাজীবন তিনি সেই মহা-মন্ত্রের প্রেরণার জন্যই উন্মুখ উৎসুক হইয়াছিলেন যে মন্ত্র নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন জ্যোতির মতো তাঁহার মনের সংশয় অন্ধকার দূর করিয়া দিবে—যে মন্ত্রের সাধন করিবার জন্য শরীর পাতন করিলেও জীবন ধন্য হইবে, যে মন্ত্র ধ্রুবতারার মতো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সংসার সমুদ্রে তাঁহাকে অভ্রান্ত পথের নির্দেশ দিবে, সেই মন্ত্র যে গুরুর মুখ হইতে উচ্চারিত হইবে—সে গুরু কোথায়? বেণীমাধব দাস তাঁহার জীবনে এ গুরুর স্থান পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এ গুরু সহসা একদিন আবির্ভূত হইলেন অমূর্ত রূপে—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর পাতায়। জীবনের সন্ধিক্ষণে তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের গৃহে বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, রোমাঞ্চিত হইয়া তিনি বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণী পাঠ করিয়াছিলেন—"হে ভারত এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিও না

তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না নীচজাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটি-মাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ,ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর,ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী,বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ,ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।…" যে মন্ত্রের সন্ধান তিনি করিতেছিলেন সে মন্ত্র অবশেষে তিনি পাইয়া গেলেন। আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"I was thrilled to the marrow of my bones."[1] তাঁহার পরবর্তী জীবনে যে চরিত্রবল বজ্রকঠোর শায়কের মতো আদর্শের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অনিবার্য গতিতে ধাবিত হইয়াছিল সে চরিত্রবলের প্রথম ও প্রধান উপাদান দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠও সে শক্তিকে আরও একমুখী করিয়াছিল। আনন্দমঠের উপক্রমণিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্র যে সুরে তাঁহার মহাকাব্যকে বাঁধিয়াছেন সেই সুরও সুভাষ-চন্দ্রের আদর্শের সুরে মিশিয়া গিয়াছিল। আনন্দমঠের উপক্রমণিকা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"সেই অন্তশূন্য অরণ্য মধ্যে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল,—আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল ; তখন কে বলিবে যে এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

1. An Indian Pilgrim, p. 32.

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল।

তখন উত্তর হইল—"তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল—"পণ আমার জীবন সর্বস্ব"

প্রতিশব্দ হইল—"জীবন তুচ্ছ : সকলেই দিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি"

সুভাষচন্দ্রের জীবনে বরণীয় স্মরণীয় ঐতিহাসিক কীর্তির প্রেরণার উৎস এই একাগ্র নিঃস্বার্থ দেশভক্তি। এই ভক্তিকে দৃঢ়তর করিয়াছে গীতার সেই অমর শ্লোক—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থনৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

আর উৎসাহিত করিয়াছে উপনিষদের সেই সঞ্জীবনী বাণী 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'।

এই 'বরান্'—জীবনের এই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি যে কি তাহা নির্ণয় করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সহজ হয় নাই। নানা পথে চলিয়া নানা experiment করিয়া বিবিধ সন্দেহ দোলায় দুলিয়া অবশেষে তিনি নিজের মতো করিয়া এই 'বরান'কে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীও সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিলেন। সে উপদেশের সারমর্ম—ভগবানকে, সত্যকে, অপরোক্ষ করাই মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য। এ লক্ষ্যে পঁহুছিবার বহু পথ আছে কিন্তু প্রকৃত পথ নিজেকেই আবিষ্কার করিতে হইবে গুরুর সাহায্যে, ঐকান্তিক আগ্রহের দ্বারা, যোগের সহায়তায়। কামিনী-কাঞ্চন বিষবৎ ত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়বাসনা-হীন ত্যাগী না হইলে সার সত্যকে জীবনে অপরোক্ষ করা যায় না। অল্প বয়স হইতেই তিনি এই সার সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করিবার জন্য ঘরে লুকাইয়া ধ্যান করিয়াছেন এবং এজন্য সকলের নিকট হাস্যাস্পদও হইয়াছেন। এজন্য তিনি বন্ধুদের সহিত বাহিরে চলিয়া গিয়া ধর্ম সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়াছেন, এজন্য পিতামাতারও বিরাগ-ভাজন

হইয়াছেন। কিন্তু সার সত্যের আকর্ষণে তাঁহার চিত্ত তখন উন্মুখ, মহাশক্তি জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তখন তিনি ব্যাকুল। তাঁহার এই পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের এবং মানসিকতার বর্ণনা তিনি আত্মজীবন চরিতে দিয়াছেন :

"I was rapidly changing and was no longer the goody-goody boy afraid of displeasing his parents. I had a new ideal now which had inflamed my soul—to effect my own salvation and to serve humanity by abandoning all worldly desires and breaking away from all undue restraints. I no longer recited Sanskrit verses inculcating obedience to one's parents ; on the contrary I took to verses which preached defiance."[1] এই সময় তাঁহার প্রিয় শ্লোক ছিল—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥

এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। "To effect my own salvation and to serve humanity by abandoning all worldly desires and breaking away from all undue restraints"—এই বাক্যটি বিশেষ করিয়া লক্ষণীয়। আদর্শের নাগাল পাইবার জন্য তিনি কী না করিয়াছেন। হিন্দুধর্মে যাহাকে মুক্তি বলে সে মুক্তি—সেই salvation—তিনি জীবনে পান নাই, কিন্তু তাহার জন্য বিবিধ প্রয়াস তিনি করিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর সন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী শহরে গিয়া বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোমত গুরুর সন্ধান পান নাই। যে দুই একজন সন্ন্যাসীকে তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল, তাঁহাদের উপদেশও তিনি সর্বতোভাবে পালন করিতে পারেন নাই, কারণ সে সব উপদেশ তাঁহার মনের সহিত খাপ খায় নাই। একজন বলিয়াছিলেন—আমিষ আহার করিও না, প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া পিতাকে এবং মাতাকে প্রণাম

1. An Indian Pilgrim p. 35.

করিবে। বাড়ির লোকের উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া কিছুদিন তিনি এ উপদেশ পালনও করিয়াছিলেন, কিন্তু এসব বাহ্যিক আচরণ পালন করিয়া আকাঙ্ক্ষিত সুধার আস্বাদ তিনি পাইলেন না। সেজন্য কিছুকাল নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া তিনি গুরু-অন্বেষণের পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আত্মানুসন্ধানের পথ কিন্তু ছাড়েন নাই। তিনি নিজে দর্শনের ছাত্র ছিলেন। বিদেশের Spencer, Hartmann, Bergson, Hegel, এদেশের সাংখ্য, বেদান্ত, বৈষ্ণব শাস্ত্র, তন্ত্র, সবই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তবু তিনি সুনিশ্চিতভাবে নিজেকে কোন আধ্যাত্মিক মতবাদের সহিত যুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে একটি পত্রে লিখিয়াছেন—"In one of your letters, you asked me about my attitude towards Shiva —or something to the effect. To be quite frank, I am torn this side and that,—between my love for Shiva, Kali and Krishna. Though they are fundamentally one—one does prefer one symbolism to another. I have found that my moods vary—and according to my prevalent mood I choose one of the three forms—Shiva, Kali and Krishna. Of these three again, the struggle is between Shiva and Shakti. Shiva, the ideal Yogi, has a fascination for me and Kali, the mother also makes an appeal to me You see, of late (i. e. for the last four or five years) I have become a believer in Mantra-Shakti, by which I mean that certain Mantras have an inherent Shakti Prior to that I had the ordinary rationalistic view, namely that Mantras are like symbols and they are aids to concentration. But my study of Tantra philosophy gradually convinced me that certain Mantras had an inherent Shakti and that each mental constitution was fitted for a particular Mantra Since then, I have tried my best to find out what my mental constitution is like and which Mantra

I would be suited for. But so far I have failed to find that out because my moods vary and I am sometimes a Shaiva, sometimes a Shakta and sometimes a Vaishnava. I think that it is here that a Guru becomes useful......"

কিন্তু এ রকম গুরু তিনি পান নাই। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনে তাই তিনি চির-সন্ধানীই থাকিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু দিলীপ কুমার তাঁহার মধ্যে যে 'mystic'কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে 'mystic'-এর অস্তিত্ব হয়তো ছিল কিন্তু তিনি কখনও প্রকাশ্য কোনও বিশেষ ধর্মমতের সহিত নিজেকে জড়িত করেন নাই—যদি করিতে পারিতেন তাহা হইলে এদেশে তাঁহার খুব সুবিধাই হইত। মহাত্মা গান্ধী এ দেশে জনসাধারণের চিত্তে সাড়া তুলিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক নিপুণতার জন্য ততটা নহে যতটা তাঁহার সাধুত্বের জন্য। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সাধুতা, সততা ভিন্ন প্রকারের ছিল—যে ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত তাহাকে লইয়া প্রকাশ্যে তিনি কখনও টানাটানি করেন নাই। তিনি নিঃস্বার্থ সমাজ-সেবাকেই 'যোগ' বলিয়া মনে করিতেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন—'Social service was an integral part of Yoga and it meant not merely relief to the halt, the maimed and the blind, but national reconstruction on modern lines." যিনি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম অসঙ্কোচে উচ্চকণ্ঠে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়াছিলেন, যাঁহার বাণী একদা অগ্নিযুগের বীরগণকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক সেই নির্ভীক দেশ-নেতা সহসা যে প্রেরণায় Divine Life-এর সন্ধানে পণ্ডিচেরীর আশ্রম গহনে তপস্যা-মগ্ন হইয়া অবশেষে শ্রীঅরবিন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন সে প্রেরণা সুভাষচন্দ্র পান নাই। একথা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই তিনি। যাহা তাঁহার নিঃসংশয় উপলব্ধির বাহিরের জিনিস, যাহা ছায়া-ছায়া ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট, তাহাকে তিনি জীবনের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেন নাই, এইখানেই তাঁহার সততার ঔজ্জ্বল্য। গ্রহণ করিলে হয়তো তাঁহার অনেক কষ্ট লাঘব হইত। জীবনের পথ

সুগম হইত কিন্তু তিনি সুবিধাবাদী ছিলেন না—এইখানেই তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব। বিবেকানন্দের এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব তাঁহার জীবনে সর্বাধিক আলোকপাত করিয়াছিল, কিন্তু শঙ্করাচার্যের যে অদ্বৈতবাদ বিবেকানন্দের চেতনায় ভাস্বর সত্যরূপে প্রতিভাত সুভাষচন্দ্রের জীবনে তাহা সত্যের স্পষ্টতায় উপলব্ধিরূপে মূর্ত হইয়া ওঠে নাই। যদিও তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে বিবেকানন্দ যে বেদান্ত ধর্ম প্রচার করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, কারণ—"It was based on a national philosophy, on the Vedanta, and his conception of Vedanta was not antagonistic, but was based on scientific principles", যদিও তিনি লিখিয়াছেন যে Neo-Vivekananda groups' main object was to bring about a synthesis between religion and nationalism. কিন্তু জীবনে তিনি যখন নিষ্ঠুর সত্যের সহিত মুখোমুখি হইলেন তখন তিনি জীবনটাকে 'মায়া' বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র একদা তাঁহার ঋষি-দৃষ্টিতে দেশমাতৃকার যে রূপ দর্শন করিয়া আনন্দমঠে ব্রহ্মচারীর মুখ দিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন—'দেখ মা যাহা হইয়াছেন, মা আজ কালী, অন্ধকার-সমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী-হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান তাই মা কঙ্কালমালিনী, আপনার শিব আপনিই পদতলে দলিতেছেন—মায়ের যে রূপ সুভাষচন্দ্রও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং মায়ের এই দুর্দশার জন্য যাহারা দায়ী সেই British Imperialism-এর স্বরূপ চিনিতেও তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। কলেজজীবনে পথে ঘাটে ট্রামে ট্রেনে এমন কি কলেজেও যখন তিনি স্বদেশবাসীকে ইংরেজ টমি বা ইংরেজ পদস্থ কর্মচারীদের দ্বারা অপমানিত হইতে দেখিতেন তখন তিনি এ সবই 'মায়া' বলিয়া নিজের মনকে বৈদান্তিক সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই। সাদা-কালোর বিরোধে আইন যখনই বারবার হাস্যকর পক্ষপাতিত্বের প্রহসনে পরিণত হইয়াছে তখনই তাঁহার পক্ষে বেদান্তের মায়াবাদের উপর নির্ভর করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আত্মজীবনীতে স্পষ্টভাবেই তিনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরেজদের বর্বরসুলভ আচরণ উল্লেখ করিয়া একস্থানে তিনি লিখিতেছেন

—"Whenever I came across such an incident my dreams would suffer a rude shock and Shankaracharya's Doctrine of Maya would be shaken to its very foundations. It was quite impossible to persuade myself that to be insulted by a foreigner was an illusion that could be ignored." ছাত্রজীবনেই তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন "হবে না হবে না খোল তরবার এ সব দৈত্য নহে তেমন"। আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—In conflicts of an inter-racial character the law was of no avail to Indians. The result was that after some time Indians......began to hit back. The Indians would no longer take things lying down. The effect was instantaneous." ছাত্রজীবনেই এই মনোভাবের চরম পরিণতি অধ্যাপক ওটেন সাহেবের সহিত সংঘর্ষ। আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—যখন কোন ভদ্র উপায়ে ওটেন সাহেবকে ভদ্র করা গেল না তখন "Mr. O. was subjected to the argument of force and was beaten black blue." কে বা কাহারা ওটেন সাহেবকে মারিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই। সুভাষচন্দ্র দলের নেতা এবং ক্লাসের প্রতিনিধি ছিলেন বলিয়া বিচারক কমিটি তাঁহাকেই ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সার আশুতোষ মুখার্জি। সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে (An Indian Pilgrim) লিখিয়াছেন—"I was asked a straight question—Whether I considered the assault on Mr. O. to be justified. My reply was that though the assault was not justified the students had acted under great provocation. And I then proceeded to narrate the misdeeds of Britishers in Presidency College during the last few years. It was a heavy indictment,but wiseacres thought that by not unconditionally condemning the assault on Mr. O I had ruined my own case. I felt however, that I had done the right thing regardless of its effect on me." এই প্রসঙ্গে তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় লিখিয়াছেন

(Reminiscences)—"He never let anybody down. He simply accepted the responsibility of the leader even though they could prove nothing definite against him It came to light subsequently that Subhas had not actually belaboured the offender."

তিনি প্রকাশ্যে আশুবাবুর কাছে যদি স্বীকার করিতেন যে প্রফেসার ওটেনকে প্রহার করাটা 'morally wrong' হইয়াছিল—তাহা হইলে হয়তো তাঁহার কিছুই হইত না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, কারণ তাহা করিলে সেটা মিথ্যাচার হইত। ছাত্রজীবনেই নির্ভীক সত্য নিষ্ঠার জন্য নিজের সর্বনাশ বরণ করিতে তিনি ইতস্তত করেন নাই। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় লিখিয়াছেন (Reminiscences)—"It was for this uncompromising stand that he was finally rusticated from the University. He gave a smile but it was a non-chalant smile, he blamed none. The incident 'translated' him into a hero overnight.

এই বীরত্বের ভিত্তি তাঁহার অনমনীয় সত্য-নিষ্ঠা, তাঁহার অকপট স্বদেশপ্রেম, তাঁহার ঋজু-মেরুদণ্ড-আত্মসম্মান। সত্য-সন্ধানই ভারত-ধর্মের মূল লক্ষ্য। বহু পথে বহু মতে তাহার সাধনা, কিন্তু তাহার লক্ষ্য এক—সত্যসন্ধান। সুভাষচন্দ্রও নিজের মতে নিজের পথে এই সত্যের সামীপ্য লাভ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে প্রয়াস আধ্যাত্মিকতা ও আধিভৌতিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। ভারতের সংস্কৃতি এবং বিবেকানন্দের বাণী মুখ্যত তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ইহা সত্য, কিন্তু তবু তিনি প্রতিটি সত্যকে বার বার যাচাই করিয়া তবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বহু সাধুসঙ্গ করিয়া, দেশের বাস্তব অবস্থার পটভূমিকায় তিনি যে জীবন দর্শন রচনা করিয়াছিলেন তাহা শঙ্করাচার্যের মায়া নহে তাহার উপাদান প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তব অনুভূতি। তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এই প্রত্যক্ষটি উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে বারবার প্রশ্ন জাগিয়াছে—Can we comprehend the Absolute through Yogic

perception ? Is there a supermental plane which the individual can reach and where the subject and object merge into oneness ? My attitude to this question is one of benevolent agnosticism. I am not prepared to take anything on trust. I must have first-hand experience, but this sort of experience in the matter of the Absolute, I am unable to get"—আত্মজীবনীতে তাঁহার এই সরল স্বীকারোক্তিই তাঁহার চারিত্রিক সততার নিদর্শন। পরের মুখে 'ঝাল' খাইতে তিনি প্রস্তুত নন। যাহা নিজ অনুভূতির আয়ত্তাতীত তাহাকে তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে উড়াইয়াও দেন নাই। "I can not just rule out as sheer moonshine what so many individuals claim to have experienced in the past. To repudiate all that would be to repudiate much, which I am not prepared to do……" An Indian Pilgrim pp. 105)

এই উদারতাও সুভাষ-চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। যাহাদের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় নাই তাহাদেরও তিনি বরাবর শ্রদ্ধার চোখেই দেখিয়াছেন। বিবেকের নিকটে যাচাই করিয়া তিনি যাঁহাদের মতবাদ জীবনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাঁহাদের মধ্যে আছেন তাঁহার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এ দেশের এবং বিদেশের বহু হিতৈষী বন্ধু, মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত তদানীন্তন কংগ্রেস ও আরও অনেকে। ইঁহাদের সঙ্গে তাঁহার মতের মিল হয় নাই, কিন্তু ইঁহাদের সকলের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহার অজস্র প্রমাণ তাঁহার জীবনীতে এবং চিঠিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁহার প্রতি ব্যবহারকে অনেক সমালোচক 'ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়াছিলেন, তাঁহার মতো দেশনেতাকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করাটা রবীন্দ্রনাথের মতো লোককেও বিচলিত করিয়াছিল—তাঁহার বিরুদ্ধে 'disciplinary measures' তুলিয়া লইবার জন্য তিনি গান্ধিজীকে অনুরোধ পর্যন্ত করিয়াছিলেন কিন্তু গান্ধিজী সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয় আরও অনেকে গান্ধিজীকে এ

বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন কিন্তু discipline-ভক্ত গান্ধিজীর মনোভাব যে কত অনড় ছিল—এই টেলিগ্রামটিতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে—Regret inability even unwillingness to interfere notwithstanding my regard and friendship for the brothers. Feel bans cannot be lifted without their apologising for indiscipline :

এই টেলিগ্রাম দেখিয়া নেতাজী যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা এই :

At school I once read a poem on William Tell, the greatest hero of Switzerland

My knee shall bend, he calmly said,
To God and God alone
My life is in the Austrians hand
My conscience is my own.

I am not aware of any wrong that I have committed in my political career. Consequently my reply to the Mahatma will be on the above lines with a few verbal changes (Crossroads : pp. 346.)

কিন্তু এসব সত্ত্বেও মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অটুট ছিল। মহাত্মাজীর নীতির সহিত আপোষ করিলে জীবনে তাঁহার অনেক সুবিধা হইত—কিন্তু আগেই বলিয়াছি নিজের কোনও সুবিধার জন্য তিনি কখনও নিজের আদর্শ ত্যাগ করেন নাই। এজন্য অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন তবু ত্যাগ করেন নাই। কোনও প্রকার আপোষের কুয়াশা দিয়া সত্যের সূর্যকে ঢাকিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। পিতামাতার আদেশ এবং অনুরোধ পালন করিতে পারেন নাই বলিয়াও জীবনে তিনি অসুখী ছিলেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন—"To defy my parents in this way was contrary to my nature and to cause them pain was disagreeable. But I was swept onwards as by an irresistible current"—

তাঁহার চারিত্রিক সততা এবং অনমনীয় আদর্শনিষ্ঠাই এই irresistible current—ইহার জন্যই তিনি লোভনীয় I. C. S. চাকুরী ছাড়িয়াছিলেন, এই জন্যই মহাত্মাজীর আপোষনীতির সহিত তিনি রফা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তবু মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা যে অটুট ছিল এবং ভারতবর্ষের সহকর্মী রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধেও তাঁহার শ্রদ্ধা যে ক্ষীণ হয় নাই, তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। আমি মাত্র দুইটি প্রমাণ দিতেছি। যখন তিনি বিদেশে গিয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য জাপানীদের সহায়তায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে লিপ্ত তখনও তিনি যে মহাত্মাজীর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ তাহার প্রমাণ পাই মহাত্মাজীর জন্মদিনে তিনি ব্যাংকক হইতে যে বেতার ভাষণ দিয়াছিলেন (১৯৪৩ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর) তাহার প্রথম ছত্রটিতে—This day Indians all over the world are celebrating the 75th birthday of their greatest leader—Mahatma Gandhi. এই 'Greatest' শব্দটি দ্বারা তাঁহার ভক্তি সূচিত হইতেছে। এই ভাষণেই তিনি বলিয়াছেন—It is no exaggeration to say that if in 1920 he had not come forward with his new weap n of struggle India to-day would perhaps have been still prostrate. His services to the cause of India's freedom are unique and unparalled. No single man could have achieved more in one single life time under similar circumstances. মহাত্মা গান্ধীর আপোষ-নীতির তিনি বিরোধী ছিলেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কীর্তি ও কৃতিত্বকে তিনি বারবার শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার মহত্ত্ব। ইহা সম্ভব হইয়াছিল কারণ যে জীবন-নীতিকে তিনি শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অরূপ নির্বিশেষ পরম সত্যের (absolute truth) উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—তাহা প্রত্যক্ষ জগতের আপেক্ষিক সত্যের উপর নির্ভরশীল। ধরিবার ছুঁইবার মতো একটা কিছু পাইবার জন্য তাঁহার মন বহু শাস্ত্রের জটিল পথে ভ্রমণ করিয়া যে সত্যকে অবশেষে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি নিজেই তাঁহার আত্মজীবনীতে (An Indian pilgrim pp. 106—8) লিখিয়া

গিয়াছেন—'The Doctrine of Maya does not work. My life is incompatible with it though I tried long and hard to make my life fit in with it. I have, therefore, to discard it. On the other hand, if the world be real (not, of course, in an absolute but in a relative sense) then life becomes interesting and aquires meaning and purpose,······My own view is that most of the conceptions of reality are true, though, partially, and the main question is which conception represents the maximum truth. For me the essential nature of reality is LOVE. LOVE is the essense of the Universe and is the essential principle in human life. তাঁহার জীবনের আদর্শ পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দও ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের একটি কবিতা আছে—

Listen, friend, I will speak my heart to thee
I have found in my life this truth Supreme
Buffeted by waves, in this whirl of life
There's One Ferry that takes across the Sea.
Formulas of worship, control of breath ,
Science, Philosophy, Systems varied,
Relinquishment, Possession and the like
All these are but delusions of the mind
Love, Love—that's the One Thing, the Sole treasure
Aye, born heir to the infinite thou art,
Within the heart is the Ocean of Love
"Give" "Give away"—whoever asks return
His Ocean dwindless down to a mere drop.

এই প্রেমের সত্যই সুভাষচন্দ্রের জীবনে পরম সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রেমের আলোকই তাঁহার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়াছিল। এই জন্যই তিনি বিরুদ্ধ-পক্ষীয় লোকদের মহত্ত্বের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্যই অহঙ্কারের বা স্বার্থের আবিলতা তাঁহার

চারিত্রিক ভাস্বরতাকে মলিন করে নাই। Major General Shah Nawaz Khan তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক I. N. A. and its Netaji গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Netaji was absolutely selfless and he never appeared to have any personal ambitions. This was very well demonstrated at a conference of the Greater East Asia Nations. When Premier Gen. Tojo said in a speech that Netaji would be all in all in Free India. Netaji stood up and told Gen. Tojo that he had no right to make such a statement because it was entirely up to the people of India to decide who would be who in India."

যে প্রেমের বেদীতে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা মুখ্যতঃ যদিও দেশপ্রেম, কিন্তু মানব-প্রেমের বহু উদাহরণও তাঁহার জীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে। ইয়োরোপের নানা দেশে—জার্মানীতে, সুইটজারল্যাণ্ডে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, এমন কি ইংলণ্ডেও বহু নর-নারীর সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক ছিল তাহা স্বার্থলেশহীন প্রেমের সম্পর্ক। ইংরেজ জাতির সহিত তাঁহার কলহ ছিল না—তিনি সশস্ত্র অভিযান করিয়াছিলেন—ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজিমের বিরুদ্ধে।

অন্তর্নিহিত এই প্রেমের দীপ্তি সম্ভবতঃ তাঁহার চোখে মুখে বিকীর্ণ হইত। Mrs Kitty Kurti যখন বার্লিনের রাস্তায় প্রথম তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল—'No doubt, I had run across an outstanding person, a mystic, a spiritual man'* পরে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন তিনি।

......"was most surprised to find that this was a political and not, as I had expected, a philosophical speech"—তবু তাঁহার বার বার মনে হইয়াছিল—"he was by no means merely a politician, he was above all a true philosopher. A man, who though fighting valiantly

for the liberation of his country was equally interested in man's fate and destiny."*

পাশ্চাত্য দেশে politician বলিতে যাহা বুঝায় সুভাষচন্দ্র ঠিক সেই অর্থে politician ছিলেন না—অর্থাৎ politicsকে তিনি নিজের ভবিষ্যৎ-নির্মাণের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করেন নাই, politics তাঁহার পেশা ছিল না, দেশ-প্রেমই তাঁহাকে রাজনীতির পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। যে পথে তিনি গিয়াছিলেন ক্ষত্রিয়-সুলভ বীর্যবলে, তাহাতে বণিক বুদ্ধির লোলুপতা ছিল না। তাঁহার আদর্শ ছিল গীতার অর্জ্জুন, তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিত চিতোরের রাণা প্রতাপ, তিনি এ দেশের সেই শহীদ-বৃন্দকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন যাঁহারা দেশের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। তিনি দেশবন্ধুকে গুরু-রূপে বরণ করিয়াছিলেন—কারণ তাঁহার মধ্যে ত্যাগের যে বীরত্ব তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব, তাহা অনন্য। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেও যতক্ষণ ত্যাগের ও বীরত্বের মহিমা ছিল ততক্ষণ সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর সহযোগী কর্মী ছিলেন। কিন্তু যখনই মহাত্মাজীর আপোষ-নীতি এই মহিমার উপর ছায়াপাত করিল, যখনই সুভাষচন্দ্র নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে এই পথে চলিলে স্বাধীনতা লাভ সুদূরপরাহত তখনই মহাত্মাজীর সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিল। বিলাতী ধাঁচের পলিটিশিয়ান হইলে মহাত্মাজীর সহিত তিনি কলহ করিতেন না। আসলে সত্যই তিনি philosopher ছিলেন, ছিলেন সেই আদর্শবাদী ভারতীয় ক্ষত্রিয় যাহার কাছে সত্য পথই শ্রেষ্ঠ পথ, তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে জন্ম হইতেই তিনি মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত, নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া তাই তিনি সেই অনিশ্চিত দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছিলেন যে পথের শেষে, তাঁহার আশা ছিল দেশের পরাধীনতা-শৃঙ্খল-মোচনের সুনিশ্চিত উপায় মিলিবে। তিনি জার্মানী এবং জাপানের সহিত যোগদান করিয়া কি আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন? ইহার উত্তর ডক্টর গিরিজা কুমার মুখার্জি

তাঁহার—Netaji the Great Resistance Leader প্রবন্ধে দিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত করি—"As Germany and Japan happened to be the only two countries with which England was at war, was it not natural that an Indian Nationalist opposed to British rule, should try to secure their help against England? Netaji did so as a National revolutionary just as before his time Garibaldi had taken help from the enemies of Austria to free and unify Italy, Sun-Yat-Sen took it from Japan to destroy the Imperial Dynasty of China or De Valera and Sinn Finns did from America to make Ireland free. One can give many examples, not to speak of the help which the Western Powers sought and got from the Soviet Union to fight Nazi Germany although immediately after the war they regretted it and quarrelled with Soviet Union. All this proves that it is possible and thus highly moral to co-operate with an unpopular regime for specific national purposes without being involved in the ideology of such a regime……* 'কণ্টকে নৈব কণ্টকম্'। নীতি রাজনীতির অতিশয় পুরাতন সূত্র। এই নীতি অবলম্বন করিয়া বহু ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে। এই চিরাচরিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা নেতাজীকে আদর্শ-ভ্রষ্ট বলেন তাঁহারা হয় ঈর্ষা-ক্লিষ্ট নিন্দুক, নয় ইতিহাস-অনভিজ্ঞ মূর্খ। জার্মানী নেতাজীকে সাহায্য করে নাই। জাপান করিয়াছিল। কিন্তু জাপানের নিকট তিনি যে আত্মসম্মান বিক্রয় করেন নাই ইহার একাধিক প্রমাণ আছে। মেজর-জেনারেল শাহ নওয়াজ খান লিখিয়াছেন যে নেতাজী বলিতেন—জাপানীদের নিকট হইতে আমরা কোন Safe-guards চাই না—"Our surest safeguard must be our own strength and if on going into India we found that the Japanese wished to

replace the British we should turn round and fight them too At several lectures at mass meetings Netaji repeated this"

হইতে পারে, হয়তো তাঁহার অতি-স্পষ্ট স্বাদেশিকতা এবং তাঁহার অতি-শুভ্র আত্মসম্মানের জন্য জাপানীরা তাঁহাকে ততটা সাহায্য করে নাই যতটা সাহায্য তিনি আশা করিয়াছিলেন—তাই মণিপুরের যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু পরাজয় সত্ত্বেও তিনিও সফলকাম হইয়াছিলেন—তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন—তাঁহার I. N. A. ভারতের বুকে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল সেই আলোড়নের ধাক্কাতেই যে British Imperialism-এর ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা-দুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে। কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি ; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে যেহেতু কোনও পরাভবকে তুমি সত্য বলে মানো নি—"

এই কথাই বলিবার সময় আজ আসিয়াছে যে নেতাজী পরাভূত হন নাই। তাঁহার কালজয়ী আদর্শ, তাঁহার চারিত্রিক ভাস্বরতা, তাঁহার একনিষ্ঠ দেশভক্তি, তাঁহার অদম্য পৌরুষ, বিশেষ করিয়া তাঁহার আপোষহীন সততা ইতিহাসের পটভূমিকায় তাঁহাকে আজ পরাভবের বহু ঊর্ধ্বে যে মহিমার সিংহাসনে বসাইয়াছে সেখানে কোনও ঈর্ষা-ক্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের বিষোদ্গার তাঁহাকে মলিন করিতে পারিবে না।

ভারতের স্বর্গতঃ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ঠিকই বলিয়াছেন—"To this day we accept Netaji as our greatest leader, as a great leader and revolutionary he is an example to us—a beacon light." *

এই 'beacon light' এর ঔজ্জ্বল্যের উৎস তাঁহার চরিত্রের সততা। এই সততার প্রভাবেই তিনি বহুলোকের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বিরাট I. N. A. বাহিনী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যে সাগ্রহে তাঁহার পতাকাতলে সমাবিষ্ট হইয়াছিল তাহাও নেতাজীর নিষ্কলঙ্ক সততার আকর্ষণে। শাহ নওয়াজ খান একথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। Hugh Toye সুভাষচন্দ্রের শত্রুপক্ষীয় লোক তিনিও তাঁহার এই Power of fascination-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, স্বদেশে বিদেশে তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই বহুলোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এই সততার জন্যই। সততা দামী দাগহীন হীরকের মতো দুর্লভ, হীরকের প্রতি কাহার না fascination থাকে? তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, 'In this alone there was an element of greatness of the single-minded dedicated leader.' তিনি আরও বলিয়াছেন "By the magnitude of this conception, by the example of his magnetic, burning zeal, his tenacity and personal force, by the tradition he left of sacrificial patriotism, must be measured the stature of Subhas Chandra Bose. His place in Indian history cannot be denied,

এ সমস্তেরই মূলে আছে তাঁহার সততা। এই সততাই তাঁহাকে Single-minded dedicated Patriot করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে একথা ঠিক, কিন্তু আর একটা মর্মন্তুদ সত্যও কি লিখিত থাকিবে যাহা লজ্জাকর, যাহা কালিমাময়? যে স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্র সর্বস্ব পণ করিয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন সেই স্বাধীনতা যখন আসিল তখন স্বাধীন সরকার সুভাষচন্দ্রকে যোগ্য মর্যাদায় তাঁহার সম্মানের আসনটি দিলেন না। এই প্রসঙ্গে

জোয়ান অব্ আর্কের কথা মনে পড়ে। যে জোয়ান অব্ আর্কের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ফরাসী সেনাদল Orleans হইতে ইংরেজদের তাড়াইয়া চার্লসকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—পরে সেই জোয়ান অব্ আর্ককে ডাইনি বলিয়া পুড়াইয়া মারিতে তাহারা দ্বিধা করে নাই। গ্যারিবল্‌ডির জীবনেরও ইহাই ট্র্যাজেডি। তিনিও তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই। যে স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি তাহা অবশ্য সুভাষচন্দ্রের আদর্শ স্বাধীনতা নহে তাহার প্রমাণ দ্বিধা-বিভক্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ক্ষত হইতে উৎসারিত অবিরল রক্ত-ধারা, তাহার প্রমাণ আমাদের প্রাদেশিক অনৈক্য, তাহার প্রমাণ আমাদের অশান্তি ও দারিদ্র্য, তাহার প্রমাণ বিদেশের দ্বারে-দ্বারে করুণা-ভিক্ষার এবং অন্নসংগ্রহের অনিবার্য আতিশয্য। প্রকৃত স্বাধীনতা আমাদিগকে পুনর্বার অর্জন করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে সেই নেতাজীকেই বার বার স্মরণ করিতে হইবে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একদা উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছিলেন—In the name of God, in the name of by-gone generations who have welded the Indian people into one nation and in the name of the Dead Heroes who have bequeathed to us a tradition of heroism and self-sacrifice—We call upon the Indian people to rally round our banner and to strike for India's Freedom.*

সুভাষচন্দ্র এখন কোথায়? তাঁহার বিদেশী বান্ধবী Mrs Kitty Kurty তাঁহার গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন—Where are you now, my friend? Deeply buried in the Japanese earth? Mingling with its soil? Dead, my friend? Or as the story goes, are you in some hidden monastery, an adorer and initiate of the great universal spirit? Or are you a wandering begger and sanyasin, appearing now and then in this or that village; talking now and then with this or that peasant or worker or saint?

Whatever did happen, whatever may be the case—

greetings to you, my brother. May this letter find you in peace, whether in this world or other.*

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়া আমি আমার ভাষণ শেষ করিতেছি—

কোথাও যাও নি তুমি
আমাদেরই মাঝে আছো, হে বন্ধু মহান্,
মোদেরই অন্তর মাঝে, ওগো জ্যোতির্ময়,
আছো তুমি, আছো তুমি জানি
অন্ধকার আকাশেতে
ধ্রুব-নক্ষত্রের ভাতি চির অনির্বাণ
প্রভাতের আলোকেতে
সমুজ্জ্বল সত্য শিব সুন্দরের বাণী
তেমনি তুমিও আছো, হে সুভাষ আমাদের প্রাণে
চিরন্তন ভারতের শাশ্বত সত্যের মাঝখানে
সততার সিংহাসনে সমাসীন রাজরাজেশ্বর
আছো তুমি ভরিয়া অন্তর।
তমিস্রা বিদীর্ণ করি' নিত্য জাগে আলোকের রেখা
তার মাঝে পাই তব দেখা
যে প্রেরণা যুগে যুগে উত্তরিবে সুদুর্গম পথ
বীর্যবলে পার হবে অরণ্যানী সমুদ্রপর্বত
তুমি সে প্রেরণা
যে বাণীর তূর্যনাদে ধিক্কৃত হইবে পাপী
সমনস্ক হবে অন্যমনা
তুমিই সে বাণী
তারই মাঝে, হে অমর, আছো তুমি, আছো তুমি
আছো তুমি জানি।

জয় হিন্দ।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। এই বিজয়া-সম্মেলন সভায় যাঁহারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, বয়ঃকনিষ্ঠদের আশীর্বাদ জানাইতেছি।

আজকাল অনেকেরই মুখে অভিযোগ শুনি, আর ভালো সাহিত্য-সৃষ্টি হইতেছে না।

কথাটা অমূলক নয়।

কিন্তু যে সাহিত্যিকরা সাহিত্য-সৃষ্টি করেন তাঁহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার কোনও প্রচেষ্টা কি আমাদের সমাজে আছে? অনেক দুঃখে আমার 'মরজিমহল' নামক রোজনামচায় এই ছড়াটি লিখিয়াছিলাম—

যারা বই লেখে—চড়ে না তাদের হাঁড়ি,
যাঁরা বই ব্যাচে—তাঁদেরই গাড়ি-বাড়ি।
আম ফলিয়ে আমগাছ পায় না কোনো মূল্য,
আম-বেচে বাগান-ওলাই ক্রমাগত ফুললো।
সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নিয়ে চলছে বেচা-কেনা
সৃষ্টিকর্তা পায় না কিছু, করতে হচ্ছে দেনা।

যেখানে সমাজের প্রতিস্তরেই অসাধুতা, অন্যায় ও অবিচার, যেখানে সমস্ত সমাজই অসুস্থ, সেখানে ভালো সাহিত্য হইবে কি করিয়া? বৃক্ষের শাখাপত্র যখন শুষ্কপ্রায় তখন সে বৃক্ষ কি ভালো ফুল-ফলে সুশোভিত হইতে পারে?

পারে না।

তাই অধিকাংশ সাহিত্যই এখন হতাশার সাহিত্য, নাকে-কান্নার সাহিত্য, বলিষ্ঠ পৌরুষের বা বৃহৎ আদর্শের সাহিত্য নয়। আদর্শ আমরা মুখে আওড়াই, জীবনে তাহাকে প্রতিফলিত করিতে পারি না। এখন আমরা আমাদের মানসিক-কণ্ডূয়ন তৃপ্ত করিবার জন্য বই পড়ি, উচ্চ-

আদর্শের অমৃত পান করিবার জন্য নয়, তাই আমাদের দেশে এখন লঘু, চুটকি সাহিত্যেরই কদর বেশী। বৃহৎ সৃষ্টিকে উপলব্ধি করিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। বৃহৎ সৌধ নির্মাণ করাইবার সঙ্গতি আমাদের নাই, আমরা ছোটখাটো ফ্ল্যাট লইয়াই সন্তুষ্ট আজকাল। তাই বাজারে ফ্ল্যাট বানাইবার মিস্ত্রিদেরই ভিড় বেশী। প্রতিভাবান সৌধ-শিল্পীরা অন্তর্ধান করিয়াছেন। যে অর্থনৈতিক ও নৈতিক বনিয়াদের উপর সমাজের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, সেই বনিয়াদটার ভিত্তিই নড়িয়া গিয়াছে। যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থ-উপার্জন করাই এখন অর্থনীতি, যেন-তেন-প্রকারেণ আত্মসুখ ভোগ করাই এখন জীবন-নীতি। বলা বাহুল্য এ ধরনের নীতি মনুষ্যত্বের নীতি নয়।

আমরা আজ মনুষ্যত্বহীন অর্থাৎ সর্বস্বহীন। সুখ, শান্তি, আহার, বিহার, সাহিত্য, শিল্প—সবই যেন একটা পঙ্কিল আবর্তে আবর্তিত হইতেছে। এই ঘূর্ণাবর্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে আমাদের মৃত্যু আসন্ন।

এই আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে আমাদের উদ্ধার করিবেন আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা, যাঁহাদের দেহে-মনে অমিত শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। বিদ্রোহ করিতে হইবে।

আর সাহিত্যিকের কাজ হইবে সে বিদ্রোহকে সাহিত্যে রূপায়িত করা।

এই দুর্দিনে সেই যৌবনেরই স্বপ্ন দেখিতেছি—

তোমারেই ডাকি শুধু হে যৌবন প্রাণ বহ্নিময়
মূর্ত কর কবি-কল্পনারে,
হে অভিষ্ট-বর্ষী দেব, অন্ধকারে কর জ্যোতির্ময়
দয়া করি স্পর্শ কর তারে।

নমস্কার।*

সৃষ্টিধর্মী কাব্যসাহিত্যের (এর মধ্যে ছোটগল্প উপন্যাস পড়ে) প্রধান কথা হচ্ছে রস। রসোত্তীর্ণ না হলে তা কাব্যসাহিত্যের আসরে কিছুতেই পাঙ্‌ক্তেয় হবে না, তার যতই না অন্য গুণ থাক। সৃষ্টিধর্মী কাব্যের আর একটি প্রধান গুণ অনন্যতা। পল্লীগ্রামের বা শহরের বা প্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনা করার মধ্যে একটা নিপুণতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাতে যদি অনন্যতা না থাকে, তা হলে তাকে প্রথম শ্রেণীর কাব্য বলতে ইতস্ততঃ করব। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, তিলোত্তমা, আয়েসা, কমলাকান্ত— এসব অনন্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের গোরা, নিখিলেশ, শচীশ, দামিনী এরাও। অর্থাৎ এদের মতো লোক কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এরা কারও 'কপি' নয়। এরা কবিদেরই সৃষ্টি। শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী বা দেবদাস বা শ্রীকান্ত রসোত্তীর্ণ, মনকে খুব নাড়া দেয়—কিন্তু ও-সব সৃষ্টিতে অনন্যতা আছে কি? ও-সব চরিত্র রসোত্তীর্ণ উপাদেয় কিন্তু অনন্য নয়। একটি অনন্য সৃষ্টি করেই Swift পৃথিবীর সাহিত্য স্রষ্টাদের আসরে সসম্মানে অভ্যর্থিত হয়েছেন সে বইটির নাম গ্যালিভার্স ট্রাবভলস্। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। আর একটা মনে পড়েছে Alice in wonder land, আনাতোল ফাঁসের 'থেয়া' (Thais) আর একটি। শেক্‌সপীয়র এরকম অনন্য সৃষ্টি অনেক করেছেন। গ্যেটের 'ফাউস্ট' বা মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' অনন্য সৃষ্টি। ভিক্টর Hugve 'লা মিজারেবলস্'-এ যে জাঁ ভালজাঁ, বা পাদ্রী, বা ফ্যানটিন সৃষ্টি করেছেন সেগুলি অনন্য। অনবদ্য। বিদেশী সাহিত্যের এরূপ অনন্যতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারতেও আছে। বাংলা সাহিত্যে কিন্তু বেশী নেই। বাংলা সাহিত্যে আমরা জোর দিই —সাহিত্যের বিষয়ের উপর! ইনি শ্রমিকদের কথা লিখেছেন, উনি গ্রাম-বাংলার কথা লিখেছেন, তিনি কয়লাখনির চিত্র এঁকেছেন, আর একজন মধ্যবিত্তদের ছবি এঁকেছেন। অনেক সময়েই চিত্রগুলি

ভালো হয়েছে, রসোত্তীর্ণও হয়ে উঠেছে—কিন্তু সেগুলি অনন্য সৃষ্টি হয় নি। কারণ সেগুলি বাস্তব জীবন্ত চরিত্রগুলির 'কপি', সৃষ্টি নয়। অনেক সময় যাঁরা বলেন যে অমুক সাহিত্যিক দেশের মাটি থেকে রস টেনে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন বলেই খুব উঁচু দরের সাহিত্যিক, তাঁরা ভুলে যান যে অনন্য সৃষ্টি না করতে পারলে স্রষ্টা, সাহিত্যিক হওয়া যায় না ; তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন, পুরস্কার পেতে পারেন, কিন্তু স্রষ্টা হতে হলে সৃষ্টিতে অনন্যতা থাকা প্রয়োজন।

যা ছিল না তাই তোমাকে করতে হবে সৃষ্টি
তবেই হবে স্রষ্টা
বিশ্বকর্মা নকল কভু করেননি কো কারো
তাইতো তিনি স্বষ্টা।

রাজা রামমোহন রায়

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

সম্প্রতি রাজা রামমোহনকে লইয়া বহু সভায় বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বহু প্রবন্ধে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে তিনি শুধু প্রতিভাবান পুরুষই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আত্মসম্মানী শক্তিমান পুরুষ-সিংহ। তিনি তাঁহার এই বিশেষ ব্যক্তিত্বকে নানাভাবে অলঙ্কৃতও করিয়াছিলেন।

তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ-বংশে। পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। রামমোহনের জন্ম ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে মে। এ তারিখটির সম্বন্ধে অনেকে অবশ্য একমত নহেন।

কিন্তু ইহা মানিতেই হইবে যে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন এদেশে মুসলমানী চালচলন আচার-আচরণ সুদীর্ঘ মুসলমান রাজত্বের প্রভাব আমাদের সমাজে পুরাপুরি বর্তমান। রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব দরবারে চাকুরি করিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হন।

নবাব দরবারের প্রভাব তাঁহার বংশে প্রচুর পরিমাণে ছিল। গ্রাম্য-পাঠশালায় বাংলা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া রামমোহনকে পাটনায় যাইতে হইয়াছিল আরবী ও পারসী শিখিবার জন্য। ইহাও মুসলমানী প্রভাবের ফল। ইহার কিছুদিন পরে কাশীধামে গিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে তিনি ইংরেজিও শিখিয়াছিলেন। এ সব ছাড়া উর্দু, হিব্রু, ফরাসী, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন রামমোহন।

অর্থাৎ পুরুষ-সিংহ রামমোহনের চরিত্রে হিন্দু-প্রভাব, মুসলমানী-প্রভাব এবং খ্রীষ্টানী-প্রভাব এমন একটি বিস্ময়কর সমন্বয় রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল যাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যেও খুব সুলভ নহে।

প্রথমেই বলিয়াছি তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান খুব প্রবল ছিল। তাঁহার যৌবনকালে খ্রীষ্টান মিশনারিরা যদি হিন্দুধর্মের দেবদেবীদের লইয়া ব্যঙ্গ না করিতেন তাহা হইলে রামমোহন হিন্দুধর্ম লইয়া মাথা ঘামাইতেন কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। খ্রীষ্টান মিশনারিদের মুখের মতন জবাব দিবার জন্যই তিনি বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া প্রাচীন ঔপনিষদিক ধর্মকে ব্রাহ্মধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সত্যই পুনরায় প্রচার করিলেন যে, হিন্দুধর্ম কেবল পুতুল-পূজা কর্মে সীমাবদ্ধ নয়। শুধু তাহাই নয় হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ইহাও তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারিরা যে বাইবেল প্রচার করে তাহা হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল হইতে পৃথক।

এই জেদী, একনিষ্ঠ, আত্মসম্মানী রামমোহনের নানা ঘটনা তাঁহার জীবনীতে মুদ্রিত আছে। সন্ধানী পাঠক-পাঠিকারা এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে রামমোহনের আত্মসম্মানবোধ, রামমোহনের চরিত্র-প্রাখর্য, তাঁহার কোনও অন্যায়ের সহিত আপোষ না করার দৃঢ় মনোভাব তাঁহার মহত্ত্বের প্রধান উপাদান।

যদিও তিনি বেদান্তসার গ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু তিনি সংসারকে মায়াময় বলিয়া ত্যাগ করেন নাই। প্রয়োজনবোধে তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সহিত মকদ্দমাও করিয়াছেন।

সতীদাহ তখন প্রচলিত প্রথা ছিল। আমরা আজ যেমন পণপ্রথা সহ্য করিতেছি, পতিতাবৃত্তি সহ্য করিতেছি, ঘুষ নেওয়া সহ্য করিতেছি, কালোবাজার সহ্য করিতেছি তখন তেমনি আমরা নানা কুপ্রথার সহিত সতীদাহ প্রথাকেও সহ্য করিতাম। দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, কিন্তু রামমোহন এ আন্দোলনে যোগদান করিলেন যখন তাঁহার বৌদিকে সতী হইতে হইল। প্রচণ্ড আঘাত লাগিল তাঁহার মনে, তাঁহার আত্মসম্মান আহত হইল, তিনি সচেষ্ট হইলেন যেমন করিয়া হোক এ প্রথাকে দূর করিতে হইবে।

তাঁহার এই আত্মসম্মানবোধ তাঁহার এই বাস্তবিক চেতনা, যাহাকে ইংরেজি ভাষায় Practical sense বলে—তাঁহাকে সর্ব মহৎ কর্মে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। যখন তিনি বুঝিলেন—ইংরেজরা এদেশে এখন রাজা, তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিলে দেশের লোকের উপকার হইবে, চাকুরি মিলিবে, আর তাহাদের ভাষার ঐশ্বর্যও যখন প্রচুর—তখন তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিলেন, যে ভাষাই শেখো, ভারতের সনাতন পথ কিন্তু ত্যাগ করিও না। সে সনাতন পথ ধর্মের পথ।

তাঁহার এই দৃঢ় অনমনীয় বাস্তব-সম্বন্ধে-সচেতন স্বচ্ছ দৃষ্টি আমাকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছে। প্রকৃত প্রাজ্ঞ ছিলেন তিনি।

আমাদের মধ্যে আজ যদি তাঁহার মতো দৃঢ়চেতা আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন লোক থাকিতেন তাহা হইলে আমাদের দুর্দশার অনেক লাঘব হইত। আমরা আজ অনেক দুর্নীতির সহিত আপোষ করিয়া চলিতেছি, রামমোহন যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে দেশের চেহারা অন্য রকম হইত।

তাঁহার স্মরণ সভায় তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া ধন্য হইলাম। নমস্কার।*

কেন ?

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। যে সংকট সমাধানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তা জীবন-মরণ সংকট। সে সংকট আমাদের জাতির দেহে ও মনে জোঁকের মতো বসে রক্ত শোষণ করছে। সে জোঁককে যদি আমরা সরাতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সামাজিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার জন্য যা যা প্রয়োজন তার দাম এত বাড়ছে এবং মান এত কমছে যে ভদ্রলোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

এই সংকটের মূলে আছে আমাদের অসাধুতা, অপটুতা এবং অধুনা প্রচলিত রাজনীতি। মনে হয় স্বাধীনতা যেন ভদ্রলোকদের পক্ষে দুঃসহ অভিশাপ হয়েছে একটা।

সব জিনিসের দাম এত বেশী কেন? ছেলে-মেয়েদের স্কুলের বেতন এত বেশী কেন? স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার জায়গায় গুণ্ডামি চলছে কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যকর্মে এত গাফিলতি কেন? রাস্তায় রাস্তায় এত জঞ্জাল কেন? আমরা নিয়মিত আলো বা জল পাচ্ছি না কেন? এরকম আরও অনেক 'কেন' আছে। আপনারা সবাই ভুক্তভোগী—তা জানেন।

এ সবের একটা কারণ বোধ হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় কারণ, অতি-ধনী বণিকদের আরও ধনী হবার লোভ, আর তৃতীয় আমাদের সরকারের অক্ষমতা। জানি না সত্য কি না, কিন্তু গুজব শুনি, শাসন-বিভাগের সঙ্গে এই সব ধনী কালোবাজারীদের বাধ্যবাধকতা আছে নাকি। জানি না এ কথা সত্য কি না। প্রয়োজনীয় সব জিনিসের দাম তো বাড়ছেই, সব জিনিসের সঙ্গে ভেজালও মেশানো হচ্ছে। চালে ভেজাল, ডালে ভেজাল, তেলে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, প্রসাধন জিনিসে

ভেজাল, বাসনের ধাতুতে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, পয়সায় ভেজাল—আজকাল তামার পয়সা আর রূপোর টাকা দুর্লভ—এ ছাড়া সাহিত্যে ভেজাল, শিক্ষায় ভেজাল, সংস্কৃতিতে ভেজাল। সবই একটা ওপর-চকচকে ভেলকি, ভিতরে শাঁস নেই, বাইরেই চাকচিক্য। এর ফলে আমাদের দেহে ও মনে নানা রকম দুরারোগ্য ব্যাধিও দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্যবান শিশু আজকাল ক্বচিৎ দেখতে পাই। বয়স্কদেরও অনেকেই পেটের অসুখ, হাঁপানি, বা যক্ষ্মায় ভুগছেন, লিভারের দোষ তো ঘরে ঘরে। ক্যানসার রোগও বাড়ছে আজকাল। অন্ত্রের ক্যানসার সম্ভবত অতিরিক্ত ভেজাল খাবার খেয়েই হচ্ছে। আগে তো এত হ'ত না। ফল খাওয়া তো আমরা ভুলে গেছি, আম লিচুও দুর্মূল্য, কেজির হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। আম, লিচু নাকি বিদেশে গিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে, আমরা খেতে পাচ্ছি না। ভিটামিনের অভাবের জন্য যেসব ব্যাধি তা আমাদের দেশে প্রচুর। ভাল টাটকা ফল, টাটকা দুধ, ঘি, মাখন, টাটকা শাক-সব্জী খেলে তা নিবারিত হয়, কিন্তু সে সব জিনিস দুর্লভ এবং দুর্মূল্য। হিমঘরে রাখা, বরফ দেওয়া জিনিসের খাদ্যগুণ এবং স্বাদ বহুল পরিমাণে কমে যায়। আমাদের মানসিক ব্যাধিও বাড়ছে। পাগলের সংখ্যা—বিশেষতঃ মেলানকোলিয়া, আত্মহত্যা-প্রবণতা আগের চেয়ে অনেক বেশী আজকাল। সুস্থ সবল মানসিকতা সম্পন্ন লোক ক্রমশই বিরল হয়ে আসছে। আমরা কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন, আমরা এসব নিয়ে বৈঠকখানায় আলোচনা করি, বড় জোর সভা করে বক্তৃতা দিই, অথবা খবরের কাগজে চিঠি লিখি। তারপর যা হচ্ছে তা মেনে নিই। আমাদের সহনশীলতা অতুলনীয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে এদেশে না খেয়ে দলে দলে লোক 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' বলে চীৎকার করেছে, তারপর রাস্তার ধারে পড়ে প্রাণত্যাগ করেছে—কিন্তু একটি দোকানও লুট করেনি!

আমাদের প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ সফল হয় না, কারণ আমাদের একতা নেই। আমরা সকলেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আমরা কেবল নিজের কোলের দিকে ঝোল টানি, গা বাঁচিয়ে চলতে চাই। আমরা যদি

বাজারে পিকেটিং করি যে এত দাম দিয়ে কেউ যেন জিনিস না কেনেন, তাহলে তা সফল হবে না। কারণ আর এক দল লোক গোপনে আরও বেশী দাম দিয়ে সে জিনিস কিনবেন। এই যদি আমাদের জাতীয় চরিত্র হয় তাহলে আমাদের প্রতিবাদই বা কে শুনবে আর প্রতিরোধ করেই বা কি হবে? আমাদের দেশের লোকই সব জেনে শুনে কালো-বাজারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং মনে হয়, দেবে।

কালোবাজারীরা অন্য দেশেও আছে। কিন্তু অন্য দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে এত সচেতন, এত একতাবদ্ধ যে কালোবাজারীরা যথেচ্ছাচার করতে পারে না। আমেরিকায় মাংসওলারা মাংসের দাম বাড়াবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেখানকার ক্রেতাদের প্রবল প্রতিরোধে তা করতে পারে নি। বড়দিনের ভোজে টার্কি খাওয়া সাহেবদের একটা চিরাচরিত বিলাস, একবার টার্কি বিক্রেতারা দর বাড়াবার চেষ্টা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের মারফত জনসাধারণ তাদের জানিয়ে দিলেন যদি দাম বাড়ানো হয় আমরা কেউ টার্কি খাব না। টার্কির দাম বাড়েনি। আমি এক চেন-স্মোকার সাহেবকে দেখেছিলাম যতক্ষণ তিনি Made in England মার্কা দেশলাই পান নি, ততক্ষণ সিগারেট খাননি। Made in England দেশলাই পেতে তাঁর ২৪ ঘণ্টা লেগেছিল। ওদের একতা আছে, মনের জোর আছে, তাই ওরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুনিয়ায়। আমাদের কিছু নেই তাই আমরা চারদিক থেকে মার খাচ্ছি আর নাকে কাঁদছি। আমাদের দেশে সাধু লোকদের চেয়ে অসাধু লোকদের একতা বেশী। অসাধু লোকরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ—গভর্ণমেণ্ট এদের চটাতে সাহস করেন না। তাই এরাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করছে।

আমাদের চরিত্রবল যদি দৃঢ় হয়, আদর্শের জন্য ত্যাগস্বীকার কষ্ট-স্বীকার করতে আমরা যদি বদ্ধ-পরিকর হতে পারি—আমাদের সুদিন ফিরে আসবে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমাদের নির্ভর হল আমাদেরই শক্তি। আমাদের আবেদন-নিবেদন শুনে কেউ আমাদের দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে না।

আমাদের যদি সভ্য জাতি বলে পরিচয় দিতে হয় তাহলে সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে হবে। শুধু বাক্যের বুদ্বুদ ছুটালে কিছু হবে না। আশা করি আমরা তা পারব।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে কবিদের মনে যে ভাবোদ্রেক হয় সাধারণ লোকের মনে তাহা হয় না। বর্ষা আসিলে তাঁহারা বিপন্ন হইয়া পড়েন। প্রিয়ার অপেক্ষা ছাতা-জুতার কথাই তাঁহাদের বেশী মনে পড়ে। সাধারণ লোকেদের মধ্যে যাঁহারা রসিক তাঁহাদের মধ্যে কিছু লোক আড্ডা-রসিক। তাঁহারা বর্ষার ঘনঘটায় ঘনীভূত আড্ডায় জমিয়া পরনিন্দা, পরচর্চা, ভূতের গল্প করিতে ভালোবাসেন। আর যাঁহারা ভোজন-রসিক তাঁহাদের মনে পড়ে খিচুড়ির কথা, প্রিয়ার কথা নয়। তাছাড়া আমার মনে হয়, যে প্রিয়ার কথা আমরা কালিদাসে, বৈষ্ণব-পদাবলীতে, রবীন্দ্র কাব্যে পড়িয়াছি সে রকম প্রিয়া এ যুগে বিরলও বটে। ধাক্কাধাক্কি করিয়া যাঁহার সহিত ট্রামে বাসে উঠিতে হয়, আপিসে যাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, বাজার করিতে হয়, তিনি নিশ্চয় তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বধরোষ্ঠি—পর্যায়ের প্রিয়া নন, তিনি বহ্নি-প্রকৃতি নকল-দশনা রুজ-রঞ্জিতাধরোষ্ঠি এবং তিনি সবলা। প্রিয়ারা প্রায়ই অবলা হন। এ যুগে সে প্রিয়া নাই। সেদিন পর্যন্ত ছিল। কবি

মোহিতলালের যুগেও ছিল। তিনি তাঁহার 'বাদল রাতের গানে' লিখিয়াছেন—

বাদল মেঘের অশ্রুজলে
দেখছি যে তার কুম্ভ ভরা
উছলে ওঠে কক্ষ তলে
আঁকড়ে তবু বক্ষে ধরা।

ঠিক এরকমটি আজকাল আর দেখা যায় না। ছাতা-মাথায়, বর্ষাতি-গায়ে পাতুকা-শোভিতা রমণীরাই আজকাল সুলভ। কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'আষাঢ়' কবিতায় আছে—

মনের কামিনী ফুটেছে আজিকে বনের কামিনী সাথে
পেয়ে কি মাধুরী আজিকে আতুরী ঝাঁকের দাতুরী মাতে

সাধারণ লোকেদের মধ্যে অনেকেই জানেন না দাতুরী মানে ব্যাং। ব্যাঙের ডাক তাঁহারা পছন্দ করেন না। কামিনী ফুলও খুব বেশী লোক চেনে না, যাঁহারা চেনেনও তাঁহারা বর্ষায় তাহা লইয়া মাথা ঘামান না। তাঁহারা আজকাল মাথা ঘামান র‍্যাশান লইয়া।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'বর্ষা' কবিতাটিতে প্রিয়াকে লইয়া বেশী মাথা ঘামান নাই। তাঁহার কবিতার সুরটি অন্য রকম—

ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগলি জেগেছে
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে, ছুঁয়েছে সব ঠাঁই
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই।
মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে
বিশাল শাখা পাতায় ঢাকা শালের বনেতে
হঠাৎ ছুটে দৌড়ে এসে গেয়ালের ঝোঁকে
ভিজিয়ে দিল ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে।

এ কাবতায় ঘননীল-বসনার দেখা পাই না। এ কবিতায় মেঘদূতে বর্ণিত হস্তিযুথ বা উড্ডীয়মান পর্বতশৃঙ্গের মতো মেঘের বর্ণনাও নাই—এ কবিতাটি তবু চমৎকার। এ কবিতার শেষ স্তবকে আছে—

বাদল হাওয়ায় আজকে আমার পাগলি মেতেছে
ছিন্ন কাঁথা সূর্য শশীর সভায় পেতেছে
আপন মনে গান গাহে সে—নাই কিছু দৃকপাত
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত।

কিন্তু এ যুগের আমরা বর্ষা দেখিয়া কি মুগ্ধ হই? হই না। বরং বিরক্ত হই। মনে হয় জ্বালাতন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় তাঁহার 'নববর্ষা' কবিতায় যে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

শ্যাম গম্ভীর নব-মেঘে আজি উঠে বাজি মৃদু মৃদঙ্গে
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি
ধারা-মঞ্জীরে নভ-অঙ্গনা সঙ্গত করে সে সঙ্গে
রিমি রিমি ঝিমি ঝিমি

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক যে গভীর সহানুভূতির সহিত 'বাদলে' কবিতায় পল্লী-বর্ষার চিত্র আঁকিয়াছেন—

প্রাতে ঝিম ঝিম ঝরিতেছে জল
কৃষক পুরানো 'বোখে'
যতনে মাথায় রেখে
ছুটে যায় ক্ষেত-পানে পুলক-বিহ্বল,
মাঠে কিছু নাই আর
থই থই চারিধার
অজয়ে নামিছে জল করি কলকল।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্ষায়' কবিতায় যে আবেগভরে বর্ষার বর্ণনা করিয়াছেন—

যূথী মালঞ্চে ফুল ছড়াছড়ি
মুকুতার পাঁতি যায় গড়াগড়ি
ধুলা কাদা মাখা পাঁপড়িতে ঢাকা কামিনী তরুর তলা
দূর নির্জনে তমালের ডালে
শ্যামলা মালতী সুধাধারা ঢালে
বন-তমালের কানে কানে তার কি কথা হ'ল না বলা—

মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়ার শিব-ভক্ত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় বিদেশে রোগশয্যায় শয়ন করিয়া এক বর্ষাহীন 'আষাঢ়-মধ্যাহ্নে' যে কল্পনাভরে শিবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—

নীলমূর্তি বর্ষাকাশ শতচ্ছিন্ন বেশ বাস
উদাসীন কারেও না চায়
পূবের জানালা ঘেঁষে বিল্বশাখা নুয়ে এসে
কণ্টকিত ত্রিপত্র নাচায়
শাখাও দিগন্ত ফুঁড়ে উচ্চতাল চুড়ে চুড়ে
রুদ্রসেনা তুলেছে ত্রিশূল
অচেনা বিদেশ বাসে কোথা হতে কানে আসে
অদূর নদীর কুলুকুল।
ভগ্ন দেহ রুগ্ন মন নিবিড় নীল গগন
বাতায়নে লৌহদণ্ড সারি
মাঠ পরে মাঠ শুধু আষাঢ়েও করে ধূ ধূ
হে সুন্দর, হে বন্ধু আমারি—

সে আনন্দ, সে সহানুভূতি, সে আবেগ, সে কল্পনা আমাদের কি আছে? নাই। আজকালকার আমরা নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক, ক্ষুধিত, বঞ্চিত, ক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ, মাথার ঘায়ে পাগল কুকুরের মতো উদ্ভ্রান্ত অসহায়। আমরা কোনও কিছুই আর প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারি না। সে শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই ব্যঙ্গরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের জন্য 'বর্ষায়' নামে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহাতেও কবিত্বের নাম-গন্ধ নাই। তাহা নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক কবিতা। সেই কবিতাটি আপনারা শুনুন। হয়তো ভাল লাগিবে।

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌টাপ। বাতাসে পাতাঝরে ঝুপঝাপ্।
প্রবল ঝড় বহে—আম্র কাঠাল সব। পড়িছে চারিদিকে ধুপ ধাপ্। বজ্র কড় কড় হাঁকে। গিন্নী শুয়ে বৌমাকে। 'কাপড় তোল বড়ি তোল।' ঘন হাঁকে। অমনি ছাদের উপর তুপ্‌দাপ। —আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে। জোলো হাওয়া বহে বেগে। ছেলেরা বেরোতে না পেরে রেগে। ঘরের

ভিতরে করে হুপ্‌হাপ্‌। —ছুটিল একি হল ভাবি! ঊর্ধ্বলাঙ্গুল গাভী। এ সময়ে মুড়ি দিয়ে রেকাবি রেকাবি ফুলুরি খেতে হয় কুপ্‌কাপ্‌। —বৃষ্টি নামিল তোড়ে। রাস্তা কর্দমে ভোরে। ছত্রমস্তকে রাস্তার মোড়ে। পিছলে পড়ে সবে টুপ্‌টাপ। —ভিজিছে নিঝঝুম শাখী। শালিক ফিঙে টিয়া পাখী। আমি কি করি ভেবে না পেয়ে একাকী। ঘরেতে বসে আছি চুপচাপ।

এমন বাস্তববাদী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু আধুনিক কবি বলিয়া গণ্য নন। তাহার কারণ বোধহয় তাঁহার কবিতার মানে স্পষ্ট বোঝা যায়। বর্ষাকেও কি আমরা ভালো বুঝিতে পারি? বলিতে ইচ্ছা করে—

হে বর্ষা—
স্নিগ্ধ তোমার মেঘের তলে
বিদ্যুতেরি বহ্নি জ্বলে
তোমার ঘন অন্ধকারে
চাই যাহারে পাই না তারে
তোমার বৃষ্টি তোমার ঝড়ে
মোদের সৃষ্টি লুটিয়ে পড়ে
তবু তোমায় চাই যে কেন
বলতে পার?

নমস্কার।*

* সাহিত্য-তীর্থের আষাঢ়রস্ক প্রথম দিবসের সভায় তীর্থপতির ভাষণ। সাহিত্য-তীর্থের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন দত্ত (যমদত্ত)

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত (যমদত্ত) কিছুদিন আগে স্বর্গীয় হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের রসজগত হইতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। তিনি যে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন এ কথা রসিকরাই জানিতেন। রাম-শ্যাম-যদু জাতীয় লেখকদের মতো আত্মবিজ্ঞাপনের মেকি জৌলুষ লইয়া ক্ষণিক খ্যাতি লাভ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে রসিক সমাজ বলিবেন যে তাঁহার মতো সুরসিক, সুপণ্ডিত, সুবিদগ্ধ, সুলেখক বাংলা সাহিত্যে বিরল। পেশায় তিনি উকীল ছিলেন। শুনিয়াছি ইসলাম আইনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বাংলাদেশের অনেক প্রাচীন পরিবারের প্রাচীন কাহিনী, প্রাচীন নিয়ম তাঁহার লেখায় বিধৃত হইয়া আছে। তিনি খাঁটি বাঙালী ছিলেন।

পরলোকে তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক এই কামনা করি।

নিরানন্দের নববর্ষ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা সকলে আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। এই সভায় যাঁহারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাঁহাদের প্রণাম এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের আশীর্বাদ জানাইতেছি। আর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি সম্প্রতি পরলোকগত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে, প্রতিভাবান সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলীকে এবং প্রবীণ সাহিত্যবন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে।

বঙ্গবাসীর মুকুট হইতে সহসা কয়েকটি উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িল। প্রার্থনা করি তাঁহাদের অন্তরআত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

আজ শুভ নববর্ষের প্রথম দিন, আজ আমাদের আশা ও আনন্দের দিন। কিন্তু কোথাও কোনো আশার আশ্বাস নাই, নিরানন্দে সমস্ত বুক ভরিয়া রহিয়াছে। এই রাজ্যের কু-শাসনে আমরা জীবন্মৃত। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস শুধু দুর্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্যও। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহার মূল কারণ অবশ্য সামগ্রিকভাবে আমাদের চারিত্রিক অধঃপতন। গভর্ণমেণ্ট এ অধঃপতন রোধ করিবার কোনো আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। বাজারে থিয়েটারের নামে যে ধরনের বেলেল্লাগিরিকে প্রশ্রয় দিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্কুলে যে ভাবে রাজনীতির দলাদলি সক্রিয় তাহাতে মনে হয় না আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ লইয়া আমাদের সরকার মাথা ঘামান। তাঁহারা বারংবার দিল্লী যান, জেলায় জেলায় 'টুর' করেন এবং বক্তৃতা দেন।

সাহিত্যিকদের কর্তব্য এমন কিছু সৃষ্টি করা যাহা দেশের মনকে মহতের দিকে বৃহতের দিতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। কোনো কোনো সাহিত্যিক হয়তো তাহা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের শ্রম পণ্ডশ্রম হইতেছে—সে সব লেখা 'পপুলার' হয় না। অধিকাংশ সাহিত্যিকই পপুলার হইবার জন্য ব্যস্ত। সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলিও সাহিত্যের অগ্রগতিকে বাধা দিতেছে।

আমাদের দেশে কয়েকটি খবরের কাগজ আছে। কিন্তু তাহারা সব খবর নিরপেক্ষভাবে প্রচার করে না। নিজেদের মনোমত বা দলগত খবরগুলি 'ক্লাস' করে, অপ্রিয় সত্য খবরগুলি 'ব্লাকআউট' করে। সুতরাং এমন খবরের কাগজ দেশকে সত্যপথে চালাইতে পারে না।

কোনোদিক দিয়াই আশার আলো দেখিতে পাইতেছি না। তবে কি আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? না।

আসুন, এই শুভদিনে আমরা কয়জন দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি, আমরা শত বাধা বিপদ সত্ত্বেও সত্য-শিব-

সুন্দরের দিকেই অগ্রসর হইব। সত্যের পথ ক্ষুরস্য ধারা, হয়তো রক্তাক্ত চরণে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে তবু আমরা থামিব না। আসুন এই শপথ গ্রহণ করিয়াই আজ নববর্ষের উদ্বোধন করি। নমস্কার।*

* 'সাহিত্যতীর্থ' একবিংশ বর্ষে নববর্ষ বরণোৎসবে তীর্থপতির অভিভাষণ

বেমানান রকম বড়

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। এই সভায় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। সে সুযোগ দিয়েছেন বলে বিদ্যার্থীরঞ্জন বিদ্যাসাগর জন্মোৎসব সমিতির কর্তৃপক্ষকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিদ্যাসাগর অসাধারণ পুরুষ। শুধু অসাধারণ নয়, বাঙালী জাতির ইতিহাসে তিনিই অদ্বিতীয় একক পুরুষ, যিনি সর্বস্ব পণ করে নিজের বিবেককে অনুসরণ করেছিলেন, যাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি সভ্য মানব-সমাজের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল সূর্যের মতো চিরকাল প্রদীপ্ত হয়ে থাকবে। তাঁর সমসাময়িক ইতিহাস পড়লে মনে হয় এদেশের পক্ষে বড় বেমানান রকম বড় ছিলেন তিনি। চড়ুইদের দেশে ঈগল পাখীর মতো, কচুবনে রেড-উড অরণ্যের গগনচুম্বী মহা মহীরুহের মতো, অনার্যদের মধ্যে বলিষ্ঠ আদর্শবাদী আর্যের মতো বেমানান ছিলেন তিনি এদেশে। বাল্যকাল থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর ধীমত্তার, তাঁর পৌরুষের, তাঁর মনুষ্যত্বের দীপ্তি সমান সমুজ্জ্বল ছিল। তিনি একদিনের জন্যও অন্যায়ের কাছে শির নত করেননি, লোকাচারের সঙ্গে আপোষ করেননি, কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেননি। তিনি দেশের জন্য যা হিতকর মনে করতেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অকুতোভয়ে করে গেছেন, স্তুতি

নিন্দায় বিচলিত হননি। পারিষদের চাটুবাক্য বা শত্রুপক্ষের দুর্বাক্য তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারেননি।

লোকে তাঁকে 'দয়ার সাগর' বলে। তিনি অতিশয় দয়ালু লোক ছিলেন সন্দেহ নেই। তাঁর দয়ার সুযোগ নিয়ে বহুলোক তাঁকে ঠকিয়েছে। কিন্তু দয়ার সাগর বললেই তাঁর পুরো পরিচয় দেওয়া হয় না, কর্মের সাগর বললে তবু খানিকটা হয়। দেশের দুর্দশা মোচনের জন্য তিনি না করেছেন কি? আমাদের দেশে শিক্ষা-প্রচারের অগ্রণী তিনি। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারে তিনিই পথপ্রদর্শক। এই শিক্ষা ব্যাপারেই তদানীন্তন সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল বলে তিনি 'সাতশ' টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিতে ইতস্ততঃ করেননি। তাঁর মতো নারীবন্ধু আর কে ছিল সে যুগে? আমাদের সমাজে বালবিধবাদের দুরবস্থায় বিচলিত হয়ে তিনি বিধবাদের বিবাহ দিয়েছিলেন, এর জন্য তাঁর ৮৪০০০ টাকা ধার হয়েছিল। বহুবিবাহ রোধ করবার প্রয়াসও করেছিলেন তিনি। তিনিই সর্বপ্রথম মেয়েদের শিক্ষালাভ করবার জন্য নিজের খরচে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ছেলেরা যাতে স্বল্প ব্যয়ে কলেজে পড়তে পারে তার জন্য তিনি মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তিনিই স্থাপন করেন হিন্দু অ্যানুয়িটি ফাণ্ড যাতে বাড়ির উপার্জনক্ষম কর্তা অকালে মারা গেলে তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে না মারা যায়।

আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক তিনি। তিনিই প্রথম সার্থক বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা, বোধহয় তিনিই সে যুগে প্রথম সার্থক বাঙালী পুস্তক-ব্যবসায়ী। চেষ্টা করলে তিনি যে সৃষ্টিধর্মী লেখকও হতে পারতেন তারও প্রমাণ আছে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে। দেশের জন্য তিনি এত করেছিলেন তবু দেশের লোক তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে গালাগালি দিয়েছে, নানাভাবে তাঁকে ঠকিয়েছে, এমন কি শেষপর্যন্ত তাঁর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আস্তিক ছিলেন কি নাস্তিক ছিলেন তা সঠিক জানা যায় না কিন্তু একটা জিনিস জানা যায় তিনি পিতামাতাকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। তাঁর মা ভগবতী দেবীকে ভগবতীর মতোই জ্ঞান করতেন তিনি। পিতামাতাই তাঁর কাছে জীবন্ত ভগবান ছিলেন।

আগেই বলেছি বাঙালী জাতির ইতিহাসে এই মহাপুরুষ অদ্বিতীয়। পাণ্ডিত্যে, মনুষ্যত্বে, বিক্রমে, স্বদেশপ্রেমে আকাশচুম্বী পর্বতের মতো নিঃসঙ্গ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি অর্ধ-বিস্মৃত ইতিহাসের চক্রবাল রেখায়। ১৫৩ বছরের দূরত্ব থেকেই তাঁকে প্রণাম নিবেদন করছি আর মনে মনে বলছি—তুমি কি আর আসবে না? এখনও যে আমরা তেমনি হতভাগ্য, তেমনি অসহায়। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারিনি। তুমি এসো, আমাদের হাত ধরে টেনে তোল। নমস্কার।*

বিদ্যার্থীরঞ্জন আয়োজিত বিদ্যাসাগর জন্মোৎসব সভায় সভাপতির ভাষণ

আলো

মাননীয় সভাপতিমহাশয়,
সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের এই উৎসবের দিনে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। উৎসবে আমরা সেই আনন্দ অন্বেষণ করি যে আনন্দ অন্য কোন মাপ-কাঠি দিয়া মাপা যায় না। আনন্দের মাপকাঠি আনন্দই। দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি আনন্দময় উৎসবের দিনে। আনন্দ লাভই জীবনের পরম প্রাপ্তি। ভগবানকে ঋষিরা আনন্দ-স্বরূপ বলিয়াছেন। সেই আনন্দ-স্বরূপকে আমরা নানাক্ষেত্রে নানাভাবে খুঁজিয়া বেড়াই। আমাদের সাহিত্য ফিল্ম-সঙ্গীত, সংস্কৃতি সবই এই জন্য।

ইলেক্ট্রিসিটি যন্ত্রসহযোগে আমাদের বাহিরে অন্ধকার দূর করে। যন্ত্র বিকল হইলেই তাহা নিবিয়া যায়। কিন্তু উৎসবের আলো, মনের আলো, উৎসবের আকাঙ্ক্ষা সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা। সে আলো অনির্বাণ।

কামনা করি আপনাদের উৎসব আনন্দময় হোক। নমস্কার *

বক্তৃতা ও কাজ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতিপূর্বে একটা সভায় আমি মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। কাগজে দেখিয়াছি আপনারাও পায়ে-হাঁটিয়া একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। ফল কিন্তু কিছুই হয় নাই। আমাদের এখন বক্তৃতা দিবার বা মিছিল করিবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বিপক্ষ দলেরও স্বাধীনতা আছে সে সব বক্তৃতা অগ্রাহ্য করিবার। আমরা যদি একতাবদ্ধ হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইতে পারি তাহা হইলে শুধু বক্তৃতা বা ফাঁকা আন্দোলনের দ্বারা কোনও কাজ হইবে না। মূল্যবৃদ্ধি সত্যই বন্ধ করিতে হইলে আপনাদের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সক্রিয় হইতে হইবে। এবং তাহা হইতে হইলে— সর্বপ্রথম চাই নির্ভীক চরিত্র বল! এই চরিত্র বলের মহিমা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগে, প্রত্যক্ষ করিয়াছি মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—এই পণ না করিলে কোন দুঃসাধ্য কাজ করা যায় না। আমাদের সরকার জানেন যে জনগণের ভোট লইয়া তাঁহারা শাসক-মঞ্চে পাঁচ বৎসরের জন্য আসিয়াছেন—এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে সেই জনগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে তবু তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন। ইহাতে মনে হয়, হয় তাঁহারা মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে অক্ষম অথবা মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে অনিচ্ছুক। আমরা ইহার প্রতিকার করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছি? শুধু বক্তৃতা করা আর সভা করা? এবং সেই বক্তৃতা ও সভার সচিত্র খবর সংবাদপত্রে বাহির করা? কিন্তু আমার মনে হয় ইহাতে কিছুই হইবে না। শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। সে শক্তি অহিংস হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু বক্তৃতা দিয়া কালোবাজারীদের মন গলাইতে কেহ পারে নাই আমরাও পারিব না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সশক্তি সংগ্রাম না করিলে সে অন্যায়কে কখনও দমন করা যায় না। কয়েকদিন পূর্বে

বাসের পাঁচ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি লইয়া তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল। সে তুমুল কাণ্ডের মূলে কিন্তু দেশের দুঃখমোচনের প্রেরণা ছিল না, ছিল বামপন্থী-দক্ষিণপন্থীদের কলহ। রাস্তার গাড়ি থামাইয়া, দেশবাসীদের চরম দুর্দশায় নিক্ষেপ করিয়া একদল বামপন্থী দক্ষিণপন্থী সরকারকে অপদস্থ করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশবাসীর দুঃখে বিচলিত হইলে তাঁহারা অনেক পূর্বেই এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সক্রিয় অভিযান করিতেন। কিন্তু তাঁহারা করেন নাই, মাঝে মাঝে কেবল বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা করা সোজা, প্রকৃত কাজ করা শক্ত। আমরা যদি আশা করি আমাদের হইয়া কেহ আমাদের দুঃখ মোচন করিয়া দিবেন তাহা হইলে সে আশা ফলিবে না। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে হইবে, নিজের বলেই বলীয়ান হইতে হইবে। কথাটা খুবই পুরাতন, আমরা কিন্তু বার বার সেটা ভুলিয়া যাই ; তাই আর একবার মনে করাইয়া দিলাম। নমস্কার।*

সাহিত্য ও সাহিত্যিক (২)

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের এই সাহিত্য-সম্মেলনে আমি একটি কথাই বলব, সেটি হচ্ছে এই যে, কেবল সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা করে বা সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা শুনে প্রকৃত সাহিত্য-চর্চা হয় না। সাহিত্য আসর বিনোদনের উপলক্ষ নয়, সাহিত্য সাধনার বস্তু। যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করবেন তাঁদের প্রয়োজন প্রতিভার, প্রয়োজন অধ্যাবসায়ের, প্রয়োজন অধ্যয়নের আর প্রয়োজন স্তুতি নিন্দার ঊর্ধ্বে বিহার করবার ক্ষমতার। অরসিক পাঠক পাঠিকাদের চাহিদা মেটান

যেসব ফেরিওলা-সাহিত্যিক, প্রায়ই তাঁরা ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন হন। তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্য সাময়িক ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করে, তাঁরা চিরন্তন পিপাসার সুধা সৃষ্টি করতে পারেন না। পুরাতন মাসিকপত্রের পাতা-ওল্টালে এরকম অনেক মৃত বিস্মৃত সাহিত্যিকের কঙ্কাল দেখতে পাবেন। যাঁরা প্রকৃত সাহিত্য উপভোগ করেন তাঁদের সংখ্যাও কম। লেখা ছাপা হলেই তা যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয় না, তেমনি ছাপা লেখা যিনি পাঠ করতে পারেন তিনিই রসিক সমঝদার নন। রসিক সমঝদার হতে হলেও যে বিশেষ গুণ থাকা দরকার তা ভগবান সবাইকে দেন না।

আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠানে ভোট নিয়ে সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করা হয়, এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। আজকাল সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও যে সব লেখা প্রকাশিত হয় সে সব লেখা গুণে উৎকৃষ্ট বলে প্রকাশিত হয় না, কোনও একটা বিশেষ দলের লেখা বলে প্রচারিত হয়। এই সব দলের দলপতি সাহিত্যিক নন, ধনী! তাঁদের পারিষদরাই সেখানে বড়বড় সাহিত্যিক। এই যেখানে দেশের অবস্থা সেখানে সাহিত্য-সভা করে সাহিত্যের বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি? তাছাড়া যখন সারা দেশে এত বেকার, এত অন্নহীন, এত বস্ত্রহীন, যে দেশে শিক্ষার নামে প্রহসন চলছে, যেখানে জীবনের প্রতি স্তরে দুর্নীতি সেখানে সাহিত্যের কি কোন স্থান আছে? যে সমাজ সুসাহিত্য সৃষ্টি করবে, সুসাহিত্য উপভোগ করবে সে সমাজ আজ অনুপস্থিত। সেই ভদ্রলোকের সমাজ আগে সৃষ্টি করতে হবে, তারপর সাহিত্য। সে সমাজ সৃষ্টি করবে কে? আদর্শবাদী যুবকেরা। ইতিহাসে দেখি তারাই যুগে যুগে দেশের দুর্গতি দূর করেছে, তারাই সংস্কারের অগ্রদূত, তারাই চিরকাল পঙ্কোদ্ধার করে, তারাই জঙ্গল পরিষ্কার করে, তারাই দুর্গমকে সুগম করে। অসম্ভবকে সম্ভব করবার, অসাধ্যকে সাধ্য করবার ক্ষমতা তাদেরই, তাদেরই মুখপাত্র হয়ে শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—সম্ভবামি যুগে যুগে। কিন্তু আমাদের দেশে কোথায় তারা? নমস্কার।*

সুভদ্র মানুষ প্রফুল্লকুমার

যিনি একদিন জীবন্ত ছিলেন তিনি আজ স্মৃতিমাত্র, তাঁহার জীবন্ত স্পর্শ আর আমরা পাইব না ইহা বস্তুতই বড় ক্লেশদায়ক। কিন্তু এ ক্লেশ অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-"জন্ম-মৃত্যু দোঁহে মিশি জীবনের খেলা, যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা ফেলা।" জীবনের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সে প্রবাহকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এ প্রবাহের ছন্দে জন্ম-মৃত্যু উভয়েরই নিক্কণ। বুক ফাটিয়া গেলেও তাই মৃত্যুকে আমরা স্বীকার করি। স্বীকার করিতে বাধ্য হই। বহু আত্মীয়-স্বজনের বহু প্রিয়জনের স্মৃতিটুকু মাত্র সম্বল করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকি এবং কালক্রমে নিজেরাও স্মৃতিতে পরিণত হই।

মৃত্যু কিন্তু আমাদের একটি মহা উপকার করে। এই উপকারের কথাটা অনেক সময় আমাদের মনে থাকে না। যাঁহার যে ছবি আমরা জীবনপটে আঁকিয়া রাখি মৃত্যু সে ছবিকে অবিকৃত রাখে। জীবনে যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিয়াছি চিত্রকর-মরণ তাঁহাকে মহৎরূপে আঁকিয়া তাঁহার মহত্ত্বকে চিরস্থায়ী করে। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেক মহাপুরুষ মরণের চিত্রপটে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীকরূপে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। জীবন অনেক সময় মহত্ত্বে কলঙ্ক লেপন করে, মরণ করে না।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার মহোদয়ের সপ্তবিংশতি মৃত্যু বার্ষিকী দিবসে আজ এই কথাই মনে হইতেছে যে বহুকাল পূর্বে তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছিলাম, আমার মনে তিনি ঠিক তেমনি ভাবেই আছেন। তাঁহার একটুও পরিবর্তন হয় নাই। সেই সৌম্য স্বল্পবাক্ মৃদু হাস্যমণ্ডিত ভদ্র মূর্তি আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান আছে। অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার, সম্পাদক প্রফুল্লকুমার, স্বদেশভক্ত প্রফুল্লকুমার, লেখক প্রফুল্লকুমার, কাব্যরসিক প্রফুল্লকুমার, তরুণ উদীয়মান লেখক-লেখিকাদের উৎসাহদাতা প্রফুল্লকুমার, অক্লান্তকর্মী

প্রফুল্লকুমার—প্রফুল্লকুমারের অনেক রূপ, অনেক গুণ। এই রূপ-গুণের সমন্বয় সেকালে এমন একটি সুভদ্র পরিমণ্ডলে বিরাজ করিতেন যাহা বর্তমান যুগে প্রায় সুদুর্লভ। তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার আর শিষ্ট আচরণের কথাই আজ বার বার মনে পড়িতেছে। সে ব্যবহারে সে আচরণে কোনও চোখ ধাঁধানো চমক ছিল না. ছিল একটি সুশোভন আন্তরিকতা, ছিল এমন একটি অন্তরঙ্গতা যাহা যুগপৎ গম্ভীর এবং হৃদয়স্পর্শী। কয়েক ছত্র কবিতায় আমার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া প্রসঙ্গ সমাপন করিলাম—

চিত্রকর ছিলে নাকো, আঁকো নাই সুবিখ্যাত ছবি,
কবিতার ছন্দোবন্ধে গাহ নাই সুললিত গান,
কিন্তু তুমি গুণী ছিলে, তারও চেয়ে বড় পরিচয়
গুণীরে করিতে শ্রদ্ধা, যোগ্যতার করিতে সম্মান।
সভ্যতা ও ভদ্রতার শ্মশানেতে দাঁড়াইয়া তাই,
হে ভদ্র, তোমারি পানে ফিরে ফিরে চাই।

মানুষ

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মানসিক ব্যাধিবিশারদ চিকিৎসকবৃন্দ, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা সকলে আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। মানুষের বিষয়েই দু'চার কথা বলি। মানুষই মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয়। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে. শিল্পকলায়, শৃঙ্খলায়, বিশৃঙ্খলায়, যুদ্ধে, শান্তিতে সর্বত্র মানুষ। কখনও সে ভক্তিতে গদগদ, কখনও সে বিদ্রোহে উদ্দাম, কখনও সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত, কখনও সে অশ্রুতে বিগলিত। যে মানুষ মৃত্যু-ভয়ে ভীত, সেই মানুষই আবার হাসিমুখে ফাঁসি কাঠে উঠতে পারে, ফাঁসির আগে তার ওজন বেড়ে যায়। যে

মানুষ খাওয়ার জন্য লোলুপ সেই মানুষই আবার স্বেচ্ছায় অনশন করে মৃত্যুবরণ করে। মানুষের মধ্যে রামা, শ্যামা আছে, আবার কানাইলাল, যতীনদাসও আছে। অদ্ভুত জীব এই মানুষ। মোটামুটি আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কিছু মিল আছে কিন্তু অমিলই বেশী। মনে হয় প্রত্যেক মানুষই একটি আলাদা জগত যেন। প্রত্যেক জগতেরই নিয়ম-কানুন ভাব-ভঙ্গী বিশ্বাস-অবিশ্বাস একেবারে আলাদা, মানুষই শ্মশানে-মশানে ঘুরে মাংস মদ খেয়ে শবাসনে বসে শক্তি-সাধনা করে, মোক্ষ লাভ করবার চেষ্টা করে। মানুষই আবার পুষ্পালংকৃত বেদীতে বালগোপালকে চন্দন মালায় সজ্জিত করে মালপোর ভোগ দিয়ে সেই একই মোক্ষের দিকে অগ্রসর হ'তে চায়। কোনও মানুষের জীবনের মূল-সুর ভালোবাসা, কারো ঘৃণা, কারো হিংসা, কারো কৌতূহল, কারো বিস্ময়, কারো লোভ, কারো কাম। তার মনের সুরের সঙ্গে সমাজের মনের সুর যদি না মেলে তাহলেই অশান্তি, তাহলেই দ্বন্দ্ব, অসন্তোষ ও নানা অসুখ। অসুখের বহিঃপ্রকাশও নানারকম। এদেরই নানারকম সমন্বয়ে কেউ কবি, কেউ খেয়ালী, কেউ নেতা, কেউ যোদ্ধা, কেউ বা আবার উন্মাদ পাগল। মানুষ এমন একটা অদ্ভুত সৃষ্টি যে কোনও একটা অঙ্কের ফরমুলায় তার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। নোবেল লরিয়েট ডাক্তার Alexis Carrel তাঁর Man the Unknown নামক বিখ্যাত পুস্তকের গোড়াতেই লিখেছেন—Those who investigate the phenomena of life are as if lost in an inextricable Jungle in the midst of a magic forest, whose countlife trees unceasingly change their··· and shape. চিকিৎসক ও রোগী দুজনেই এই বিচিত্র মায়া-কাননের অধিবাসী। কে বেশী পাগল তা অনেক সময় বোঝা যায় না। বোঝা যায় না কারণ মানুষ সত্তাই দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর মতো জটিল, ফ্রয়েডের বিশ্ববিখ্যাত গবেষণাও সম্পূর্ণরূপে সে হেঁয়ালির জট ছাড়াতে পারে না। তখন কোনোপনিষদের সেই চিরন্তন প্রশ্নটি মনে জাগে—

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণম্ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তং
কেনেষিতাং বাচম্ ইসাং বদন্তি—
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি—

এর বঙ্গানুবাদ—

মনকে নিবিষ্ট করে কোন্ সে চালক
প্রাণকে চালিত করে কোন্ কর্ণধার
কাহার ইচ্ছায় মোরা বাক্য বলিতেছি—
চক্ষু দেখে কর্ণ শোনে প্রেরণায় কার—

এ প্রশ্নের উত্তর ঐ উপনিষদেই আছে। কিন্তু সে উত্তরকে সম্যক-রূপে উপলব্ধি করতে হ'লে যে সাধনা দরকার তা আমাদের নেই। তাই আমাদের মনে হয়—

মানুষ নামক জীব
জানি না তো বাঁদর কিম্বা শিব,
কখনও বা লাল তিনি, কখনও বা সবুজ
কখনও বা খুব বুদ্ধিমান কখনও বা অবুঝ।
মনে হয় খামখেয়ালী বহুরূপী তিনি
কখনও বা কুইনাইন কখনও বা চিনি
কখনও বা গদ্য তিনি কখনও বা গান
হ'তে পারে হয়তো বা তিনিই ভগবান।

এসব মনে হওয়ার কারণ আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে আমাদের এই বহুবৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য আছে। আমরা সকলেই আনন্দ-কামী। আনন্দেরই সন্ধানে আমরা কেউ কবি, কেউ যোগী, কেউ ভোগী, কেউ ত্যাগী, কেউ তস্কর, কেউ সাধু। এই আনন্দলাভই সমস্ত মানুষের একান্ত ইপ্সিত লক্ষ্য। সে আনন্দের সন্ধান কে আমাদের দেবে। বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞান না, আধ্যাত্মিক তন্ময়তা? ভোগ না ত্যাগ? যুদ্ধ না শান্তি? প্রেম না অপ্রেম? এরই উত্তর শোনবার জন্য সমস্ত মানবসভ্যতা আজ উদ্গ্রীব

হয়ে আছে। এই উত্তরের উপরই নির্ভর করছে এই সামাজিক, রাজনৈতিক, তামসিক, রাজসিক, আধ্যাত্মিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আমরা সুস্থ থাকতে পারব কিনা। যে আনন্দ কখনও মলিন হয় না সেই আনন্দের সন্ধানে আমাদের যাত্রা এখনও অব্যাহত আছে, অনেক পর্বত, অনেক অরণ্য, অনেক মরুভূমি, অনেক সমুদ্র আমরা পার হয়েছি কিন্তু এখনও আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি নি।

এক দিগন্তের পরে দেখা দেয় দিগন্ত নবীন
এক পর্বতের পরে আর এক পর্বত
সমস্যার সমাধান হয়নি আজিও
ফুরায় নি পথ। —নমস্কার

আমাদের প্রভাতকুমার

শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামীতে যিনি সর্বপ্রথমে কুন্তলীন পুরস্কারে 'পূজার চিঠি' নামে গল্প লিখিয়া পুরস্কৃত হইয়াছিলেন, একদা রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ যাঁহাকে গল্প লিখিতে প্রবৃত্ত করে আমরা আজ বাংলা সাহিত্যের সেই অনুপম গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে এই সভায় সমবেত হইয়াছি তাঁহাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিবার জন্য। এই সভার আয়োজন যে খুবই সঙ্গত হইয়াছে তাহা সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু হায়, আমাদের শ্রদ্ধা-নিবেদন একটি বা একাধিক সভা করিয়াই শেষ হইয়া যায়। বস্তুতঃ ইহার বেশী আর কিছু করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা বড় জোর রাজ্য-সরকারকে অনুরোধ করিতে পারি প্রভাতকুমারের গ্রন্থাবলীর একটি সস্তা সংস্করণ অথবা তাঁহার গল্পগুলির একটি চয়নিকা তাঁহারা বাহির করুন। আমাদের প্রচেষ্টা ইহার বেশী আর অগ্রসর হইবে না। হওয়া সম্ভবও নয়। অনেকে খেদ করেন সেকালের বড় বড় সাহিত্যিকদের একালের

আত্মকেন্দ্রিক বাঙালীরা আজকাল ভুলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ বাঙালী হয়তো ভুলিয়াছে কিন্তু সাহিত্য-রসিক বাঙালীরা ভোলে নাই। সর্বকালে সর্বদেশে এই রসিকদের নাতিবিস্তৃত জগতেই প্রকৃত স্রষ্টার, নিষ্কলুষ সাহিত্যিকদের মর্যাদা চির অম্লান। সে জগতে রসস্রষ্টা প্রভাতকুমার শ্রদ্ধার সিংহাসনে আজও সমাসীন আছেন। যে প্রভাতকুমারকে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'ছোট গল্প লেখায় পঞ্চ-পাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন। তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মতো—।' যে প্রভাতকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন—তোমার গল্প আমার খুবই ভালো লাগে। বড় বড় ফরাসী গল্প লেখকদের অপেক্ষা তোমার গল্প কোন অংশে হীন নহে। —সেই প্রভাতকুমারকে প্রকৃত সাহিত্যরসিক বাঙালীরা আজও মনে রাখিয়াছে। এই সভার উদ্যোগ তাঁহাদেরই চেষ্টায়। রামা-শ্যামা-যদু-মধুর দল তাঁহাকে মনে রাখে নাই বলিয়া খেদ করিবার প্রয়োজন নাই। লণ্ডন শহরে সেক্সপীয়রের নাম শোনে নাই এমন লোকের কথাও একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছি। ইহাই স্বাভাবিক। মুর্গির নিকট মুক্তোর দানা অপেক্ষা গমের দানা বেশী মূল্যবান। মুর্গির চক্ষে মুক্তোর দানা বাজে জিনিস। সুতরাং মুর্গিদের জগতে মুক্তোদানা কেন অনাদৃত ইহা লইয়া হা-হুতাশ করা, সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। যাহারা জহুরী তাঁহারা যথার্থ মুক্তার যথার্থ মূল্য চিরকাল দিয়াছেন।

প্রভাতকুমার অধিকাংশ সাহিত্য-স্রষ্টাদের মতো কবিতা দিয়াই সাহিত্যসাধনা শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মুখ্যতঃ তিনি তাঁহার অনবদ্য গল্প ও উপন্যাসগুলির জন্য বিখ্যাত। ত্রিশখানি গল্প সংগ্রহ ও উপন্যাস তাঁহার কীর্তি বহন করিতেছে। তাঁহার লেখার বৈশিষ্ট্য তাঁহার ভাষার স্বচ্ছতা, গল্পের প্লটের অভিনবত্ব এবং সর্বোপরি তাঁহার সকল রচনার মধ্যে হাস্য-ব্যঙ্গের সু-মধুর ফল্গুধারা। বাংলার গল্প-সাহিত্যে আর একটি অভিনবত্ব তিনি আনিয়াছিলেন। আমাদের সাহিত্যে বিলাত-ফেরত এবং বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের একটি নিখুঁত সরস চিত্র তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন। খুব সম্ভব এ চিত্র তিনিই সর্বপ্রথম

সার্থকভাবে আঁকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভাতকুমারের সাহিত্যের দীর্ঘ-আলোচনার অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। সেকালের 'দাসী' 'প্রদীপ' 'প্রবাসী' 'ভারতী' 'মানসী' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁহার রচনা প্রকাশ করিয়া যে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা এ যুগে দুর্লভ। এখন সাহিত্যক্ষেত্রেও না কি হোমরা চোমরাদের সুপারিশ না থাকিলে নবাগত সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশিত হয় না। সে যুগে এ সব ছিল না। তাই বিলাত প্রবাসী প্রভাতকুমারের সাহিত্যক্ষেত্রে অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের পীঠস্থান কলিকাতা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্যণীয়। কলিকাতা শহরে বসিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছেন এ রকম সাহিত্যিক বেশী নাই। এক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া আর কাহারও নাম তো মনে পড়িতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই কলিকাতার বাহিরে থাকিয়াই তাঁহাদের মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রভাতকুমার শেষ জীবনে 'মানসী ও মর্মবাণী'-র সম্পাদক এবং ল কলেজের অধ্যাপকরূপে কলিকাতায় কাটাইয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছিল কলিকাতার বাহিরে—জামালপুরে, সিমলায়, দার্জিলিঙে, রংপুরে এবং গয়ায়। তাঁহার পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন ই· আই· রেলের একজন সিগনালার। পিতার সহিত প্রভাতকুমার অনেক রেল-স্টেশনে ঘুরিয়াছিলেন। তাই তাঁহার গল্পে রেলওয়ে স্টেশন এবং রেলের কর্মচারীরা জীবন্ত। তাঁহার বিখ্যাত আম্রতত্ত্ব গল্পটির অন্তরালে হয়তো প্রত্যক্ষ দর্শনের কোনও প্রেরণা আছে। রসিক প্রভাতকুমারকে, রসস্রষ্টা প্রভাতকুমারকে, স্বল্পভাষী প্রভাতকুমারকে, শিষ্টাচারসম্পন্ন প্রভাতকুমারকে, নিরহঙ্কার সুমিষ্ট স্বভাব আত্মগোপন প্রয়াসী প্রভাতকুমারকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। শুধু লেখক হিসাবে নহে মানুষ হিসাবেও তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি রসিক সমাজকে যে আনন্দ একদা দিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতিদান দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা শুধু বলি—

তুমি আমাদের আপনার লোক ছিলে
মোরাও তোমার আপনার লোক আছি,
মৃত্যু তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাক
আমরা কিন্তু আছি অতি কাছাকাছি।

অভিভাষণ

আজ বিবেকানন্দ-নিবেদিতার স্মরণ সভায় প্রথমেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি। বস্তুতঃ, প্রতি বৎসর সভায় তাঁহাদের প্রণাম নিবেদন করা ছাড়া আর আমরা কিছুই করি না। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার স্বপ্নের ভারতবর্ষ আজও স্বপ্নেই নিবদ্ধ আছে, বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। সে স্বপ্নের ভারতবর্ষ কি রকম তাহাও আমরা অনেকে জানি না। তাহারই স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন মিস্ মার্গারেট নোবল—যাঁহাকে আমরা সিস্টার নিবেদিতা বলিয়া জানি।

নিবেদিতা যখন প্রথম তাঁহার গুরুকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে তিনি প্রথমে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রাচ্যের আচার্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় 'As a personality my master stands out in my memory against his proper back ground of Indian forest, city and high way, an Eastern teacher in an Eastern World. কিন্তু তাঁহার এ ভুল ভাঙিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বামীজী শুধু প্রাচ্যের নন, তিনি সমগ্র জগতের। তিনি সূর্য। সূর্য কোন বিশেষ দেশের সম্পত্তি নহে।

স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য, যে শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যকে স্বচ্ছ-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যাঁহার উপলব্ধিতে কোনও ভেদবুদ্ধি ছিল

না, যিনি মনে করিতেন—যত মত তত পথ, যাঁহার নিকট অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ একই সত্যের বিভিন্ন দিক মাত্র। আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং নিরাকার পরমব্রহ্ম যাঁহার দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয় নাই, মা কালীর পূজা করিয়াই যিনি পরমব্রহ্মকে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন—এই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার এই মহাসমন্বয়বাণী তিনি জগতে প্রচার করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এই বিবেকানন্দের মধ্যে কিন্তু আর এক বিবেকানন্দ ছিলেন যিনি বিশেষ করিয়া ভারতের যিনি বিশেষ করিয়া আমাদের সুখদুঃখের অংশীদার, আমাদের অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত, আমাদের অনাগত ভবিষ্যত সম্বন্ধে শঙ্কিত, যিনি বলিয়াছিলেন—সাবধান, সম্মুখে অনেক বাধা-বিপত্তি ঝড়-ঝঞ্ঝা, পর্বত-মরু। সে সব অতিক্রম করিয়া তবে আমরা নিরাপদ বন্দরে পৌঁছিব। নিবেদিতার ডায়েরিতে আছে—
his face took on a new light, as if he were actually seeing into the future : and he told of the mixture of races and of the great tumults, the terrible tumults through which the next state of things must be reached. 'And these are the signs'—he quoted from old books —The Kali-puga is about to thicken, when money comes to be worshipped as God, when might is right and when man oppress the weak. যে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—ভুলিও না নীচ জাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই······ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী—বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ—

যে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—তোরা কি কচ্ছিস? এত বিদ্যে শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত চাকরি দাও চাকরি দাও বলে চেঁচাচ্ছিস। জুতো খেয়ে খেয়ে দাসত্ব করে করে তোরা কি মানুষ আছিস? তোদের মূল্য এক কাণা কড়িও নয়। এমন সুজলা সুফলা

দেশ যেখানে প্রকৃতি অন্য দেশের চেয়ে কোটিগুণ ধন-ধান্য প্রসব করছেন সেখানে দেহ ধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই, পিঠে কাপড় নেই……তোরা আবার বেদ বেদান্তের বড়াই করিস। যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে সে জাতের আবার বড়াই—

যে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—যেখানে জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকে ধর্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ; বিদ্যা কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

এই বিবেকানন্দ প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের যে স্বপ্ন দেখিতেন তাহা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গেই কীর্তিমান্। আর এই বিবেকানন্দেরই যোগ্য শিষ্যা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারতবর্ষকে মূর্ত করিবার জন্য তিনি সারা জীবন যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। যতটুকু হইয়াছে ততটুকু পড়িয়া আমরা জানিতে পারি—তিনি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া বাগবাজারের একটা এঁদো গলিতে নানা অপমান কটূক্তি এবং ব্যঙ্গ সহ্য করিয়া বালিকাদের শিক্ষাদান ব্রতে নিষ্ঠার সহিত নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতায় প্লেগ রোগীদের তিনি শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। অনুশীলন সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন তিনি, ইংরেজ-বিদ্রোহী শ্রীঅরবিন্দকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন। শুধু ইহাই নহে, দেশের শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির নানা মহলে তাঁহার আনাগোনা ছিল, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে তিনিই বিদেশী শিল্পকলা পদ্ধতির বাঁধা পথ ছাড়িয়া ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির নবদিগন্তের দিকে অগ্রসর হতেই উৎসাহ দেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পীগণকে অজন্তায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থাও

তিনি করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সফল করিবার তপস্যায় নিজেও তিনি যে স্বপ্ন দেখিতেন তাহার আভাস পাই 'কালী দি মাদার' প্রবন্ধে এবং তাঁহার 'The Web of Indian Life' বইটিতে। ভারতের নানা সমস্যার নানা ভাবনার, নানা ঐশ্বর্যের ছাপ আছে বইটিতে। আর ছাপ আছে তাঁহার স্বপ্নাবিষ্ট কবি মানসের। এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—Why asked my heart, does one come to this spot? For what thing, above all others, does the world remember Kurukshetra? And then I saw why, never to forget, Kurukshetra was the place of the Great Vision, The field of the Divine Illumination of Arjuna.

অর্জুন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ।

কিন্তু হায়, বিবেকানন্দ, নিবেদিতার স্বপ্ন এখনও মূর্ত হয় নাই। এখনও আমরা তেমনি ভিক্ষুক, তেমনি অধঃপতিত আছি। একটি ছবি বারবার আমার মনে উদিত হয়—বিবেকানন্দের শবদেহ শায়িত রহিয়াছে এবং নিবেদিতা তাঁহার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতেছেন। তাঁহার চোখে একবিন্দু অশ্রু নাই। ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যু হইয়াছিল দার্জিলিঙে। হিমালয়ের ক্রোড়ে, যে হিমালয় স্বামীজীর অতি প্রিয় স্থান ছিল এবং যে হিমালয় নিবেদিতার চক্ষে স্বামীজীরই প্রতীকরূপে সর্বদা প্রতিভাত হইত, সেই হিমালয়ের ক্রোড়েই তাঁহার অন্তিম নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বেলুড় মঠে দান করিয়া গিয়াছিলেন ভারতীয় পদ্ধতিতে নারীদের শিক্ষার জন্য।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতার জীবন-চরিতে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিতেছেন 'হিমালয়ের তুষার শিখরে তখন সবে সূর্যের আবির্ভাব হইয়াছে, নবারুণ রশ্মির এক ঝলক আসিয়া পড়িল কক্ষের মধ্যে আর সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার আত্মা বিলীন হইয়া গেল অসীম অনন্ত সত্তায়।'

রামকৃষ্ণ নাই, বিবেকানন্দ নাই, নিবেদিতা নাই। আমরা এখন কি করিব? চারিদিকে অন্ধকার এখনও যে সূচীভেদ্য। কে আমাদের পথ

দেখাইবে ? আমরা কি ধম্‌পদের সেই অমর বাণী অনুসরণ করিতে পারিব ?

সম্মুখে পথ নাই তবু আগাইয়া চল
ভয় করিও না, চিন্তা করিও না
একলা চল,
দ্বি-খড়্গী গণ্ডারের মতো।
সিংহের মতো চল
কোন শব্দে বিচলিত হইও না
বাতাসের মতো চল
কোন জালে আবদ্ধ হইও না
জলবিন্দু-নির্বিকার পদ্মপত্রের মতো
বন্ধনবর্জিত হও
একা আগাইয়া চল
দ্বি-খড়্গী গণ্ডারের মতো।

এ মহাবাণীকে মর্যাদা দিবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে ? কে জানে !*

* স্বামীজী-নিবেদিতা দিবসে প্রধান অতিথি শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) প্রদত্ত ভাষণ।

কবিরাই সত্যদ্রষ্টা

বঙ্গীয় কবি-পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। বঙ্গীয় কবি-পরিষদের দশম বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। বাঙালী কবিদের নাম আজ পৃথিবী-ব্যাপী। ইহার প্রথম কারণ রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় কারণ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আজ বাংলা ভাষাকেও পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে। বাংলা কবিতার প্রচার-গণ্ডী যেমন বাড়িয়াছে তেমনি বাঙালী কবিদের দায়িত্বও অনেক বাড়িয়াছে। তাঁহাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে যাহা খুশী কবিতার আকারে লিখিয়া তাহা ছাপাইলেই আমাদের খ্যাতি বাড়িবে না। রসিক-সমাজে যাহা সত্যই কবিতা বলিয়া গণ্য সেইরূপ কবিতাই বিশ্বের দরবারে লইয়া যাইতে হইবে। ইহার পরই প্রশ্ন উঠিবে ভালো কবিতা কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। মিষ্টত্ব কি তাহা কি আপনি কথায় বলিয়া বুঝাইতে পারেন? পারা সম্ভব নয়। মিষ্ট তিক্ত কটু কষায় লবণ, কোন স্বাদেরই স্বরূপ বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। ভগবান রসনা নামক যে যন্ত্রটি আমাদের দিয়াছেন সেই কেবল নির্ণয় করিতে পারে কোনটা কি স্বাদের। আমরা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ উপভোগ করি, চক্ষু দিয়া যাহা উপভোগ করি অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা পারি না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কাব্যজগতের তেমনি। সকলে কাব্য সৃষ্টি করিতে পারে না, সকলে কাব্য উপভোগও করিতে পারে না। যাঁহারা কাব্য সৃষ্টি করেন তাঁহাদের নাম কবি, যাঁহারা উপভোগ করেন তাঁহাদের নাম রসিক। যে রস কাব্যের প্রাণস্বরূপ সেই রসের বিচারক রসিক। একমাত্র রসিকই বলিতে পারেন কোনও কাব্য রসোত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা। চক্ষু যেমন আলো-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, কর্ণ যেমন শব্দ-বিষয়ে, জিহ্বা যেমন স্বাদ-বিষয়ে তেমনি রসের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রসিক। এখন প্রশ্ন উঠিবে—রস কি? আলো কি তাহা যেমন চক্ষুর মাধ্যমে বুঝিতে হয়, মিষ্টত্ব কি তাহা রসনার দ্বারা অনুভব করিতে হয়, তেমনি রস কি তাহার সন্ধানও পাওয়া সম্ভব রসিকেরই মাধ্যমে। তবু রসের নানাবিধ সংজ্ঞা আলঙ্কারিকেরা নির্দেশ করিয়াছেন। একটা সংজ্ঞা—ভাবতন্ময় চিত্তে আত্মানন্দ প্রকাশই রস। এই রস ব্রহ্মস্বাদসহোদর। নীরস হেঁয়ালিপূর্ণ রচনা কখনও কাব্যের মহিমা লাভ করিবে না। রসই কবিতার প্রাণ। কোনরূপ চালিয়াতি বা অবান্তর

ঢং রসের ক্ষেত্রে অচল। রস অতিশয় সূক্ষ্ম সুকুমার জিনিস, কোনও স্থূলতার ভার বহন করিতে তাহা অক্ষম—তা সে ভার পাণ্ডিত্যেরই হোক বা মূর্খতারই হোক। প্রকৃত কবিতা হইবে এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল প্রকাশ যাহা শুনিবামাত্র তাহার রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে রসিকের মনে কোনও সন্দেহ থাকিবে না, যাহা টিনের শুষ্ক গুঁড়া দুধ নহে, যাহা মাতৃস্তন্যক্ষরিত অমৃত। যাঁহারা প্রকৃত কবি তাঁহারাই রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখিতে পারেন, যাঁহারা কবিযশঃপ্রার্থী অকবি তাঁহারা পারেন না। এই কবিযশঃপ্রার্থী অকবিরাই তাঁহাদের কবিতা ব্যাখ্যা করিবার জন্য আকাশ-পাতাল তোলপাড় করেন বড় বড় পণ্ডিতদের সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করেন, বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদে কান ঝালাপালা করিয়া দেন। প্রকৃত কবিতার জন্য এত প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত কবিতা—সন্ধ্যার মতো, উষার মতো, জ্যোৎস্নার মতো মধ্যাহ্ন দীপ্তির মতো, পুষ্পের মতো, অরণ্যের মতো, সমুদ্রের মতো, নদীর মতো, নির্ঝরের মতো, পর্বতের মতো—তাহার মহিমা, তাহার শোভা, তাহার বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতার বক্তব্য চির পুরাতন, পরিবেশনের কৌশলে তাহা নিত্যনূতন রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের যুগ, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ, শ্রীচৈতন্যের যুগ, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর যুগ, পাঁচালি, কবি গান যাত্রার যুগ, ঈশ্বর গুপ্ত—রঙ্গলাল—মাইকেল মধুসূদন দত্ত—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় —নবীনচন্দ্র সেন—বিহারীলাল চক্রবর্তীর যুগ, তাহার পর রবীন্দ্রনাথের যুগ, এখনও রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিতেছে। প্রত্যেক যুগেই পরিবেশনের কৌশলে, নবীন প্রতিভার আবির্ভাবে কবি-কল্পনার বিশিষ্ট প্রবণতায় একই বক্তব্য নূতন রূপ, নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে। অসাধ্য-সাধন-পটিয়সী কবি-প্রতিভাই তাহা সম্ভব করিয়াছে। এই কবি-প্রতিভা জন্ম-লব্ধ। চেষ্টা করিয়া বিদ্বান হওয়া যায়, কবি হওয়া যায় না। একটা গল্প শুনিয়াছিলাম—নারদ নাকি একদিন ভগবানকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'প্রভু আপনার তো কোনও অভাব নাই, আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, স্বয়ং লক্ষ্মী আপনার গৃহিণী। আশা

করি আপনার আর কোনও সাধ নাই।' ভগবান উত্তর দিয়াছিলেন— 'আছে। আমি কবি হইতে চাই'।

প্রকৃত কবি সত্যই দুর্লভ। তাই তিনি শ্রদ্ধেয়। নকল কবি সাজিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা যেন প্রকৃত কবিকে শ্রদ্ধা করিতে পারি। কাহারও মধ্যে কবি-প্রতিভা যদি থাকে, তাহা যথাসময়ে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে—সেই অনাগত কবিকে অভিনন্দন করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করি। কবিরাই সৃষ্টিকর্তা, কবিরাই সত্যদ্রষ্টা, কবির প্রতিভাই সত্য শিবসুন্দরের মিলন-ভূমি— তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কোটি কোটি প্রণাম।*

* বঙ্গীয় কবি পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণ

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু-দিবস

শরৎচন্দ্রের তিরোধান দিবসে আজ প্রণাম জানাই তাঁকে, তাঁর অমর সৃষ্টিকে আর তাঁর মনুষ্যত্বকে। মহৎ মনুষ্যত্বের প্রধান চিহ্ন ভালবাসবার ক্ষমতা। যে মানুষ শুধু নিজেকে নিয়েই আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছেন তিনি বিরাট হতে পারেন, সুউচ্চ হতে পারেন কিন্তু তিনি মহৎ নন। মহত্ত্বের মানদণ্ড প্রেম। যিনি সকলকে ভালবাসতে পারেন তিনিই মহৎ। ধনী দরিদ্র পাপী পুণ্যবান, বিদ্বান মূর্খ, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে যিনি শুধু ভালবাসেন না, সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন তিনিই মহৎ লোক। ধর্মজগতে এঁরা মহাপুরুষ বলে, পরিচিত, সাহিত্য-জগতে এঁরা দিকপাল সাহিত্যিক। শরৎ-সাহিত্যে আমরা শরৎচন্দ্রের এই প্রেমময় হৃদয়ের পরিচয় পাই। তিনি সর্বস্তরের মানুষকে তাঁদের ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভালোবেসেছেন মহিমান্বিত করেছেন তাঁর সৃষ্টির অমরাবতীতে। মানুষের মধ্যে সুখদুঃখ-জড়িত অসহায় মানুষকেই খুঁজেছেন তিনি, তাঁদের মধ্যেই

তিনি আবিষ্কার করেছেন জীবন-দেবতাকে। তাঁর সাহিত্যে সত্য-শিব-সুন্দর আপাত-দৃষ্টিতে যা অসত্য অশিব এবং অসুন্দর—তার মধ্যেও দীপ্যমান। তাই তিনি বড় সাহিত্যিক, তাই তিনি মহান শিল্পী।

আবার তাঁকে প্রণাম জানাই।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা-সভায় প্রথমেই তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তিনি শুধু সাহিত্যরসিক পণ্ডিত ব্যক্তিই নহেন, তিনি একজন সমাজসেবী। ত্যাগই ছিল সে সেবার প্রধান উপকরণ।

তাঁহার সহিত আমার পরিচয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া। তিনি যখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন আমি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলাম। ডাকে লেখা পাঠাইতাম। এই প্রসঙ্গে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তাহাতেই আপনারা ফণীন্দ্রনাথের অসামান্য চরিত্রের পরিচয় পাইবেন।

আমি তাঁহাকে একটি কবিতা পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে আমি ভুল করিয়া 'পুরুষাকার' লিখিয়াছিলাম। আমি তখন জানিতাম না যে কথাটি হইবে—'পুরুষকার'। কবিতা যখন ছাপা হইল তখন দেখিলাম 'পুরুষাকার' ছাপা হয় নাই, 'পুরুষকার'ই ছাপা হইয়াছে। ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমি ফণীবাবুকে চিঠি লিখিলাম—'আপনি পুরুষাকারকে পুরুষকার ছাপিয়া কবিতাটির অঙ্গহানি করিয়াছেন'। ফণীন্দ্রনাথ আমার সে পত্রের কোনও জবাব দিলেন না। তাহার পর হঠাৎ একদিন আর একজন লেখকের লেখায় দেখিলাম—পুরুষকার শব্দটি। 'ষ'-এর পর আকার নাই। তাহার পর অভিধান খুলিলাম এবং হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে একটি বাড়তি আকার যোগ করিয়া আমি আমারই বুদ্ধির আকার

বাহুল্যই প্রকাশ করিয়াছি। ফণীবাবুকে পরে যখন একথা বলিয়া মার্জনা ভিক্ষা করিলাম, তিনি বলিলেন—'লিখতে গেলে ওরকম একটু-আধটু ভুল হয়ই ও কিছু নয়।'

সেদিন ফণীবাবুর চরিত্রের এই নিরহঙ্কার অসামান্যতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

আজও আমি মুগ্ধ হইয়া আছি এই কারণে যে তাঁহার চরিত্রে কোনও ভেজাল নাই বলিয়া তিনি আমাদের দেশে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। খাঁটি সোনা বাজারে চলে না, ভেজাল দেওয়া গিনি সোনাই বেশী চলে। ক্ষীর হজম করিবার শক্তি অনেকের নাই, জোলো দুধই তাই জনপ্রিয়।

ফণীন্দ্রনাথ সম্প্রতি চোখের দৃষ্টি হারাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে-চোখ কখনও খারাপ হয় না তাঁহার সে চোখের দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত সেই মহান পুরুষের দর্শনলাভ করিয়াছেন যাহার অপর নাম সত্য যাহা শিব ও সুন্দরের সহিত অবিচ্ছেদ্য, যাহা মানবজীবনের পরম-প্রাপ্তি।

এই জ্ঞানী গুণী ত্যাগী মহাপুরুষের সম্বর্ধনা-সভায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমি ধন্য হইলাম।

মে এণ্ড বেকার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষরা

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের উৎসবের দিনে আমাকে স্মরণ করেছেন এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমি চল্লিশ বছর ডাক্তারি করেছি সেজন্য মে এণ্ড বেকার কোম্পানীর সঙ্গে পরিচয় আমার অনেক দিনের। আজ সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হল।

উৎসবই মানব-জীবনের পরম সম্পদ। বর্তমান যুগের দুঃখ, দারিদ্র্য, বিশৃঙ্খলায় আমরা সকলেই বিব্রত। এর মধ্যে উৎসবের আয়োজন করে আপনারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই সব সময়েই সেখানে জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবও চলেছে। প্রত্যেক গাছ, প্রত্যেক লতা বছরে অন্ততঃ একবার করে ফুলের সাজে নিজেদের অলঙ্কৃত করে। আকাশে মেঘের লীলা সর্বদাই প্রাণবন্ত। সারাবছর ধরে ছয় ঋতুতে ছয় রকম উৎসবের আয়োজন করেন প্রকৃতি। পাখীর দল উৎসবের আনন্দেই ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। একঘেয়ে জীবন-সংগ্রাম ক্লান্তিকর। উৎসবেই আমাদের সে ক্লান্তি অপনোদন করে। প্রার্থনা করি আপনাদের এ উৎসব সার্থক হোক।

স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ দিয়েছেন বলে, এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে মহাপুরুষের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ আমরা অর্ঘ্য নিবেদন করব বলে এখানে সমবেত হয়েছি তিনি সুবিখ্যাত, সু-পূজিত এবং সু-আলোচিত। তাঁর অনেক জীবন-চরিত, তাঁর নামে অনেক প্রতিষ্ঠান, তাঁর অনেক শিষ্য, অনেক ভক্ত। তাঁর সম্বন্ধে নূতন কিছু বলতে পারব এ স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু আমার মনে যে আক্ষেপ, যে ক্ষোভ বহুকাল থেকে ঘনীভূত হয়ে আছে তারই সম্বন্ধে কিছু বলব আজ। আমার ক্ষোভ যে দেশে বিবেকানন্দের মতো পুরুষ-প্রবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে দেশের আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক রাজনৈতিক, উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপাত করে

গেছেন, যাঁর আদর্শ রাজসিক, তামসিক বণিক-প্রবৃত্তি আমেরিকা-ইংলণ্ডেও দিব্যজ্ঞানের ও শাশ্বত সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকপাত করেছে—সেই দেশে, সেই বিরাট জ্যোতিষ্কের জন্মভূমিতে এখনও এত অন্ধকার কেন? এখনও আমরা দীন কেন, হীন কেন, মিথ্যাবাদী কেন, গুণ্ডা কেন, চোর কেন, মূর্খ কেন, ভণ্ড কেন, ভীরু কেন? এর উত্তর, আমরা বিবেকানন্দ থেকে এখনও অনেক দূরে আছি। আত্ম-আস্ফালন করবার জন্য তোতাপাখীর মতো আমরা বিবেকানন্দের নাম বারবার উচ্চারণ করেছি মাত্র, তাঁর উপদেশাবলীর দীর্ঘ তালিকাও আউড়েছি, তাঁর ছবিতে মালাচন্দন দিয়েছি, তাঁকে নিয়ে সগর্বে বক্তৃতা করেছি, কবিতা লিখেছি, তাঁর ছবি নিয়ে মিছিল করেছি—নানারকম করেছি, কিন্তু আসল কাজটি করি নি—নিজে বিবেকানন্দ হই নি। আমরা হুজুগে, আমরা সুবিধাবাদী কর্তাভজার দলে নাম লিখিয়ে মুখস্থ বুলির বাজনা বাজিয়ে বাজার সরগরম করছি। যে বিরাট মনুষ্যত্ব-ঐশ্বর্যে, যে দ্যুতিমান প্রেরণা-উদ্দীপনায়, যে বিস্ময়কর কর্ম-কল্পনার ভাস্বর-সমন্বয়ে তিনি সমুজ্জ্বল ছিলেন তা আমাদের নেই, যে শক্তি তাঁর জীবনে কৈবল্য ও বন্ধন উভয়কেই অলঙ্কারে পরিণত করেছিল সে শক্তিও আমাদের নেই। আমার এই উক্তি থেকে আপনারা মনে করবেন না আমি কাউকে নকল বিবেকানন্দ হতে বলছি। তা হওয়া সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনে অনেক মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, পওহারী বাবা, ছাড়াও আরও অনেক সাধু তপস্বীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লাভ করেছিলেন তিনি, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যধারায় অবগাহন করে বহু মনীষীর বহু চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য শ্রীচৈতন্য তাঁদের প্রতিভা-দীপ্তিতে আলোকিত করেছেন বিবেকানন্দের জীবন, বিদেশের যীশুখৃষ্ট, জরথুস্থ, মহম্মদ, ওল্ড্ টেস্টামেণ্টের এবং নিউ টেস্টামেণ্টের সাধকগণ, বিদেশী দর্শনের অগ্রগামী সুধীবৃন্দ, সকলেরই নিকট নিত্যসত্যের সন্ধানে ফিরেছেন তিনি বহুদিন কিন্তু তবু তিনি কারও 'কার্বন কপি' হন নি। হয়েছেন বিবেকানন্দ। নিজের স্বকীয়তায় প্রদীপ্ত নির্ভীক আদর্শবাদী এই

বীর সন্ন্যাসীর অনন্যতার মহিমা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। সেই অনন্যতার মূলে শুধু তাঁর প্রতিভাই ছিল না, ছিল তাঁর সত্য-সন্ধানের একাগ্রতা, ছিল তাঁর সংযম-বিশুদ্ধ নির্মল নিষ্ঠা। আমরা যদি বিবেকানন্দের পথ অনুসরণ করতে চাই তাহলে আমাদের বিবেককে জাগাতে হবে, অবগাহন করতে হবে নিখিল জ্ঞানের মহাসমুদ্রে সত্য-রত্নের সন্ধানে, দূর করতে হবে ভয়, তুচ্ছ করতে হবে ক্লান্তি, পরিহার করতে হবে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থের কল্যাণে। এ পথে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমরা হয়তো নকল বিবেকানন্দ হব না, হব স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল প্রাণবন্ত মানুষ, যে মানুষ প্রেমিক, যে মানুষ সত্যদ্রষ্টা, যে মানুষ নির্ভীক, যে মানুষ নির্লোভ, যে মানুষ নিরহঙ্কার, যে মানুষ পবিত্র, যে মানুষ বিদগ্ধ। বিবেকানন্দ আমাদের এই মানুষ হবার নির্দেশই দিয়ে গেছেন বারবার। কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি তাঁর সে নির্দেশ আমরা পালন করেছি? করিনি—করিনি—করিনি। তাই আমাদের এই দুর্দশা।

গীত-বিতানে সভাপতির ভাষণ

শ্রদ্ধেয় আচার্য মহাশয়, গীত-বিতানের কর্তৃপক্ষরা, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রীরা, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ এই সমাবর্তনে যাঁহারা উপাধিলাভ করিলেন তাঁহাদের জীবন সঙ্গীতময় হোক, তাঁহাদের সাধনা সেই সিদ্ধিলাভ করুক যাহার কবিতা-রূপ এই:

সারা জীবন বিরহ ব্যথা
সয়েছি অহরহ
সুরের পথে এসেছি আজ প্রভু
আমারে লহ লহ।

গান মানব-সভ্যতার প্রাচীন সম্পত্তি। আদিম মানব কবে কোন প্রয়োজনে কথায় সুর লাগাইয়াছিল তাহা আমরা যদিও সঠিক জানি না তবু অনুমান করিতে পারি। দূরের মানুষকে ডাকিবার প্রয়োজনে কিংবা ব্যথাবেদনার দুঃসহ পীড়নে অথবা আনন্দের আতিশয্যে আদিম মানবও সুরের সহায়তা লইয়াছিল একথা মনে করিলে খুব অসঙ্গত হইবে না। তাহার পর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সুরের ক্ষমতা বাড়িয়াছে। সে এখন কাব্যশাস্ত্রের দশটি রসকেই মূর্ত করিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছে। আজকাল সে ব্যবসায়ের পণ্যও হইয়াছে। কিন্তু যে সুর গায়কদের এবং শ্রোতাদের মনকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দেয় তাহা প্রিয়তমের নিকট আত্মনিবেদনের সুর। এই আত্মনিবেদন গদ্যে করা যায় না, কবিতাতেও সম্পূর্ণরূপে করা যায় না, সুরের সাহায্যেই খানিকটা করা যায়, তাহাও যখন সম্ভব হয় না তখন সাধক নির্বাক হইয়া সমাধিস্থ হন। ভারতীয় সঙ্গীতের লক্ষ্য প্রিয়তমের নিকট মনোবাসনা পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সুরই তাহাব শ্রেষ্ঠ যান। এই আত্মনিবেদন কখনও ভৈরবীতে, কখনও আশাবরীতে, কখনও সারং-এ, কখনও দেশে, কখনও ইমনে, কখনও বেহাগে, কখনও বাগেশ্রীতে মূর্ত হইয়াছে। আমাদের ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী এই আত্মনিবেদনের বার্তা বহন করিয়া ধন্য হইয়াছে। আমাদের দেশের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারার সুর—যেমন রামপ্রসাদী, কীর্তন, বাউল মনের মানুষের খোঁজেই ব্যাকুল। ওস্তাদী গানে কথা কম। সুরই সেখানে সব। 'বাজুবন্ধ্ খুলি খুলি যায়' অথবা 'আয় না বালম্ ক্যা করুঁ সজনী' প্রভৃতি বিখ্যাত গান সুরের লীলাময় বিস্তারই সকলকে মুগ্ধ করে এবং ওই সামান্য দুই চারিটি কথার কাব্য ইঙ্গিতই আমাদের উতলা করিয়া দেয়। বাংলা গান কিন্তু শব্দ বহুল। তাহার দুইটি রূপ। একটি সুর-বিহীন কবিতার রূপ, আর একটি সুর সমন্বিত গানের রূপ। উভয় রূপেই তাহা রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং আরও অনেকের গানে ইহার প্রমাণ মিলিবে। সুর-বিহীন রূপে আর সুর-সমন্বিত রূপে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত। ঘরে বসিয়া একটা ভালো নাটক পড়িলে আনন্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু সে আনন্দ শতগুণ হয় সে নাটক রঙ্গমঞ্চে সু-অভিনীত হইলে। তখন সে নাটকের অনেক প্রচ্ছন্ন রূপ যেন পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। তেমনি শব্দ-বহুল বাঙ্‌লা গানেরও রূপান্তর ঘটে যখন সে সুরের লীলামঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। তাহাতে যদি হৃদয়াবেগের জীবন্ত ছোঁয়া না লাগে তাহা হইলে গানের বক্তব্যটি ঠিক যেন শিল্প-মহিমা লাভ করে না। এইজন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত সকলের কণ্ঠে ঠিক ওত্‌রায় না। রবীন্দ্রনাথের গানের কবিতা যাহার স্পর্শে অনির্বচনীয় সুরে পরিণত হয় তাহা কেবলমাত্র স - র - গ - মের বিভিন্ন বিন্যাসমাত্রই নয় তাহা এমন একটা আকুতিময় দরদ যাহা তাঁহার গানকে প্রাণময় করে।

অতীতের সুর-স্রষ্টারা স-র-গ-মের বিভিন্ন বিন্যাস করিয়া অতীতযুগে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের অনুসরণে অনেক গান লিখিয়াছেন। বস্তুত বাংলায় তাঁহার লেখা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এ যুগের একজন কীর্তিমান সুর-স্রষ্টাও। তিনি বহু নিজস্ব সুর সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তাঁহার চিত্রসৃষ্টির মতোই বিস্ময়কর। সে-সব সুরে শাস্ত্রীয় সুরের আভাস আছে, অনেক সময় বিদেশী সুরের আমেজ পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া আরও এমন একটা কিছু আছে যাহা প্রায় অবর্ণনীয় কিন্তু যাহা না থাকিলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অঙ্গহানি হয়, সে জিনিসটি প্রাণের ছোঁয়া।

জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আজকাল সঙ্গীতের প্রভাব পড়িয়াছে। সঙ্গীত আজকাল জনপ্রিয় হইয়াছে, যন্ত্রের মাধ্যমে তাহা সর্বস্থানে প্রচারিত হইতেছে। সঙ্গীতের এই অতি সুলভতার জন্যই সঙ্গীত কিন্তু তাহার পূর্বমর্যাদা হারাইয়াছে। যে সম্ভ্রম লইয়া আগে আমরা গুণীদের নিকট যাইতাম, আজকাল সে সম্ভ্রম আর নাই, কারণ এখন গুণীদের কাছে যাইতে হয় না, রেডিওর বোতামটা ঘুরাইয়া দিলেই সে গুণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই এবং সে গুণী যখন রেডিওতে গান গাহিতে থাকেন তখন আমরা মনোযোগ দিয়া শুনিও না। গল্প করি।

গান-বাজনার অতি স্থূলভতা সত্ত্বেও কিন্তু প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর অমর্যাদা এখনও তেমন প্রকট হয় নাই। কারণ প্রতিভা এমন একটা জিনিস যাহাকে সহজে তুচ্ছ করা শক্ত। সে প্রতিভাকে রক্ষা করিতে হইলে শুধু যে সাধনা করা দরকার তাহাই নহে সেই সাধনাকে অব্যাহত রাখার জন্য দৈহিক ও মানসিক সংযমেরও প্রয়োজন। যে কোনও শিল্পসাধনাই তপস্যা বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন এই তপস্যাই করিয়া গিয়াছেন। তপস্যার প্রধান মন্ত্র আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ। তাঁহার বহু সঙ্গীতে এই ভাবটিই ফুটিয়াছে বলিয়া তাহা মহৎ সৃষ্টি হইয়াছে। যে শিল্পী এই সৃষ্টিকে কণ্ঠে বা বাদ্যযন্ত্রে মূর্ত করিবেন তাঁহাদের মনের ভাবটিও অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। আগেই বলিয়াছি রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের ও শব্দের ভূমিকা ছাড়া মনের ভূমিকাও প্রবলভাবে বর্তমান।

বিটোফেন সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—Music is the mediator between the spiritual and sensuous life. যে সেতু আধ্যাত্মিক জগতের সহিত ইন্দ্রিয় জগতের যোগসাধন করে তাহা কেবল বাক-সর্বস্ব ও ধনি-সর্বস্ব নহে, তাহা মনোময়। এই সত্যটি শিল্পীদের স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। —নমস্কার।

তারাশঙ্কর

তারাশঙ্কর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সাহিত্য-সংসারে আমার সমসাময়িক। সেজন্য তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করিতে আমি অপারগ। আমি তাহার এত কাছে আছি যে তাহাকে বা তাহার সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছি না। মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখাই সম্পূর্ণ দেখা। তারাশঙ্কর সম্বন্ধে সে দৃষ্টি আমার নাই। অনেক সমসাময়িক লেখক এবং গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল-জাতীয় সমালোচক তাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা

হয় অতি-স্তুতি কিংবা অকারণ-নিন্দার অতিরঞ্জনে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। মহাকালের সম্মার্জনী-প্রহারে অবশ্য একদিন সে সব লুপ্ত হইবে। সমসাময়িক কোন লেখক সম্বন্ধে সমসাময়িক লোকের বিচার প্রায়ই নির্ভুল হয় না। একটু দূরে না গেলে পাহাড়ের সম্পূর্ণ মহিমা দেখা যায় না। লেখকদের সম্বন্ধেও সময়ের একটা ব্যবধান প্রয়োজন। যখন সে লেখক দ্বেষ-বিদ্বেষ, ত্রুটিবিচ্যুতি, দৈনিক স্বার্থসংঘাতের পরপারে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, যখন তাহার সৃষ্টির মহিমাই তাহাকে ইতিহাসপটে উজ্জ্বল করিয়া রাখে তখনই তাহার সাহিত্যিক বিচার সম্ভব।

মানুষ তারাশঙ্কর বাহিরে একটু রুক্ষ প্রকৃতির, জনতার ঘর্ষণে সে আরও হয়তো রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার রুক্ষতার অন্তরালে যে স্নেহময় মহৎ মানুষটি আছে, সৌভাগ্যক্রমে আমি তাহার স্পর্শ লাভ করিয়াছি এবং মুগ্ধ হইয়াছি। ইদানীং তারাশঙ্করের সহিত আমার কচিৎ দেখা হয়, তবু সে আমার মনে সর্বদা প্রবলভাবে জাগরূক আছে। সাহিত্য-জগতে আজ সে বিশ্রুতকীর্তি, তাহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান সে পাইয়াছে, ইহাতে আমি আনন্দিত। আমাদের সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগে যে বহুবর্ণবিচিত্র স্বপ্নলোক আমরা সৃষ্টি করিয়াছিলাম তারাশঙ্কর একদা সেই স্বপ্নলোকের অধিবাসী ছিল। একথা আমি ভুলিতে পারি না বলিয়াই যখনই সুযোগ পাই তখনই তাহার সান্নিধ্য-স্পর্শ লাভ করিবার জন্য তাহার কাছে ছুটিয়া যাই। সে স্বপ্নলোক আর নাই, পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবু 'কবি'র স্রষ্টা কবি তারাশঙ্কর এখনও আমাদের মধ্যে আছে ইহাই পরম আশ্বাস বলিয়া মনে করি। একটা টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলে কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে আবার দেখিতে পাইব এই বিশ্বাসটাই এই ভাঙনের মুখে কি কম মূল্যবান?

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। সর্বপ্রথমেই দেশবরেণ্য নেতা সর্বজনপ্রিয় রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক, মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য পার্শ্বচর, ভারতীয় শিষ্টাচারের সৌম্য প্রতীক, বিদ্বান, বিদগ্ধ, মহৎ চরিত্রের আধার, ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজেনবাবুকে হারাইয়া সমস্ত দেশ আজ শোকে বিহ্বল। মনুষ্যত্বের যে মহৎ আদর্শকে তিনি জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন সেই আদর্শ যদি আমাদেরও উদ্বুদ্ধ করে তাহা হইলেই আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন সার্থক হইবে। তাঁহার তম লোকের পুনরাবির্ভাব ঘটিবে ইহা কল্পনা করা শক্ত। তবু আশা করিয়া থাকিব যে তাঁহার মহত্ত্বের যোগ্য উত্তরাধিকারী আবার আমাদের দেশকে উজ্জ্বল করিবে।

প্রায় প্রতিবৎসরই পাটনায় কোন-না-কোন সাহিত্য-সভায় যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছি। কিন্তু নানা কারণে আসা ঘটিয়া ওঠে নাই। সাংসারিক ও শারীরিক বাধা-বিঘ্ন তো ছিলই, কিন্তু যাহা থাকিলে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা সহজ হয় সেই উৎসাহেরও অভাব ছিল। কোনও সাহিত্য-সভায় যোগদান করিতে আর তেমন উৎসাহ পাই না। ক্রমশঃ ইহা বুঝিয়াছি নানারূপ সামাজিক হুজুকের মত এইসব সাহিত্য-সভাও প্রধানতঃ একটা হুজুক মাত্র। আমরা সাহিত্য ভালবাসি না, সাহিত্যকে লইয়া হুজুক করিতে ভালবাসি। এ কথা অবশ্য সত্য যে সাহিত্যকে ভালবাসা সহজ নয়, সাহিত্যকে ভালবাসিবার অধিকার বা ক্ষমতা সকলের নাই। প্রকৃত সাহিত্য-স্রষ্টার মত প্রকৃত সাহিত্য-রসিকও বিরল। বহুকাল আগে লিখিয়াছিলাম ঃ

চন্দন তবুও আছে এবং থাকিবে চিরকাল
চন্দন-রসিকও আছে হয়তো সংখ্যায় তারা কম

গড্ডলিকা সম কভু হয় না তো রসিকের পাল

সুরসিক বিধাতার অপরূপ এই তো নিয়ম।

এই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ রসিকের দল সংখ্যা-গরিষ্ঠ বেরসিকদের চাপে সর্বদা ম্রিয়মান, শুধু এ যুগেই নহে, সর্বযুগেই। কবি ভবভূতি তাঁহার কাব্য লিখিয়া তাঁহার সমসাময়িক যুগের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। বলিয়াছিলেন কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা, সুতরাং কোনও সময়ে কোথাও না কোথাও তাঁহার সমানধর্মী লোকের আবির্ভাব ঘটিবে এবং তখন হয়তো তিনি তাঁহার সৃষ্ট কাব্য উপভোগ করিবেন।

বর্তমান যুগে যে সাহিত্য-রসিকের সংখ্যা কম তাহার প্রমাণ অজস্র। জনপ্রিয় পুস্তক, জনপ্রিয় সিনেমা প্রভৃতির অশিল্পত্বই তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। যে সব 'হিট' বইয়ের সম্বর্ধনা গর্জনে আকাশ-বাতাস নিনাদিত তাহারা যে রসিকের রসবোধকেও hit করিয়া অবসন্ন মূর্ছিত করিয়া দেয় ইহা তো সর্বজনবিদিত সত্য।

সুতরাং সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল অনুষ্ঠান সারা দেশ জুড়িয়া ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে সাহিত্য-নিষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় যে পাওয়া যাইবে না ইহা একরূপ নিশ্চিত।

এই সব কারণে সাহিত্য-সভায় আমি পারতপক্ষে যোগদান করি না।

কেবল সাহিত্য নয়, ধর্ম লইয়াও আমাদের দেশে বাড়াবাড়ির অন্ত নাই। নানা রঙের নানা ধর্ম-সভায় নানা বেশ ধরিয়া নানারূপ ধর্মধ্বজীরা প্রায়শঃই যাহা করিতেছেন তাহা আত্মপ্রচারেরই নামান্তর। প্রকৃত ধর্মের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই, থাকিলে ক্রমবর্ধমান পাপের স্রোতে আমাদের সমাজ এমনভাবে ডুবিয়া যাইত না। জীবনের সর্বক্ষেত্রই আজ যেন অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের বিহারভূমি।

সাহিত্য এবং ধর্ম একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। সাহিত্যে এবং ধর্মেই মানব নিজের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা কেবলমাত্র ভঙ্গী-সর্বস্ব, দেহ-সর্বস্ব, সমাজ-সর্বস্ব বা কোনও বিশেষ মতবাদ-সর্বস্ব যাহা জীবনকে অবলম্বন করিয়াও জীবনাতীত, যাহা মানুষকে কোন

আর্থিক সম্পদ দান করে না, আনন্দই যাহার একমাত্র ধ্যেয় এবং একমাত্র পুরস্কার—সেই আধ্যাত্মিকতাই সাহিত্য এবং ধর্মের লক্ষ্য। প্রথম শ্রেণীর ধার্মিক এবং প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক এই আধ্যাত্মিকতারই সাধনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ আধ্যাত্মিকতায়, সাহিত্য এবং ধর্ম মানবমনের এই চরম বিকাশসাধন করিবার জন্য সতত উন্মুখ।

এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগিবে। অধিকাংশ মানুষই যদি বেরসিক এবং অধার্মিক হয় তাহা হইলে সাহিত্য-সভা এবং ধর্ম-সভার এত ধুম কেন? মনে হয় ইহার দুইটি কারণ। প্রথম কারণ, মানবসমাজের প্রায় আদিযুগ হইতে সাহিত্য ও ধর্ম যে শুধু সম্মানের আসন পাইয়াছে তাহা নয়, যাহারা সাহিত্য এবং ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে তাহারাও সম্মানিত হইয়াছে। খোলাখুলি ভাবে 'আমি বেরসিক', 'আমি অধার্মিক' এ কথা কোন সামাজিক মানব স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। নিজেদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার জন্যই অনেক সময় তাই তাহারা ঘটা করিয়া সভা আহ্বান করে, মন্দির স্থাপন করে, এই কারণেই তাই এত সাহিত্যিক মুখোশ এবং গৈরিকের আড়ম্বর। ইহার আর একটা কারণও হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষই হয় জ্ঞাতসারে না হয় অজ্ঞাতসারে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ পাইবার জন্য সত্যই উন্মুখ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার মত আমরা সকলেই একটা পরশ-পাথর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। পরশ-পাথর কিন্তু দুর্লভ। ভাগ্যবলে তাহা দৈবাৎ মিলিয়া যায়। কিন্তু এ কথা সকলে জানে না, কিংবা মানিতে চায় না। তাই সন্ধানীদের ভিড় শ্বাসরোধকর, তাহাদের মধ্যে ভণ্ড, সবজান্তা বা মোহগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও কম নয়, তাই প্রকৃত রসপিপাসু বা রস-স্রষ্টারা এই সব সভায় আসিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

এইসব কারণে সাহিত্য-সভায় অংশ-গ্রহণ করিতে প্রায়ই ইতস্ততঃ করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার দ্বিধা বা অনিচ্ছা টেকে না। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে আহ্বান আসিলে তাহা আর উপেক্ষা করিতে পারি না। তাহাদের অনেক দোষ আছে জানি, এজন্য বহুবার তাহাদের অনেক ভর্ৎসনাও করিয়াছি, ব্যঙ্গও কম করি নাই, উপদেশ দিয়াছি,

প্রতিজ্ঞা-দুর্গে প্রবেশ করিয়া স্থিরও করিয়াছি আর যাইব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে—তাহাদের ডাক আসিলে সাড়া না দিয়া পারি নাই। অনেকদিন আগে তাহাদের উদ্দেশ্যে যে ছোট কবিতাটি লিখিয়াছিলাম অনুভব করি সেই কবিতার ভাবটাই আমার মনের স্থায়ী ভাব। নানা সময়ে তাহার কিছু অদলবদল হইয়াছে সত্য, কিন্তু মূল ভাবটা ঠিক আছে। কবিতাটি এই :

তোমাদের ভালবাসি, তোমাদেরই ভালবাসি
তোমাদের ছাড়া আর কার কাছে আসব
তোমরা কাঁদলে পরে আমাকে কাঁদতে হবে
তোমরা হাসলে পরে হাসব।
জীবনের হাটে বাটে তোমাদের খেলা হাসি
তোমাদের কলরবে অসীমের বাজে বাঁশি
তোমরা চোখের মণি, তোমরা বুকের ধন
তোমরা অপরাজেয়, তোমরা চিরন্তন
তোমাদেরই ভালবাসি
চিরকাল বাসব
তোমরা কাঁদলে পরে আমাকে কাঁদতে হবে
তোমরা হাসলে পরে হাসব।

যাহারা ভালবাসার ধন, তাহাদের সহিত যখন মুখোমুখি হই তখন কিন্তু যে কথাটা তাহাদের বলিতে ইচ্ছা করে তাহা সব সময়ে বলিতে পারি না। কারণ কথাটা খুবই ছোট অথচ খুবই বড়। 'তোমাদের ভালবাসি' মাত্র এই কথা বলিয়া কি সভার বক্তব্য শেষ করা যায়? যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দ লইয়া খানিকটা আবোল-তাবোল বকি, বাস্তব সাহিত্য বড়, না অবাস্তব সাহিত্য বড় তাহা লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হই, সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব ভাল না মন্দ, সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রকৃত সংজ্ঞা কি এইসব গুরু-গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়া আসল বক্তব্যটা হইতে দূরে সরিয়া যাই।

কিন্তু, 'তোমাদের ভালবাসি'—এইটাই আসল বক্তব্য। তোমাদের

ভালবাসি তাই তোমরা যখন বেকার হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াও তখন বড়ই কষ্ট হয়, যখন তোমরা রকে উপবিষ্ট হইয়া সকলের উপহাসাস্পদ হও তখন প্রাণে বড়ই লাগে, তোমরা যখন মনুষ্যত্ব-মর্যাদা ভুলিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধনী দুরাত্মার নিকট শির অবনত কর তখন আমারও শির লজ্জায় অবনত হইয়া যায়। তোমাদের ক্রমবর্ধমান অবনতির দিকে চাহিয়া বারংবার নিজেকেই প্রশ্ন করি কেন এমন হইল। বহুকাল পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—তাঁহার মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল, বস্তুতঃ ভারতের মনীষীগণের চিত্তাকাশে দুই-একটি প্রশ্নের কশাঘাতই বিদ্যুৎবহ্নিতে বারংবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন ঃ "Why is it that we, three hundred and thirty millions of people have been ruled by the last thousand years by any and every handful of foreigners ?"

এ প্রশ্নের তিনি উত্তরও দিয়াছেন ঃ "Because they had faith in themselves and we had not. I read in the newspapers how one of our poor fellows is murdered or illtreated by an Englishman howls go all over the country. I read and weep and the next moment comes to my mind who is responsible for it all···not the English···it is we who are responsible for all our degradation."

রবীন্দ্রনাথেরও ওই এক কথা ঃ

কার নিন্দা কর তুমি, মাথা কর নত
এ তোমার, এ আমার পাপ—

শ্রীঅরবিন্দ আরও বিশদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন ঃ "Our actual enemy is not any force exterior to ourselves, but our own crying weakness, our cowardice, our selfishness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism." শত্রু বাহিরে নাই, শত্রু আমাদের ভিতরে আছে। এখন আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি,

আমাদের বাহিরের শত্রু ইংরেজ আমাদের হাতে শাসনভার সমর্পণ করিয়া বিদায় লইয়াছে কিন্তু আমাদের অন্ধকার ঘুরিয়াছে কি? ঘোচে নাই, আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। বরং মনে হইতেছে তিমির গাঢ়তর হইয়াছে। বিবেকানন্দ কথিত degradation, রবীন্দ্রনাথ কথিত পাপ আমাদের সমাজের সর্বস্তরকে আজও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারি নাই। স্বদেশীযুগে আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করিতেছিলাম তখন অনেকের মনে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল সে অগ্নিও নির্বাপিত হইয়াছে। এখন আমরা নানারূপ স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত রাজনীতির স্রোতে খড়ের কুটার মত ইতস্ততঃ ভাসিয়া চলিয়াছি। লক্ষ্য শুধু স্বার্থসিদ্ধি, মহত্তর আর কোনও লক্ষ্য নাই। ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য বিদ্যালাভ বা চরিত্র-গঠন নহে, লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করিয়া যেন-তেন-প্রকারেণ চাকুরি লাভ করা। তাহাদের অভিভাবকদের জীবনেও উচ্চতর আদর্শ নাই, একমাত্র আদর্শ টাকা। আমরা বুঝিতেও পারিতেছি না এই নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ আমাদের ক্রমশঃ সর্বস্বান্ত করিতেছে। গজভুক্ত কপিত্থবৎ আমরা বাহিরের ঠাট-ঠমক কোনক্রমে বজায় রাখিয়া ভিতরে ভিতরে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছি। আর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার আমরা এ বিষয়ে এখনও উদাসীন। শুধু ছাত্রসমাজ নহে, সমস্ত দেশই যেন আজ ভাঙনের মুখে ধ্বংসোন্মুখ। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয়, আমরা বাঁচিয়া আছি কি? মনে হয়—

আমরা মরিয়া গেছি সে কথা বুঝিনি মোরা আজও
আমরা বাঁচিয়া নাই, বাঁচিবার করি শুধু ভান
দেখিতেছ শোভা-যাত্রা? ও যে শব-যাত্রা ভাই
চলেছে মড়ার দল হস্তে বহি প্রেতের নিশান।
মুখেতে মেরেছে লাথি, পাষাণে দলেছে রোজ বুক
ছাড়ায়ে গায়ের চামড়া, বানায়েছে যারা চটিজুতা
তাহাদেরি জয়গান গাহি দিয়া সুর-তাল-মান
তাহাদেরি সেবা করি পাইলেই সুযোগ বা ছুতা।

মোদের জীবন্ত বল ? এ বড় আজব দেশ ভাই,
মরিলেই দাহ করা নয় জেনো এ দেশের কেতা
জীবন্তকে এরা শুধু মাঝে মাঝে পোড়াইয়া মারে
সচল মড়াই করে জীবনের অভিনয় হেথা।
এখানে মৃতের দল নাচে গায় নানান আসরে
মড়ারাই প্রিয়-প্রিয়া এদেশের মিলন বাসরে।

প্রেত-লোকের এই বীভৎস কল্পনায় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু বরাবর অবসন্ন হইয়া থাকা মনের ধর্ম নয়। শেষ পর্যন্ত অন্তরনিবাসী আশাবাদীর কণ্ঠস্বর আবার শুনিতে পাই।

অন্তর্যামী বলেন ঃ "তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু সমগ্র সত্য নহে। সবই ভস্ম নহে, ভস্মের নীচে অগ্নিও আছে। হয়তো তাহা কণামাত্র, তবু তাহা অগ্নি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু মেঘ দেখিয়া হতাশ হইও না, বিস্মৃত হইও না যে মেঘের অন্তরালে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের চিরন্তন দীপ্তিও আছে। এই বিশ্বাসকেই অবলম্বন কর। স্মরণ কর রবীন্দ্রনাথের কথা। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তিনি আশা করিয়া গিয়াছেন সংকটের দুর্যোগ চিরস্থায়ী হইবে না। পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া অপরাজিত মনুষ্যত্বের মহিমা আবার আত্মপ্রকাশ করিবে। আশা করিয়া থাক ওই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির, মেঘান্তরালবর্তী ওই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মহাবির্ভাব ঘটিবে। এই মহা হট্টগোলের মধ্যেও অনুপম সঙ্গীত আত্মগোপন করিয়া আছে, বিশ্বাস রাখ সেই সঙ্গীতই একদিন আবার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিবে।"

এই বিশ্বাসের আশ্রয়ভূমি সন্ধান করিতে গিয়া যে ছাত্রছাত্রীগণ, তোমাদেরই কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। মনে পড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা :—

মানুষ হয়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে
যুগের আগে এগিয়ে চলে হাস্যমুখে গর্বভরে
প্রয়োজনের ওজন মতো আয়োজন সে করতে পারে

ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের চোখের মণি···ওই আমাদের বুকের বল
ওই আমাদের অমর প্রদীপ ওই আমাদের আশার স্থল।

তোমাদের উপরই সকলের আশা। তোমাদের মধ্যেই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত। তোমরা সাহিত্যিক না হও ক্ষতি নাই, কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা না হইলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। কিন্তু তোমাদের মানুষ হইতে হইবে, স্বদেশপ্রেমিক হইতে হইবে। শুভ্র-চরিত্র স্বদেশপ্রেমিকই অন্তর দিয়া দেশের দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করিতে পারেন। ভারতবর্ষের নবজাগরণের যুগে এইরূপ তীক্ষ্ণ-অনুভূতি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই দেশ জাগিয়াছিল। তাই আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশ আবার মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। আবার তাহাকে মোহমুক্ত করিতে হইবে। সে দায়িত্ব তোমাদের। সে দায়িত্ব পালন করিতে হইলে শুভ্র সৎচরিত্র চাই, তীক্ষ্ণ অনুভূতি চাই। দেশের দুঃখকষ্ট প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হইবে, তবেই তাহার প্রতিকার আসিবে। স্বামী বিবেকানন্দও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "Feel, therefore, my would be reformers, my would-be patriots. Do you feel? Do you feel that millions are starving to-day and millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it made you almost mad? Are you seized with that one idea of the misery of ruin, and have you forgotten all about your name, your fame, your wives, your children even your bodies? That is the first step to become a patriot···"

আমাদের দেশে এরূপ patriot এখন নাই। আশা করিব তোমাদের মধ্য হইতে সত্য-সন্ধী দেশগতপ্রাণ পরার্থপর দেশ-প্রেমিকের আবির্ভাব আবার ঘটিবে।

বহুকাল আগে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় দেশের যুবক দে উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইটি পাঠ করিয়া আজ আমার বক্তব্য সমাপন করিব:

তোমারই অন্তরবহ্নি এ দুর্দিনে রবে নির্বাপিত
চিরন্তন অগ্নিহোত্রী? হে তরুণ, তুমি যে সাগ্নিক।
শঙ্কাহীন বীর্যবান বীর তুমি অপ্রমত্ত-চিত্ত
সমস্ত জীবন জ্বালি পথ-ভ্রান্তে দেখায়েছ দিক
যুগে যুগে চিরকাল: কীর্তিকথা তব সমুজ্জ্বল
ইতিহাসে আছে লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে, আছে লেখা
স্মৃতি-পটে, আশার কল্পনা-নভে করে ঝলমল
লক্ষ-বর্ণ মহিমায়। কোথা তুমি আজ? দাও দেখা,
উদ্ভাসিত কর অন্ধকার, হে অগ্রণী চিরন্তন,
আদর্শ-প্রদীপ্ত তব মনীষায়। আজ তুমি জানি,
তবে কেন কষ্ট ক্ষোভ অসম্মান সহস্র বন্ধন
পুঞ্জীভূত হতাশায় প্রতি পদে পরাজয় গ্লানি?
হে যৌবন-ভগবান, হে ভাস্বর, স্বীয় মূর্তি ধর
অন্ধকার যজ্ঞভূমে প্রাণ-অগ্নি প্রজ্বলিত কর।*

* পাটনা কলেজের বঙ্গ-সাহিত্য-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত

পোষাক-প্রসঙ্গ

গত চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যার আধিব্যাধিতে শ্রীযুক্ত লীলা মজুমদারের লেখা 'আধিব্যাধি' রস-রচনাটি পড়ে ভারি ভালো লাগল। তিনি ঠিকই ধরেছেন। মনের রোগ আর দেহের রোগ যে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট একথা বড় বড় বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন। এ-ও মনে হ'চ্ছে যে ভবিষ্যতে মনই সব রোগের উৎস বলে স্বীকৃত হবে। দেহের রোগ ব'লে আলাদা আর কিছু থাকবে না। এমন কি চুলকানি বা আবের কারণ নির্ণয় করবার জন্যেও আমাদের হয়তো মনস্তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হ'তে হবে শেষ পর্যন্ত।

তাঁর আর একটা 'আবিষ্কার'ও চমকপ্রদ মনে হল। মনের রোগের সঙ্গে যে পোষাক-আসাকেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এটা তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি অর্থনৈতিক মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'রে এ যুগে ড্রেন-পাইপ প্যাণ্টালুন পরা (কালো, প্রায় কালো, ঘোর কালো রঙের) পুরুষদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। আত্মপ্রশংসা করা হবে ব'লে বোধহয় তিনি বিনয়বশতঃ মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলেননি। আমরা কিন্তু বলছি মেয়েরাও এবিষয়ে পেছিয়ে নেই। তাঁদের কোমর ও পেটকাটা জামা যে এই দুর্দিনে অর্থনৈতিক দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে তাতে আর সন্দেহ কি? এর চরম পরিণতি হ'য়েছে ওদেশের 'টপ্‌লেস' পোষাকে। আশা করছি এদেশেও অচিরে তা প্রচলিত হবে এবং আমাদের মানসিক রোগ ও অর্থনৈতিক ক্লেশ দূর ক'রতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে হ'চ্ছে। পশুপক্ষীদের মানসিক রোগ নেই। তারা কোন জটিল কমপ্লেক্সে ভোগে না। এর কারণ সম্ভবতঃ তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। পোষাক-আসাকের বালাই তা'দের নেই। উলঙ্গ থাকাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, আর, 'back to nature' হওয়াকেই আধুনিক বিজ্ঞান স্বাস্থ্যের অনুকূল ব'লে দাবী করছেন।

ওদেশে nudist সম্প্রদায় স্থাপিত হ'য়েছে। সমুদ্রতীরে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে সূর্যালোকসেবী উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ নরনারীর দল আজকাল আর চক্ষুর বা শালীনতার পীড়াদায়ক নয়। এদেশেও মহাভারত এবং পুরাণখ্যাত দীর্ঘতমা ঋষি 'গোধর্ম' পালন করতেন। অর্থাৎ তিনি nudist ছিলেন।

মনে হয় এদেশের আধুনিক যুবক-যুবতীরাও এবার এদিকে সচেতন হ'য়েছেন। হাফপ্যাণ্ট পরা হাতকাটা জামা গায়ে স্যাণ্ডাল পায়ে যুবকদের দেখলে মনে হয় তাঁরা ক্রমশঃ স্বাভাবিক নগ্নতার দিকেই ঝুঁকছেন। এ বিষয়ে মেয়েরাও পশ্চাৎপদ নন। এগারো হাত বা বারো হাত শাড়ি পরেও দেহ শোভাকে উগ্রভাবে লোকচক্ষুর সমক্ষে প্রকট করবার কৌশলও তাঁদের মধ্যে অনেকে আয়ত্ত করতে পেরেছেন দেখছি। এসব আশার কথা।

অর্থাৎ যে 'গোধর্ম' ভবিষ্যতের ধর্ম হবে, যে নগ্ন পশু-সভ্যতা পরে বিজ্ঞান অনুমোদিত স্বাস্থ্যসম্মত সভ্যতা বলে গণ্য হবে, তারই মহড়া অর্থাৎ রিহার্সাল চলছে। ড্রপসিন যখন উঠবে তখন আমরা মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত হ'য়ে সেই নবনাটকের অভিনয়ে যা প্রত্যক্ষ করব তার নাম 'প্রগতি', স্রেফ্ প্রগতি।

বিজ্ঞানীরা বরাবরই আমার শ্রদ্ধাভাজন। আজ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র, আমিও চল্লিশ বছর ডাক্তারি করেছি। সাহিত্য সেবা করেছি অবসর সময়ে, অনেক সময় রাত জেগে। সেই সাহিত্যই এখন আমার জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। আমি যদি সুযোগ পেতাম, *আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকতো, আমাকে পথ দেখাবার মত যদি কোনও গুরু পেতাম, তাহলে হয়তো সাহিত্য-সেবা না করে বিজ্ঞানের গবেষণা* নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি সে সুযোগ পাই নি। এখন তার জন্যে আমার ক্ষোভও নেই। এখন আমি বুঝেছি গবেষণার অর্থ যদি সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা হয়, তাহলে তার জন্যে লেবরেটরি অপরিহার্য নয়। অন্য নানা পথে চলেও সত্যের দেখা পাওয়া সম্ভব। বিটোফেন, রাফায়েল, শেক্সপীয়র, কলম্বাস, আইনস্টাইন সভ্য মানব-সমাজে আজ সম্মানের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত, কারণ এঁরা সকলেই সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। এঁদের সঙ্গে যদি আধ্যাত্মিক জগতের দিকপালদের নাম করি, তাহলেও সেটা বেমানান হবে না। মহর্ষি রমন, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ—এঁরাও সত্যদ্রষ্টা। এই সব সত্যদ্রষ্টা কিন্তু সত্যকে অপরোক্ষ করেছেন এক পথে গিয়ে নয়। প্রত্যেকেরই ভিন্ন পথ, ভিন্ন মাধ্যম, ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন গুরু। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের পথ বিভিন্ন, কিন্তু এক জায়গায় এঁরা অভিন্ন। এঁরা প্রত্যেকেই চির-উৎসুক, চির-পিপাসী, চির-উৎকণ্ঠ, চির-উদগ্রীব। সত্যকে দর্শন করবার জন্যে একটা অতন্দ্র উন্মুখতা এঁদের সকলকে যেন সদা আকুল করে রেখেছে। আর এইখানেই গবেষণার মূল যন্ত্র নিহিত আছে। আকুলতা বা আগ্রহে কোন রকম ফাঁকি থাকলে সত্যের নাগাল পাওয়া যাবে না, তা বারবার

আমাদের এড়িয়ে যাবে। ছোটখাটো কৌতূহল থেকেই গবেষণার শুরু হয়। যেমন ধরুন, কোনও বিজ্ঞানের ছাত্র যদি পরীক্ষা করে দেখতে চান যে, মানবশিশুর মত উদ্ভিদশিশু বা মৎস্যশিশুকেও দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি না, তাহলে এ থেকেই একটা গবেষণার পথ খুলে যেতে পারে এবং সে পথ দিয়ে কোন নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী যদি অগ্রসর হতে চান, তাহলে হয়তো তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু না-ও পেতে পারেন কিংবা হয়তো এমন অভাবিতপূর্ব কিছু পেতে পারেন, যা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল এবং যা হয়তো *বিজ্ঞান-জগতে বিস্ময়কর কোনও নূতন গবেষণার সূচনা করবে। এধরনের গবেষণা অনেকটা বুনো হাঁসের পিছনে ছোটাছুটি* করবার মত। হাঁসকে প্রায়ই পাওয়া যায় না, যদিও বা পাওয়া যায় তখন দেখা যায় যে, আমার দৃষ্টি-বিভ্রম হয়েছিল, কাককে হাঁস ভেবেছিলাম। সত্যি হাঁসও পাওয়া যে না যায়, তা নয়—মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যাক আর না যাক, এই ছোটাছুটিতেই একটা আনন্দ আছে, সেই আনন্দই গবেষকদের পুরস্কার আর ওই ছোটাছুটির পথে হাঁস ছাড়া আরও অনেক লক্ষণীয় বস্তু তাঁর চোখে পড়ে এবং ছোটাছুটি করতে করতে অবশেষে বিজ্ঞানীর মনে শিক্ষার সেই পরম গুণ বিনয় বোধ দেখা দেয়, যখন তিনি নিউটনের মত বলতে পারেন—জ্ঞানসিন্ধুর উপকূলে আমি কয়েকটি উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করেছি।

এরকম খামখেয়ালীভাবে আমাদের দেশে গবেষণা কিন্তু হয় না। হওয়া সম্ভবও নয় বোধ হয়। খামখেয়ালী গবেষণায় যে আনন্দ, রুটিনবদ্ধ বরাদ্দ মাপের গবেষণায় সে আনন্দ নেই। সেটাও যেন একটা task হয়ে পড়ে। তাছাড়া আর একটা জিনিস হয়েছে এ যুগে, যে যুগটাকে টাকা-নিয়ন্ত্রিত যুগ বললে খুব ভুল হবে না। এই টাকা-নিয়ন্ত্রিত যুগে একটা পাটোয়ারি বুদ্ধি সকল শিক্ষিত লোককে সম্মোহিত করছে। সকলেরই এক চিন্তা, কি করে দু-পয়সা হবে। এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে অনেক সাহিত্যিক সেই ধরনের বই লিখছেন, যে ধরনের বই বাজারে বেশী কাটবে। শিল্পীও সেই ধরনের ছবি আঁকছেন, যার বাজার দর আছে। এমন কি, আধ্যাত্মিক পন্থারা সেই ধরনের গুরু খুঁজছেন, যিনি তাঁর

আধিভৌতিক সুখ-সুবিধা করে দিতে পারেন। গুরুরাও অধিক পরিমাণে শিষ্য আকর্ষণ করবার জন্যে এমন সব 'মিরাকল' দেখাচ্ছেন, যা দেখলে বা শুনলে সত্যই অবাক হতে হয়। স্কুল-কলেজে ছেলেরা বিদ্যার বদলে ডিগ্রী চায়। কারণ বাজারে বিদ্যার কদর নেই, ডিগ্রীর কদর আছে। এখন ডিগ্রীর কদরও নেই, তাই ছেলেমেয়েরা আন্দোলন করছে বিদ্যা, ডিগ্রী কিছু চাই না—চাকরি চাই। সর্বত্রই টাকা আর টাকা। বস্তুতঃ টাকা না হলে চলেও না। সুতরাং গবেষণার ক্ষেত্রেও এই টাকা তার প্রভাব বিস্তার করেছে, সব গবেষণাই আজকাল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা মতলব-চালিত। এই বিষয়ে থীসিস লিখে একটা ডক্টরেট পেলে চাকরির সুবিধা হবে বা অন্য কোন আধিভৌতিক উন্নতি হবে—এই মানদণ্ডই সকলকে গবেষণায় যদি প্রবৃত্ত করে তাহলে গবেষণা হয়তো কিছু হয়। কিন্তু গবেষণার আনন্দ লাভ হয় না, সত্য অনেক সময় নাগাল থেকে ফসকে যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে না হতে পারে, তা আমি বলছি না। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন ভাগ্যবান গবেষক গবেষণার পর একটা চাকরি পেলেই গবেষণার ইতি হয়ে যায়। আমাদের দেশে হালে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে উল্লেখযোগ্য কি কি গবেষণা হয়েছে, তা আমার জানা নেই। যতদূর শুনেছি তেমন কিছু হয় নি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন আমরা বিদেশীয়দের দ্বারা প্রভাবিত, গবেষণার ক্ষেত্রেও তাই, আমাদের চিন্তা বা কল্পনার অনন্যতার তেমন কোন প্রমাণ আমাদের গবেষণায় নেই—যেমন ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণায়। পাটোয়ারি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে আমরা সেই মহৎ লোকে উত্তীর্ণ হতে পারছি না, যেখানে উত্তীর্ণ হয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র 'অব্যক্ত' লিখেছিলেন। যে মহৎ লোকে উত্তীর্ণ হয়ে আচার্য আইনস্টাইন মোৎসার্ট বা বীটোফেনের সঙ্গীতে তন্ময় হয়ে যেতে পারতেন, যিনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন, যিনি বেলজিয়ামের রাণীর নিমন্ত্রণে গিয়ে হেঁটে তাঁর প্রাসাদে পৌঁছেছিলেন। রাণী যখন জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার জন্যে যে 'কার' পাঠিয়েছিলাম সেটা আপনি ব্যবহার করলেন না কেন'? আইনস্টাইন হেসে উত্তর দিলেন—It was a very pleasant walk,

Your Majesty। *চিত্তের যে স্বাধীনতা থাকলে সত্য কথা সহজভাবে* বলা যায়, অর্থের কারাগারে বন্দী হয়ে আমরা সে স্বাধীনতা হারিয়েছি। আলেকজান্দ্রিয়ার রাজা টলেমি ইউক্লিডের কাছে জ্যামিতি শিখতেন। একদিন তিনি অধীরভাবে প্রশ্ন করেছিলেন—Isn't there a shorter way of learning geometry than through your method? ইউক্লিড উত্তর দিয়েছিলেন—সায়ার, আপনার রাজত্বে দু-রকম রাস্তা আছে। একটা সাধারণ লোকদের চলবার জন্যে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। আর একটা রাজপরিবারদের চলবার জন্যে ভাল রাস্তা। কিন্তু জ্যামিতিতে একটি মাত্র রাস্তাই আছে। সকলকেই সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়ঃ There is no royal road to learning.

এযুগের আমরা রূঢ় সত্য উত্তর কি অকপটে দিতে পারি কোনও ক্ষমতাশালী হোমরা-চোমরা ব্যক্তির মুখের উপর? পারি না। বরং চেষ্টা করি তাঁর মন রেখে চলতে। আমরা স্বাধীন নই, আমরা পরিবেশের কারাগারে বন্দী, ষড় রিপুর কারাগারে বললেই আরও ঠিক বলা হয় সেটা। তাই আমরা মহৎ কিছু করতে পারছি না। গবেষণা মানে সত্যের সন্ধান, সে সন্ধান কি ভীতু, মিথ্যাচারী লোকের দ্বারা সম্ভব?

তবু আমার আশা আছে এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের গবেষণা-প্রবণতা নিঃশেষ হয়ে যাবে না। বাঙালীর ছেলেদের স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতা আছে। স্বপ্নই গবেষণার প্রেরণা। আপনারা যদি এই সব খামখেয়ালী স্বপ্নবিলাসী ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্যে একটা ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান খোলেন—যেখানে যে কোনও বৈজ্ঞানিকের যে কোনও আজগুবি স্বপ্নকে বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচিয়ে দেখবার সুযোগ থাকবে—তাহলে আমার মনে হয়, গবেষণার নূতন একটা দিগন্ত দেখা দেবে আমাদের দেশে। একই মাটি থেকে একই রস আহরণ করে পাশাপাশি দুটো গোলাপ গাছ দু-রঙের ফুল ফোটাচ্ছে কি উপায়ে? আমাদের রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে eosinophil বলে যে কণিকা আছে, সেটি eosin-এর রং নেয় কেন? eosin-এর জ্ঞাতি flurosin-এর রঙ কেন নেয় না? Eosin একটা bromine compound। তাহলে কি

ইওসিনোফিলের সঙ্গে আমাদের শরীরের bromine metabolism-এর কোন সম্পর্ক আছে ? Iodine metabolism নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আছে thyroid ঃ ইওসিনোফিল কি তাহলে thyroid-এর মত bromine নিয়ন্ত্রণকারী ছোট ছোট ভাসমান gland ? এই ধরনের নানারকম এলোমেলো উদ্ভট আজগুবি অসংলগ্ন প্রশ্ন নিয়ে আসবে সেখানে বিজ্ঞানের নানা বিভাগের ছাত্রেরা। সে প্রশ্নের সদুত্তর দেবার জন্যে অভিজ্ঞ অধ্যাপক কি পাওয়া যাবে ? শুধু অধ্যাপক নয়, তাদের কল্পনা যে ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র নয়, এটা প্রমাণ করবার ব্যবস্থাও থাকা চাই সে প্রতিষ্ঠানে।

আমার এই প্রস্তাবটা হয়তো হাস্যকর মনে হবে, তবু আমার মনে হয় সুস্থ স্বাধীন অনন্য নির্ভীক বিজ্ঞানীরাই অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট গবেষণা-দিগন্তের দিকে অগ্রসর হবার যোগ্য। তাঁদের উৎসাহ দিলেই আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর গবেষকদের দেখা পাওয়া যাবে।

কিন্তু হায়। আমাদের দেশে এই অসম্ভব কি সম্ভব হবে ?

মূল সভাপতির ভাষণ

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ,

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র-মহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। সর্বপ্রথমেই আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি সেই মহামনস্বী মহাপুরুষকে, বঙ্গ সাহিত্যের সেই দিকপালকে বাণীমন্দিরের একনিষ্ঠসাধক সেই রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে যাঁহার জন্মভূমিতে আজ এই সম্মিলন-সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাঁহার প্রেরণায়, আগ্রহে এবং চেষ্টায় একদা এই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, যাঁহার প্রতিভা-কিরণে বঙ্গ সাহিত্যের প্রবন্ধ বিভাগ আজ সমুজ্জ্বল। জানি না. তিনি স্বর্গলোক-

হইতে আমাদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন কি না, কিন্তু একথা বার বার বলিব আমরা তাঁহার আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করি। শুনিয়াছি যে 'হল'এ আজ এই সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই হলের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়। প্রাতঃস্মরণীয় শব্দটি অভ্যাসবশত লিখিয়াই কিন্তু মনে হইল, সত্যই কি বিদ্যাসাগর আজ প্রাতঃস্মরণীয়? সেই ঋজু-মেরুদণ্ড তেজস্বী ব্রাহ্মণকে, যিনি ব্যথা-হতাশা-কুসংস্কার-অশিক্ষা- লাঞ্ছিত বাঙালী সমাজের উন্নতির জন্য নিজের ধন-মান-স্বাস্থ্য-সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাঁহাকে কি আমরা একবারও মনে করি? যাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্রবল বাঙালী সমাজের উন্নতিকল্পেই একদা নিয়োজিত হইয়াছিল তাঁহার জীবনী কি আমরা আজকাল পাঠ করি? যে উত্তরটা মনে জাগিতেছে তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি। বাঙালী পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিতে ভুলিয়াছে, তাহার প্রতিভা নিত্যনূতন মহাপুরুষ আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত। নূতন মহাপুরুষের ভিড়ে পুরাতনেরা হারাইয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা একটু উদ্ধৃত করিতেছি:

"রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধারলাভ করিতে হইয়াছিল···বস্তুতই বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বিবেচিত হইতে পারে।···পলাশীর লড়াইয়ের কিছুদিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উর্ধ্বে অবস্থিত যে তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌সংযত কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙালী উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।"

হিমালয়কে অবজ্ঞা করিলে হিমালয় ছোট হইয়া যায় না,

বিদ্যাসাগরের মহতী কীর্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হিমালয়ের মতোই অভ্রভেদী। তাঁহাকে আমি শত সহস্র প্রণাম নিবেদন করিলাম। আজকাল দেশে এমন কোনও নেতা নাই যাঁহাকে প্রণাম করিলে মনে হয় ধন্য হইলাম। প্রণম্যের সন্ধান করিতে হইলে ইতিহাসের পাতা উলটাইতে হয়। বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগরকেও ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম আজ। মনে মনে প্রার্থনা করিলাম —আবার তুমি আবির্ভূত হও, তোমার মতো কর্মবীরেরই এখন প্রয়োজন। যে জেলায় আজ আমাদের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই মুর্শিদাবাদ জেলায় পলাশীর যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে একদা নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে পরাজিত করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক-প্রধান মিস্টার ক্লাইভ ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম পত্তন করিয়া ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইতিহাস বলে ক্লাইভ শৌর্য বলে বিজয়ী হন নাই, হইয়াছিলেন কৌশল অবলম্বন করিয়া এবং সে কৌশল সফল হইয়াছিল কারণ বাঙালী জাতি অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলার শাসন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না. তাঁহারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। নবাবের দম্ভ তাঁহাদের আত্মসম্মানকে, তাঁহাদের আদর্শবোধকে লাঞ্ছিত বিক্ষত করিতেছিল। তাই সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া ইংরেজকেই সে রাজসম্মানে অভিষেক করিয়াছিল। এইটিই বাঙালী চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সে আদর্শবাদী এবং তাহার আদর্শ এমন নিখুঁত, এমন তুঙ্গী যে তাহার নাগাল সে আজও পায় নাই। কিন্তু তাহার নাগাল পাইবার জন্য সে সর্বদা সচেষ্ট, এজন্য সে যুগে যুগে নানা মত অবলম্বন করিয়াছে—নানা পথে দুর্গম যাত্রা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। অনার্য বাঙালী আর্য হইয়াছে, আর্য বাঙালী বৌদ্ধ হইয়াছে, তারপর বৌদ্ধধর্মকে উৎখাত করিয়া মাৎস্যন্যায়ের কবলে পড়িয়া নিদারুণ অত্যাচার ভোগ করিবার পর এই বাঙালীই অষ্টম শতকে গোপাল দেবকে নেতা করিয়া সাধারণতন্ত্র বা রিপাবলিক্ স্থাপন করিয়াছে। পাল বংশ সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করিবার পর যখন আদর্শভ্রষ্ট হইল, তখনও বাঙালী তাহা সহ্য করে নাই, সুদূর

কর্ণাট প্রদেশ হইতে সেন বংশের লোক আনিয়া বাংলার সিংহাসনে বসাইয়াছিল। সেন রাজারাও বেশীদিন বাঙালীর আদর্শ চেতনার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারেন নাই, তখন বাঙালী জনসাধারণই মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। মুসলমানদের সাম্যবাদই সম্ভবত বাঙালীর মনে আশা জাগাইয়াছিল, তাহারা হয়তো ভাবিয়াছিল সমাজের নানাবিধ অসাম্য-জনিত ব্যবস্থা মুসলমানরাই দূর করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল মুসলমানরা এদেশে সাম্যের মহিমা প্রচার করিতে আসেন নাই, আসিয়াছেন রাজত্ব করিতে। তাঁহারা প্রভু, তাঁহারা নবাব, তাঁহারা শাহানসাহ, তাঁহারা দরিদ্রের কেহ নন, তাঁহাদের বিলাসের তাণ্ডব-লীলায় দরিদ্রের ক্রন্দন, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বারবার ভাসিয়া গেল ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। বাংলাদেশে ইহার নানাবিধ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং উত্তরবঙ্গ নিবাসী রাজা গণেশের মতো অবিস্মরণীয় হিন্দুরাজার অভ্যুদয় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ছোট খাটো আরও নানা ঘটনা ঘটিয়াছিল সে সবের বিস্তৃত পরিচয় দিবার অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাঙালী ইহার শেষ জবাব দিয়াছিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে। তাহার পরই ইংরেজের আবির্ভাব। ইংরেজদের লইয়াও বাঙালী কম মাতে নাই। তাহাদের ন্যায়বিচার, তাহাদের ধর্ম, তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের সাহিত্য বেশ কিছুদিন বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যে-ই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে তাহারা শাসকের ছদ্মবেশে শোষক, আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার ছুতায় তাহারা আমাদের শাশ্বত ঐতিহ্যকে চূর্ণ করিতেছে অমনি আমাদের টনক নড়িল। ইহার প্রমাণ সেকালের সংবাদপত্র-সমূহে মুদ্রিত আছে। যে রামমোহন রায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্তনে উৎসাহী হইয়াছিলেন সেই রামমোহন রায়ের সহিতই ইংরেজ সরকারের নানা বিষয়ে মতের অমিল হইতে লাগিল এবং তিনি আমাদের দেশে যে রেনেসাঁসের প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার মূলকথা—অতীতের দিকে ফিরিয়া চাও, আমাদের ঐতিহ্যের মহিমা বিস্মৃত হইও না। আমাদের বেদান্ত

উপনিষদ ত্যাগ করিয়া বাইবেলের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কোনও সঙ্গত হেতু নাই। তিনি হিব্রু শিখিয়া পাদরিদের তর্কযুদ্ধে পর্যুদস্ত করিলেন আর স্থাপন করিলেন ব্রাহ্মধর্ম। সে যুগের বাংলাদেশ যদিও ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানাইয়াছিল কিন্তু তাহার কাছে আত্মবিক্রয় করিয়া একেবারে নিজেদের আদর্শ বিসর্জন করিয়াছিল একথা ইতিহাস বলে না। এ বিষয়ে কিছু দিন পূর্বে আমি একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই উদ্ধৃত করি—"ইংরেজী সভ্যতার তীব্র স্রোতে ভাসিয়াও বাঙালী কিন্তু আত্মসম্মান হারাইয়া আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই। সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান হইয়াও বাঙালীত্ব বজায় রাখিলেন। রসিক কৃষ্ণ, রাম গোপাল, রাধানাথ, রামতনু সমাজ বিদ্রোহী হইয়াও মনে প্রাণে স্বদেশী রহিলেন, মাইকেল মধুসূদন হোমার মিলটন ভজনা করিয়াও অবশেষে 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' লিখিলেন রামমোহন রায় সাহেবদের অধীনে দেওয়ানি করিয়াও খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া খ্রীষ্টধর্মমুখী বাঙালী চিত্তকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস পাইলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কটকি চটি, থান ও চাদর পরিয়া লাটসাহেবের প্রাসাদ পর্যন্ত বিচরণ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের অধীনে চাকুরি করিতে করিতে লিখিলেন 'আনন্দ-মঠ', দীনবন্ধু লিখিলেন 'নীলদর্পণ', নবীনচন্দ্র লিখিলেন 'পলাশীর যুদ্ধ', হেমচন্দ্র গাহিলেন 'ভারত সঙ্গীত', ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নাস্তিক প্রকৃতি নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিবেকানন্দ হইলেন, ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডিকে সমস্ত বিশ্বে প্রসারিত করিয়া বাঙালী কেশবচন্দ্র সর্বধর্ম সমন্বয়ের বিরাট পরিকল্পনা করিলেন, বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া বাঙলার পল্লীপ্রান্তে আসিয়া বিশ্বভারতীর আসন পাতিলেন, বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর প্রেম বৈরাগ্য ভরে ঐশ্বর্যের শিখর হইতে দেশের ধূলিতে নামিয়া আসিতে পারিলেন, ইংরেজদের প্রভুত্ব-প্রতীক লোভনীয় আই. সি. এস চাকরির মোহ ত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্র স্বদেশের জন্য কারাবরণ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

আদর্শবাদী বাঙালী কোনও সভ্যতার সংঘাতেই আদর্শচ্যুত হয় নাই। আদর্শের জন্য সে সব সহ্য করিতে পারে। পারে না কেবল অসাম্য ও সঙ্কীর্ণতা।"

তাহার আদর্শের কষ্টিপাথরে যখন ইংরেজ শাসনের স্বরূপ ধরা পড়িল তখন সে নিশ্চেষ্ট রহিল না। বাঙালী সুরেন্দ্রনাথ স্থাপন করিলেন কংগ্রেস এবং সে প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ করিলেন ভারতের সর্বপ্রদেশের মনীষীগণকে। ইহার কিছুদিন পরেই লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগ করিয়া দিলেন। কারণ ইংরেজ বুঝিয়াছিল যে সারা ভারতে বাঙালীই ইংরেজের একমাত্র শত্রু। তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়া দিতে পারিলেই সে নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ বজ্র বিস্ফোরণে বিদ্রোহী বাঙালীর প্রতিবাদ ভারতের আকাশকে সচকিত করিয়া তুলিল। সে যুগের অনুশীলন সমিতি, সে যুগের বোমা পিস্তলের গর্জন, সে যুগের অরন্ধন, রাখীবন্ধন, সে যুগের নেতাদের কণ্ঠে জ্বালাময়ী বক্তৃতাবলী, সে যুগের উদাত্ত কবি-কণ্ঠে স্বদেশী গান, সে যুগের সংবাদপত্র 'বন্দেমাতরম্' ও 'সন্ধ্যা', সে যুগের বিদেশী পণ্য বর্জনের উদ্দীপনা, সে যুগের আদর্শ-উদ্দীপ্ত বাঙালী যুবক যুবতীদের ফাঁসিকাঠে আত্মবিসর্জন, আন্দামানে নির্বাসন, কারাগারে কারাগারে নিষ্ঠুর নির্যাতন-বরণ সারা দেশে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করিল যে ইংরেজ সরকার ভাঙ্গা বাংলাকে আবার জুড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। শুধু তাহাই নয়, সে যুগের ইতিহাস এমন একটা পটভূমিকা সৃষ্টি করিল, এমন একটা মঞ্চ প্রস্তুত করিল যাহার উপর দাঁড়াইয়া মহাত্মা গান্ধী পরবর্তী যুগে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর কংগ্রেসের ইতিহাসে যে সব উত্থান-পতন ঘটিয়াছে। যে সব কীর্তি-অকীর্তি পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না। একটি ঘটনা কিন্তু উল্লেখ করিতেই হইবে—সেটি নেতাজী সুভাষকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়ন। কংগ্রেসের এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির নাগালের বাহিরে গিয়া নেতাজী যে মহতী কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহার ইতিহাস আজও সুবিদিত।

বাঙালী সুভাষচন্দ্রই সর্বপ্রথমে স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন তাঁহার I. N. A. বাহিনীর কার্যকলাপ ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বাহিনীকেও বিচলিত করিয়াছিল। ইংরেজের দ্রুত ভারত ত্যাগের ইহাও না কি একটা প্রধান কারণ। নেতাজী যখন কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন তখনই বাঙালী অনুভব করিয়াছিল যে কংগ্রেস স্বদেশপ্রেমিক আদর্শবাদী স্বার্থ-লেশহীন প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা একটি বিশেষ ছাপ দেওয়া রাজনৈতিক দল মাত্র, নিজেদের দলকে শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখাই সে দলের মূল লক্ষ্য, দেশ উপলক্ষ্য মাত্র। ইংরেজ যখন আমাদের স্বাধীনতা দান করিল তখন কংগ্রেস নেতারাই সে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখা গেল যে বঙ্গ বিভাগ লইয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু সেই বঙ্গদেশকেই তাঁহারা দুই টুকরা করিয়া গদিতে বসিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। দেশ বিভক্ত হইবে না, সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই কংগ্রেসের লক্ষ্য, একথা বারবার তাঁহারা নানা সভায় নানা পুস্তক-পুস্তিকায় প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল তাঁহারা সে লক্ষ্য হ'তে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। দেখা গেল ক্ষমতায় সমাসীন হওয়াই তাঁহাদের লক্ষ্য। বঙ্গ বিভাগের ফলে বাংলা দেশের অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে, বহু নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন। অপমানের কালিমা বহু সভ্য শিক্ষিত বাঙালী পরিবারকে কলঙ্কিত করিয়াছে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা আজও সরকারের কৃপাপ্রার্থী হইয়া স্বদেশে বিদেশে অরণ্যে মরুতে নিদারুণ অনিশ্চয়তা ও অভাবের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জীবন যাপন করিতেছেন। আমাদের অন্ন নাই, আমাদের শিক্ষা নাই, আমাদের উপার্জনের ক্ষেত্র নানা দিক হইতে সীমিত হইয়া আসিতেছে, এক কথায় ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা বাঙালীকে সব দিক দিয়াই পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে বাঙালীর এরূপ পঙ্গুত্বের খবর বারবার পাওয়া যাইবে। কিন্তু আর একটা বিস্ময়জনক খবরও বারবার মিলিবে, পঙ্গুত্ব সত্ত্বেও বাঙ্গালী বারবার গিরি লঙ্ঘন করিয়াছে। যে মন্ত্রবলে তাহা সম্ভব হইয়াছে তাহা তাহার শিল্পী-চেতনা-সম্ভূত আদর্শ বোধ, তাহা সত্য শিব সুন্দরকে

জীবনে পরিস্ফুট করিবার নির্ভীক আগ্রহ। অনার্য বাঙালী আর্য হইয়াছিল, আর্য বাঙালী বৌদ্ধ হইয়াছিল, মাৎসন্যায়ে বিব্রত বাঙালী অষ্টম শতকে গোপাল দেবের নেতৃত্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই গোপালদেবের প্রতিষ্ঠিত পালবংশ যতদিন বাঙালীর আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে নাই ততদিন সে পাল বংশের রাজত্ব সহ্য করিয়াছিল কিন্তু যেই সে আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইল পাল রাজারা অপসারিত হইলেন, আসিলেন সেন রাজারা। সেন রাজাদের পরে মুসলমান, মুসলমানের পরে ইংরেজ এবং ইংরেজের পর কংগ্রেস ওই একই মনোভাবের ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি। এবারকার নির্বাচনে দেখা গেল বাঙালী কংগ্রেসকেও বর্জন করিয়াছে। কারণ ওই একই।

সাহিত্য সভায় ইতিহাস এবং রাজনীতি লইয়া আলোচনা করিলাম কারণ ইতিহাসে এবং রাজনীতিতে বাঙালীর যে মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে সাহিত্যেও তাহা পরিস্ফুট। সত্য শিব এবং সুন্দরের সন্ধানে বাঙালীর সাহিত্যও বারংবার মত পথ আঙ্গিক পরিবর্তন করিয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোন সময়ে পুরাতন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। প্রাচীনতম বাংলার নমুনা আমরা পাই কয়েকটি শিলা লেখে, বাঙালী পণ্ডিত সর্বানন্দ কৃত অমরকোষের টিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গান ও দোহায়। ইহার পরই চণ্ডীদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের উল্লেখ পাই। অনেকে মনে করেন জয়দেবের গীত-গোবিন্দ প্রথমে প্রাচীন বাংলার রচিত হইয়াছিল, পরে তাহা সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। কবি জয়দেব ছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা গৌরবের আসন লাভ করিয়াছে এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখা দিয়াছে ইহাই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। বাংলা সাহিত্যের শৈশবে তাহা কেবল কবিতাতেই নিবদ্ধ ছিল এবং তাহার মুখ্য বিষয়-বস্তু ছিল দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন বাংলা ভাষার জন্ম দশম শতাব্দীতে হইলেও উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্য সৃষ্ট হইয়াছে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে। এই

শতকে যে সব কবির দেখা আমরা পাই তাঁহাদের মধ্যে আছেন রামায়ণকার কৃত্তিবাস ওঝা, পদরচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার কবি চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচয়িতা মালাধর বসু। এই কালেই মিথিলায় মহাকবি বিদ্যাপতির আবির্ভাব। বিদ্যাপতির প্রভাবও বাংলার অনেক বিখ্যাত পদরচয়িতাকে কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে তুর্কিরা বাংলা দেশ আক্রমণ করে, সেজন্য বাঙালীর সাহিত্য প্রতিভা কিছুকালের জন্য স্তিমিত থাকিয়া, পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু যে জিনিসটি লক্ষ্যণীয় তাহা এই যে বাংলা সাহিত্য এই সময়ে দেব-দেবীর উপাখ্যানেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখিয়াছে। নানাবিধ মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া বাঙালী কবিরা সেই সময় বাঙালী রসপিপাসুদের চিত্ত যেন হিন্দু ধর্ম রসে আপ্লুত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন্। ইহা কি বাংলায় ইসলাম ধর্ম অভ্যুদয়ের প্রতিক্রিয়া ? অসম্ভব নয়। কারণ ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের মহিমাময় কার্যকলাপ যাহা করিয়াছিল, তাঁহার সাম্যের বাণী, তাঁহার প্রেম ধর্ম প্রচার, তাঁহার সঙ্কীর্তন এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তৎকালীন বঙ্গসমাজে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাকে এক অভিনব ধরনের বিদ্রোহ বলিতে অত্যুক্তি হয় না। এই বিদ্রোহের বাণী—অর্থাৎ সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—এই বাণী সেকালের সাহিত্যেও নানাভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। তখনকার মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, পরমানন্দ গুপ্ত, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি এই সময়ের বিখ্যাত লেখক। তাঁহাদের রচনাতেও শ্রীচৈতন্যের বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের বহুল প্রচার ও কাব্যগানে ব্রজবুলির প্রচলনও এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা কিন্তু তাহা অতি মধুর। নূতনত্বের দিকে অভিনবত্বের দিকে বাঙালীর মন চিরকালই উন্মুখ। এই কৃত্রিম ভাষাতেই বাঙালী প্রতিভা যাহা সৃষ্টি করিল, তাহা প্রাণবন্ত, তাহা মৃত্যুঞ্জয়ী। রবীন্দ্রনাথও সেই ভাষাতে ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ের আর একটি সাহিত্য-কীর্তি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। অনেকেই চণ্ডীমঙ্গল

লিখিয়াছিলেন কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। মুকুন্দরাম সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে একজন। চণ্ডীমঙ্গল ছাড়াও কবিতায় তিনি নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য আত্মকাহিনী বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে লেখা হয় নাই। সে হিসাবে মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী জীবনী-সাহিত্যে প্রথম পথ প্রদর্শক। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা দেশে পাঠান-মোগলের সংঘর্ষে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বাস্তবানুগ মর্মস্পর্শী বিবরণ আমরা ওই জীবন চরিতে পাই। অত্যাচারের ফলে মুকুন্দরামকে দেশ-ছাড়া হইতে হইয়াছিল, তিনিও একদিন 'রেফিউজি' হইয়াছিলেন এসবের বিস্তৃত বিবরণ তিনি তাঁহার কাব্যে দিয়া গিয়াছেন। মোগল রাজত্বের সময় যে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় আমরা পাই তাহাও মুখ্যতঃ বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ভাবরসে আবিষ্ট। কৃষ্ণলীলাই তখনও বাঙালী কবিদের প্রধান প্রেরণা। এই সময় মহাভারতকার কাশীরাম দাসের আবির্ভাব। এই সময় অনেক মঙ্গলকাব্যও রচিত হইয়াছিল। এই সব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটু নূতন স্বাদ মেলে কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যে। ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায় ইহার নায়ক। কুম্ভীর দেবতা কালুরায়ের কাহিনী এবং পীর বড় খাঁ গাজির কাহিনীও ইহাতে আছে। মঙ্গলকাব্যের একঘেয়েমির মধ্যে নূতনত্ব সৃষ্টি করিবার প্রয়াস ইহাতে আছে এবং ইহাই বাঙালী প্রতিভার বিশেষত্ব। অভিনবত্বের দিকে তাহা চিরকাল উন্মুখ। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনাও উল্লেখ-যোগ্য। আরাকানের রাজসভায় সেই সময় বাংলা সাহিত্যের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আরাকানের সভায় দৌলত কাজি ও আলাওল সমাদৃত হইয়াছিলেন। চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহারা বাংলা কাব্যে যে নূতন সুর বাজাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষার অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল বলিতেছেন—বঙ্গসাহিত্যে এই যে একটানা নিছক ধর্মের সুর এতদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা বদলাইয়া নূতন ধরনের অবিমিশ্র প্রেমকাহিনী লইয়া কাব্যরচনার সম্মান মুসলমান কবিদেরই প্রাপ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মুসলমান

কবিরা শুধু যে নিছক ধর্মাত্মক কাব্যরচনার ধারা পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, ফার্সি ও প্রাচীন হিন্দী সাহিত্য হইতে অজ্ঞাত অভিনব কাহিনী সমূহ আনিয়া বাংলা সাহিত্যে এক নব যুগের সৃষ্টি করিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের জন্ম। ছন্দোবদ্ধ কবিতার সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করিয়া বাঙালী প্রতিভা যদিও মুক্ত আকাশের সন্ধান পাইল কিন্তু সে প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি আমরা দেখি উনবিংশ শতাব্দীতে। এযুগের যে দুইটি সাহিত্যকারকে বাঙালী আজও মনে করিয়া রাখিয়াছে তাঁহারা গদ্যলেখক ছিলেন না। ছিলেন কবি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অনেক মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচিত হইয়াছিল—কিন্তু বাঙালী তাহাদের মনে রাখে নাই। মনে রাখিয়াছে ভারতচন্দ্রকে এবং শক্তিসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকে। ভারতচন্দ্রের রসবোধ, মৌলিকতা এবং অনন্য ভাষা আজও রসিক সমাজে সমাদৃত। রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতগুলি আজও আমরা ভুলি নাই।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা করিল। এই বৎসর হুগলী শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে প্রথম বাংলা মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল। বাংলা হরফ স্বহস্তে প্রস্তুত করেন উইলকিন্স সাহেব। পঞ্চানন কর্মকার পরে তাঁহার নিকট ইহা শিক্ষা করে।

সে যুগের গদ্য গ্রন্থগুলি এখন প্রায় অপাঠ্য বলিয়া মনে করি। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' প্রভৃতি পুস্তকে যে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সহিত আধুনিক বাংলা গদ্যের তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে কত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালী প্রতিভা কি অসাধ্যসাধন করিয়াছে. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (বত্রিশ সিংহাসন-প্রণেতা) সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনিই সেকালে বাংলা গদ্যকে একটা সুষ্ঠু রূপ দিয়াছিলেন। এই সময়ই কেরী মার্শমান

এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সক্রিয় চেষ্টায় বহু বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। বাংলার বহু মনীষীও সোৎসাহে সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় লিখিয়াছিলেন বেদান্ত দর্শন, শাস্ত্রবিচার বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট বাংলা ব্যাকরণ এবং ব্রহ্মসঙ্গীত। সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমের সঙ্কলন করাইয়াছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। এযুগের অধিকাংশ গদ্য রচনাই সংস্কৃত, ফারসী বা ইংরাজীর অনুবাদ। বাংলার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পত্তনের দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সাধারণ লোকের সাহিত্য পিপাসা কিন্তু তখন মিটিত কবিওয়ালাদের গীত ও যাত্রায়, অর্থাৎ তরজা, খেউড়, কবিগান, পাঁচালি ও হাফ্ আখড়াইয়ের মাধ্যমে। এই সব সাহিত্যকর্মে এবং তাহাদের জনপ্রিয়তায় বাঙালী মনের একটি বিশেষ প্রবণতার চিত্র আমরা দেখিতে পাই। রঙ্গ-রসিকতা, দল বাঁধিয়া প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করা বাঙালী চরিত্রের যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহা সে যুগের এই সব রচনায় পরিস্ফুট। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহার প্রভাব ছিল। আমার মনে হয় এখনও সে প্রভাব সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই, বাঙালীর সেই পুরাতন প্রবৃত্তি এখন নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। নানা রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ্য সভায় পরস্পরের বিরুদ্ধে নেতারা যাহা বলেন, শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে যাহা লেখা হয়, এমন কি সমালোচনার ছলে লেখকদের নামেও যে সব উক্তি অনেক ক্ষেত্রে ছাপা হয় তাহাতে মনে হয় এই বিশেষ প্রবণতা এখনও আমাদের উত্তেজনা ও আনন্দের খোরাক জোগায়। এ প্রবণতা ভাল না মন্দ এ প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু শুধু বলা যায় যে ভাল মন্দ যাহাই হউক ইহাই অনিবার্য। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের বা হাস্যরসের উদ্ভবই এই মনোবৃত্তি হইতে। পশুরাই গড্ডলিকা দ্বারা চালিত হয়, ফ্যানাটিক্‌রাই নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া দলবদ্ধ হইতে পারে। বাঙালী আত্মসচেতন, স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত শিল্পীর জাতি, তাহারা সকলেই একদলভুক্ত হইবে এ আশা দুরাশা। বাঙালীদের একাধিক দল থাকিবেই এবং পরস্পর পরস্পরের সমালোচনা করিবেই। সে

সমালোচনা যে সব সময়ে সাহিত্যরস বর্জিত হইবে একথা বলা যায় না। মনে রাখিতে হইবে বাঙালীর ব্যঙ্গ-সাহিত্যের উৎসই এই সব সমালোচনা।

বাঙালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার মন। সে মন বৈচিত্র্যবিলাসী এবং বিদ্রোহী। তাহার এই বৈচিত্র্যবিলাসের চিহ্ন শুধু যে বাংলা সাহিত্যে বর্তমান তাহা নয়, তাহা তাহার আচার-আচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আহার-বিহারে, সামাজিক আবহাওয়ার নিত্য পরিবর্তনে দেদীপ্যমান। হিন্দু বাঙালী, মুসলমান বাঙালী, খ্রীষ্টান বাঙালী, বৌদ্ধ বাঙালী, শাক্ত বাঙালী, বৈষ্ণব বাঙালী, ব্রাহ্ম বাঙালী, নাস্তিক বাঙালী সবাই বাঙালী।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা ভাষায় ছাপা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই সাময়িকপত্রের মারফত বাঙালী যে শুধু বাংলা গদ্যের রসাস্বাদন করিল তাহা নয়, সংবাদপত্রের মারফত সে আত্মপ্রকাশও করিল। তখনকার 'সমাচার দর্পণ', 'বাঙ্গলা গেজেটি', 'সংবাদ কৌমুদী' সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকা পাঠ করিলে সে যুগের সজাগ বাঙালী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। এই সংবাদ প্রভাকরেই কবিতা লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই—ইয়ং বেঙ্গলদের যুগে। এ যুগের নেতা ছিলেন অধ্যাপক ডিরোজিওর শিষ্যগণ—রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি মনস্বীগণ বাংলায় নব জাগরণের হোতা রূপে বাঙালীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। ইহারা ছিলেন বিদ্রোহী, সর্ববিধ সামাজিক সংস্কারের অগ্রদূত। তাঁহারা সেদিন যে আগুন জ্বালাইয়াছিলেন সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সে আগুন আজও জ্বলিতেছে। তাঁহাদের বিদ্রোহের মূল সুর ছিল যুক্তিবাদ এবং সে যুক্তিবাদ প্রধানত পাশ্চাত্ত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার

প্রতিধ্বনি। আহারে বিহারে চিন্তায় 'সাহেব' হওয়াই ছিল তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান এবং লক্ষ্য। ইহা সে যুগের রক্ষণশীল সমাজে যদিও উৎকট বলিয়া গণ্য হইয়াছিল কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে সে সময় যে মেকি আধ্যাত্মিকতা ও প্রাচীন সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মাবলী প্রাণহীন কুৎসিত তামসিকতায় পরিণত হইয়া আমাদের সমাজকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহার বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গল অকুণ্ঠ ভাষায় জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, সাহিত্যে ও সমাজে সুস্থ প্রাণবন্ত যুক্তিযুক্ত পাশ্চাত্ত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস তাঁহারা সেদিন করিয়াছিলেন তাহার ফল আমাদের সাহিত্যে ও সমাজে সুদূর-প্রসারী হইয়াছে। ইহার পরই বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। ইয়ং বেঙ্গলদের আন্দোলনের ফলে এদেশে স্কুল, কলেজ, নানাবিধ অ্যাসো-সিয়েশন তো হইয়াছেই, স্ত্রী-শিক্ষারও আয়োজন হইয়াছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে বাংলায় নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে এবং আরও এমন অনেক সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছে যাহার প্রভাব বাঙালীকে জীবনের নানাক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, মুক্তি সংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়াছে। সে যুগের সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে ইহার অনেক খবর আছে। সেই যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দ। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকূল হওয়ায় বাঙালীমনের উর্বরক্ষেত্রে সেদিন যে বীজ সেই যুগে উপ্ত হইয়াছিল তাহার ফসল আজও যেন অফুরন্ত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যকীর্তি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এখন ১৯৬৯। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স একশত বাইশ বছর। এই স্বল্পকালের মধ্যে বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভা যে বিস্ময়কর ঐশ্বর্যে বঙ্গবাণী মন্দিরকে মণ্ডিত করিয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে নাই। এই প্রবন্ধে সে ঐশ্বর্যের সম্যক্ পরিচয় দিবার সুযোগ নাই, স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে একটি জিনিস শুধু বলিতে চাই। এ কথা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে 'ইয়ং বেঙ্গল' একদা যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জয়ধ্বজা বহিয়া বাংলা সমাজকে আলোড়িত করিয়াছিলেন সেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আলোক আমাদের সাহিত্যকেও প্রদীপ্ত করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শ না পাইলে হয়তো আমরা মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমকে পাইতাম না, কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে উদ্বুদ্ধ হইলেও তাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের নকলনবীশ ছিলেন না। তাঁহারা স্রষ্টা ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্ত, ভ্রমর এবং কমলাকান্ত—একেবারে বাঙালী চরিত্র। মেঘনাদ-বধের রাবণও বাঙালী। রাবণচরিত্রে বাঙালী জীবনেরই ট্র্যাজেডি যেন মূর্ত দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তো ভারতবর্ষেরই শাশ্বতবাণী নূতন সুরে ছন্দিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সেন, কবিশেখর কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজি নজরুল ইস্‌লাম প্রভৃতি কবিগণের প্রত্যেকেরই লেখা স্বকীয়তার মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইহাদের সকলের সৃষ্টিতে যে সুর বাজিয়াছে তাহা বিদেশী সুর নহে, খাঁটি স্বদেশী সুর। শরৎচন্দ্রের লেখায় আমরা আমাদেরই নিতান্ত আপনজনের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বিদেশী প্রভাব আমাদের একদা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সত্য কিন্তু আমাদের যুগন্ধর স্রষ্টা সাহিত্যিকরা যে কেবল কেরানীগিরি করেন নাই এ সত্য আমাদের সাহিত্যে আজ সমুজ্জ্বল। অতি আধুনিক সাহিত্যের কিছু লেখক বিশেষ করিয়া যাঁহারা দুর্বোধ্য অতি-আধুনিক কবিতা লেখেন কিম্বা যাঁহারা লালসা-উদ্দীপক নোংরা বই লিখিয়া বহির বাজারে সস্তায় নাম কিনিতে চান—বোধহয় তাঁহাদের সাহিত্য-প্রেরণা বিদেশী সাহিত্য হইতে আমদানী করিয়াছেন। কাব্যধর্মী সাহিত্য সম্বন্ধে এই সার সত্যটি সকলের মনে রাখা উচিত—বিষয় যাহাই হউক প্রকাশের আঙ্গিক যত বিচিত্রই হউক রসোত্তীর্ণ না হইলে সে রচনা সাহিত্যের বাজারে টিকিবে না। আমাদের সাহিত্য-জীবনের প্রথমকালে 'রমেশদার

আত্মকথা', 'পতিতার আত্মকথা' প্রভৃতি পুস্তক বাজারে আলোড়ন তুলিয়াছিল। আজকাল সে সব বইয়ের নামও শুনিতে পাই না। যাঁহারা অতি-আধুনিক কবিতা লিখিতেছেন তাঁহারা একটা নূতন আঙ্গিকে নূতন ধরনে রবীন্দ্র-প্রভাব-বর্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। এই নব প্রচেষ্টা হয়তো একদিন রূপে রসে সার্থক হইয়া উঠিবে। এখনও পর্যন্ত কিন্তু তাঁহাদের দুর্বোধ্য রচনার সম্পূর্ণ রসগ্রহণে অসমর্থ হইয়া আছি। জীবনানন্দ দাশ অনেক দুর্বোধ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাঙালী রসিকের নিকট অমর হইয়া থাকিবেন তাঁহার 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতা সেন' কাব্য দুইটির জন্য। এগুলি দুর্বোধ্য নহে।

অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সভায় আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই আবার বলিতেছি।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শাশ্বত সৃষ্টি কতটা হইয়াছে তাহার কোন সন্ধান বর্তমান যুগের কোনও লেখক দিতে পারিবেন না। তাহার বিচার মহাকালের দরবারে যথাসময়ে হইবে। তবে একটা জিনিস বলা যায়, বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর লেখা হইতেছে এবং তাহাদের বৈচিত্র্যও কম নয়। এই প্রাচুর্য আনন্দজনক। আমবাগানের প্রত্যেক গাছে যখন প্রচুর মুকুল আসে, মাঠে যখন কচি ধানের শ্যাম-সমারোহ দেখি তখনই প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত কয়টা আম পাকিয়া ঘরে আসিবে, অথবা কয় মণ ধান ভাণ্ডারে উঠিবে তখন এ হিসাব করিতে মন চায় না। সরস্বতী প্রকাশের দেবতা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বহুল সৃষ্টির বহুমুখী প্রকাশ-লীলায় তাঁহার মহিমার স্বাক্ষর। প্রকাশের আগ্রহ, ঔৎসুক্য এবং উন্মুখতাই জীবন্ত প্রাণের পরিচয় বহন করে। আজ যদি বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের জোয়ার আসিয়া থাকে তাহা তো আনন্দের কথা। যে সব সমালোচক 'আজকাল বাংলা সাহিত্যে কিছুই হইতেছে না' বলিয়া বিলাপ করেন তাঁহাদের মধ্যে কাব্যরসিক হয়তো থাকিতে পারেন কিন্তু দূরদর্শী জীবনরসিক নাই। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আমলেও এই রব উঠিয়াছিল কিন্তু আজ আমরা বুঝিতেছি এই সব আক্ষেপোক্তি সত্যের মর্যাদা লাভ করে নাই। বর্তমান বাংলা

সাহিত্য সম্বন্ধে এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অনেক উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু উপন্যাস বা ছোট গল্পই নয়, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস, কাব্যধর্মী প্রবন্ধ গ্রন্থ, দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে নানা পুস্তক, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ বিশেষ করিয়া নূতন ধরনের অনেক নাটক বঙ্গবাণীর মন্দিরকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। নবনাট্য আন্দোলনে উদীয়মান নাট্যকারগণের আত্মপ্রকাশ করিবার যে প্রয়াস সূচিত হইয়াছে তাহাকে নাট্যামোদী মাত্রেই অভিনন্দন জানাইবেন।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে সদ্‌গ্রন্থের অভাব নাই, অভাব সেগুলির পঠন-পাঠন ও প্রচারের। আজকাল বহুল প্রচারিত সাময়িক সংবাদ-পত্রগুলি মুখ্যত রাজনৈতিক পত্রিকা অথবা সিনেমা পত্রিকা। সে সব পত্রিকাগুলিতে সাহিত্যের যে খবর থাকে তাহা খুবই অসম্পূর্ণ এবং সেগুলি ছাপাইতে হইলেও কিছু তদ্বির-তোয়াজের প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে বাঙালী সাহিত্য সাধকদের খবর, তাহাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, দেশকে সাহিত্যের বাণী দিয়া সুস্থ ও স্বস্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাজনীতি এবং সিনেমার ভিড়ে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গবাণীর কণ্ঠ আজ অবরুদ্ধ। সাহিত্যিকরা সুষ্ঠুভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। বাংলা সাহিত্যকে যদি ভাবীযুগে পথ-নির্দেশকের ভূমিকা লইতে হয় তাহা হইলে তাহার নিজস্ব একটি কাগজ থাকা প্রয়োজন, শুধু সাহিত্য এবং সাহিত্যিকই সে পত্রিকার মুখ্য বিষয় হইবে না, সে পত্রিকা বাঙালী মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের দর্পণ স্বরূপ হইবে। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হইলে ভালো হয়। স্বীকার করি ইহা অর্থ-সাপেক্ষ। কিন্তু আমাদের স্বাধীন সরকার দেশকে গড়িয়া তুলিবার জন্য নানাবিধ হিতকর প্রকল্প রচনা করিতেছেন। সাহিত্যের উন্নতি কি সে প্রকল্পের অঙ্গীভূত হইতে পারে না? আজকাল সাহিত্যও একটা পেশা এবং সাহিত্যিকরাও আজকাল 'মেহনতি' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। দেশ গড়িয়া তুলিতে হইলে সাহিত্যিকদের এবং শিক্ষকদের সহযোগিতা প্রয়োজন একথা নিশ্চয়ই কোন সরকার অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সরকারের অর্থানুকুল্যে সাহিত্য পত্রিকা বাহির করিবার একটা বিপদ

আছে। সে পত্রিকা কালক্রমে হয়তো সরকারী মুখপত্র হইয়া কোনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচার-পত্রিকায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতে পারে। ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের দেশে আজকাল অনেক ছোট ছোট সাহিত্যিকগোষ্ঠীর খবর পাই। অনেক ছোট ছোট পত্রিকাও আছে। সে সব পত্রিকায় অনেক ভালো লেখাও প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া কি একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীতে মিলিত হইতে পারেন না? মোট কথা যেভাবেই হোক বাঙালী সাহিত্য-সাধকদের জন্য এমন একটি পত্রিকা চাই যাহাতে সাহিত্যের, মনুষ্যত্বের চিরন্তন আদর্শ নিঃশঙ্ক কণ্ঠে বিঘোষিত হইবে। সৎ সাহিত্যিকদের আর একটা মহা অসুবিধার কারণ প্রকাশক সমস্যা। প্রকাশকরা বলেন—ভালো বই বিক্রয় হয় না। বিক্রয় হয় যৌন-লালসা-সিক্ত বই, ডিটেকটিভ উপন্যাস অথবা লঘু প্রেমের গল্প। প্রবন্ধের বই, কবিতার বই, উচ্চাঙ্গের উপন্যাস বা নাটকের নাকি কোনও বাজার নাই। যে দেশে কয়েক কোটী লোকের বাস, যে বাঙালীরা সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলিয়া সম্মানিত সেখানে ১১০০ বা ২২০০ বই বিক্রয় হইতে আট দশ বৎসর লাগে। সেইজন্য অনেক লেখক-লেখিকা—লেখাই যাঁহাদের পেশা—তাঁহারা ভালো বই লেখার প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পেটের দায়ে নাকি নিম্ন মানের নিকৃষ্ট বই লেখেন। ইহা যদি সত্য কথা হয়, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে! আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকাগণ যদি ভালো বই কিনিয়া সৎ সাহিত্যের উৎসাহ না দেন তাহা হইলে সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব নয়। আগেকার যুগের সাহিত্যিকরা শখের জন্য সাহিত্য-চর্চা করিতেন। রামমোহন যুগ হইতে শুরু করিয়া রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত কেহই পেটের দায়ে সাহিত্য-চর্চা করেন নাই। করিয়াছেন প্রাণের দায়ে, প্রেমের দায়ে; প্রতিভার তাগিদে। আজ কিন্তু যুগ বদলাইয়াছে। আজ অনেক সাহিত্যিকই পেশাদার সাহিত্যিক। সাহিত্য বেচিয়াই তাঁহাদের অন্নসংস্থান করিতে হয়। পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহাদের রচিত উৎকৃষ্ট বই যদি না কেনেন তাহা হইলে এ ভাষার সাহিত্য-গৌরব অচিরেই বিনষ্ট হইবে। "মোদের

গরব. মোদের আশা—আ-মরি বাংলা ভাষা”—এই গান তখন ব্যঙ্গের মতো শুনাইবে। সাহিত্যিকদের আরও নানারকম অসুবিধা আছে। অনেক সাহিত্যিকই প্রকাশকদের কবলস্থ, অনেক সাহিত্যিকের লেখা অন্যান্য ভাষায় বিনা অনুমতিতে বিনা পারিশ্রমিকে অনূদিত হয়, অনেক সময় তাঁহাদের নামও উল্লিখিত হয় না। পাকিস্তান অনেক বাংলা পুস্তক গায়ের জোরে আত্মসাৎ করিয়াছে। লেখকদের পক্ষে এ সব সমস্যা-সমাধান সহজ নহে। এই সব ব্যাপারে সাহায্য করিয়া আমাদের সরকার বাঙালী সাহিত্যিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না। বছরে একবার তাঁহারা একটি পুরস্কার-প্রহসন অভিনয় করিয়া মনে করেন যে সাহিত্যিকদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ এবং যথেষ্ট সম্মান দেখানো হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, বা ইচ্ছা করিয়াই হয়তো বুঝিতে চান না যে তাঁহাদের অনুগ্রহ-পুষ্ট গুটি কয়েক লোকের ভোট দ্বারা সাহিত্যের মান নির্ণীত হয় না। রসিক পাঠক-পাঠিকারা ভালো করিয়াই জানেন কোন্ লেখক ভালো. কোন্ লেখক মন্দ। ভোটের মহিমায় অযোগ্য লোকের মাথায় যখন পুরস্কারের মুকুট পরানো হয় তখন কেহ মুগ্ধ হয় না, সকলেই মনে মনে হাসে। ইংরেজ আমলে আমরা রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর জাতীয় লোকদের যে অনুকম্পার চক্ষে দেখিতাম ইহাদেরও সেই চক্ষে দেখি সাহিত্যিককে পুরস্কার দিবার মালিক পাঠক-পাঠিকা সম্প্রদায়। তাঁহাদের শ্রদ্ধাই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কোন্ লেখক সর্বশ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া মাথা ঘামানো গভর্নমেণ্টের পক্ষে নিতান্তই অব্যাপার। তাঁহারা আরও নানা উপায়ে সাহিত্যিকদের উপকার করিতে পারেন।

আমাদের যুগের আর একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সে সমস্যা ছাত্র-বিক্ষোভের সমস্যা, যুব-আন্দোলনের সমস্যা, উন্মত্ত কিশোর-কিশোরী-যুবক-যুবতীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সমস্যা। এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশেরই সমস্যা নহে, ইহা বিশ্বের সকল দেশেরই সমস্যা। যে যন্ত্রসভ্যতা তাহাদের মনে বহুবিধ ক্ষুধা জাগাইয়াছে, যে কামনা-রঞ্জিত কল্পনায় তাহাদের চিত্ত নানা রঙের স্বপ্ন

দেখিতেছে কোনও রাজ্য বা সমাজব্যবস্থার পরিবেশেই সেক্ষুধা মিটিতেছে না, সে স্বপ্ন সফল হইতেছে না, তাই এই বিক্ষোভ। ইহার উপরে আছে শিক্ষার অভাব, আদর্শের অভাব, দারিদ্র্যের তাড়না, পাশব প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিবার বহুবিধ প্ররোচনা, এমন কি ঘরেও স্থানাভাব। তাই এই সব কিশোর-কিশোরী-যুবক-যুবতীরা আজ রাস্তায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—সব ঝুট হ্যয়। সব ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দাও।

এই ছেলেমেয়েদের আমি দোষ দিতে পারি না। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা লোক খারাপ নয়। তাহারা আদর্শবাদী। কিন্তু তাহারা ক্ষুধিত পীড়িত পিপাসিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত! তাহাদের দেখিয়া রাগ হয় না, কষ্ট হয়। আমার মনে হয় এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তাহারা—অন্তত বাঙালী ছেলেমেয়েরা, একদিন তাহাদের পথ আবিষ্কার করিবে। সাহিত্য হয়তো তাহাদের সে পথের সন্ধান দিবে, হয়তো সে পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া অনেকে প্রাণ বিসর্জন দিবে, তবু আমি জানি পথ তাহারা আবিষ্কার করিবেই। অষ্টম শতকে যে উত্তেজনা গোপাল দেবকে নেতা করিয়া বাংলাদেশে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল, যে উত্তেজনায় রাজা গণেশ প্রমুখ রাজারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে যে উত্তেজনা বঙ্গদেশকে উদ্বেলিত করিয়াছিল, যে উত্তেজনার বশে হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া মদ্য সংযোগে গোমাংস ভক্ষণ করিয়া নিজেদের ইয়ং বেঙ্গল নামে আখ্যাত করিয়াছিল, যে উত্তেজনা নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যে উত্তেজনা অগ্নিযুগের বীরদের মরণের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, যে উত্তেজনায় বাঙালী কংগ্রেস গড়িয়াছিল এবং যে উত্তেজনায় সে আজ কংগ্রেসকে বর্জন করিয়াছে—সেই উত্তেজনার অগ্নিই আমি যেন ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অগ্নি নিজের পথ নিজেই করিয়া লয়। ইহারাও চিরকাল বিক্ষুব্ধ থাকিবে না। পথ পাইলেই শান্ত হইবে। কিন্তু সে পথ কী, কোথায়, কী তাহার স্বরূপ তাহা এখন নির্ণয় করা শক্ত।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এবং সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্রোহী শিল্পী বাঙালীর

যে পরিচয় আমরা পাই তাহাতে আশা করিবার সঙ্গত কারণ আছে, যদিও এখন আমরা নানা ভাবে বিব্রত, নানা অত্যাচারে উৎপীড়িত, নানা আদর্শের সংঘাতে বিক্ষত, বিভ্রান্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট তবু আমি জানি এই বাঙালী আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

একটি ছোট কবিতা দিয়া বক্তব্য শেষ করি—

ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর নাম
সূর্যসম জ্বলিয়াছে, জ্বলিবেও পুনরায়
এই আশা উচ্চ কণ্ঠে ব্যক্ত করিলাম।
স্খলন, পতন তার ঘটিয়াছে জানি বহুবার
কিন্তু জানি উদ্ভাসিত হইবে আবার
তাহার মহিমা
যে মহিমা, সিদ্ধ মনস্কাম।
সে আবার উঠিবেই
সে আবার ফুটিবেই
সে আবার চলিবেই
হাতে তার জ্বলিবেই
আদর্শের জ্বলন্ত মশাল
দগ্ধ করি বাধা বিঘ্ন
দীর্ণ করি তমিস্রা করাল।
সত্য-শিব-সুন্দরের চিরন্তন বেদীমূলে
জানি জানি সেই সত্যকাম
পুনরায় নিবেদিবে প্রাণের প্রণাম
নিঃসংশয়ে এই আশা উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করিলাম।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা সকলে আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। যে পুণ্যভূমির উপর আমাদের সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তমলুকের সেই ঐতিহাসিক ভূমির উপর দিয়া একদা বাঙালীর বহুবর্ণাঢ্য প্রাণের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল। কীর্তি-সমুজ্জ্বল সেই তমলুককেও নিবেদন করি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। পৌরাণিক যুগের তাম্রলিপ্ত, ময়ূরধ্বজ-তাম্রধ্বজের তাম্রলিপ্ত, বৌদ্ধযুগের বিহার-মণ্ডিত তাম্রলিপ্ত, বহুবাণিজ্যপোত-সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক বন্দর তাম্রলিপ্ত. মাহিষ্য রাজাদের ঐতিহ্যময় তাম্রলিপ্ত, তামিল জাতির আদিনিবাস তাম্রলিপ্ত, তোমাকে প্রণাম করিবার অধিকার আমাদের আছে কি? আমাদের জীবনে তোমার অতীত মহিমা আর তো স্পন্দন জাগায় না, আজ আমরা ভিক্ষুক, আজ আমরা অন্তঃসারশূন্য গজভুক্ত কপিত্থবৎ। আমাদের ঐশ্বর্য নাই, আর আমরা দাতা নই। তমলুকের সুসন্তান স্বদেশসেবক ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তমলুকের অতীত মহিমা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—সেদিন ভারত ছিল সংস্কৃতির দাতা গ্রহীতা ছিল অন্যেরা। পূর্ব-পশ্চিমের লোকেরা। আজ অবস্থা ঠিক বিপরীত। আমাদের এই অধঃপতনের কারণ অনেক পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভীরুতা, আলস্য, বিশ্বাসঘাতকতা, অসাধুতা, পরশ্রীকাতরতা এবং নিশ্ছিদ্র স্বার্থপরতা আমাদের অগ্রগতির অন্তরায়। মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে চাহিলে দেখা যায় যে, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই বাঙালীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নাই। ইহার ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। ধর্মক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ বাণীর উদ্গাতা শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্যকে বাঙালীই নষ্ট করিয়াছে। 'নেড়া-নেড়ির দল' বা 'জাত হারালেই বোষ্টম' প্রভৃতি সুপ্রচলিত উক্তিগুলিই

প্রমাণ করে শ্রীচৈতন্যের মহত্ত্বকে বাঙালী মহীয়ান করিয়া রাখিতে পারে নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজা গণেশের উচ্চ শির তাঁহার পুত্র যদুই অবনত করিয়াছিল। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও বাঙালী সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল—বিশেষত মুসলমান রাজত্বের সময়—কিন্তু ঐ দুটি ক্ষেত্রেই বাঙালী প্রতিভার যে স্বর্ণদ্যুতি বিকিরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজও বাঙালীর গৌরব বলিয়া কীর্তিত। বস্তুত আজও সমগ্র পৃথিবীতে বাঙালীর যে যৎসামান্য খ্যাতি আছে, তাহা তাহার সাহিত্য ও শিল্পের জন্য। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও সাহিত্য ও শিল্প নানাভাবে মূর্ত। তাহার বারমাসের তের পার্বণে, তাহার আহার-বিলাসে, তাহার পোশাকের নিত্যনূতন পারিপাট্যে, তাহার অজস্র সভায়, সঙ্গীতে, যাত্রায়, থিয়েটারে, তাহার নিত্য-নব-প্রকাশিত সাময়িকপত্রের ভিড়ে তাহার সাহিত্য ও শিল্পপ্রবণতা পরিস্ফুট। এই প্রবণতার জন্যই সে চাকুরি-লোভী। অর্থোপার্জনের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সে ঘানিতে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। প্রতিদিন সে খানিকটা ছুটি চায় যখন সে আত্মবিনোদন করিবে। এই আত্মবিনোদনের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির স্থান নিতান্ত কম নয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আমরা কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি পাইয়াছি। আর পাইয়াছি আউল, বাউল, সহজিয়াদের গান এবং কিছু কালী-কীর্তন। শিব-দুর্গা-গণেশকে লইয়া কিছু লোক-সঙ্গীতও আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সাহিত্যের রূপ বদলাইয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এমন তিনজন তুঙ্গশীর্ষ প্রতিভাবান সাহিত্যিক পাইলাম যাঁহারা বাংলা ভাষার, বাংলা কাব্যের, বাংলা সাহিত্যের, সমস্ত বাঙালী জাতির রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া দিলেন। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তিনজন যুগান্তকারী রূপকার। ইঁহাদের অনুসরণ করিয়াই যে বাংলা সাহিত্য বহুধা-বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত

নেই। সে সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় আমি এ-প্রবন্ধে দিব না। আমি কেবল দেখিবার চেষ্টা করিব অতীতে বাঙলাদেশের বিভিন্ন যুগে কি জাতীয় সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল এবং কি ধরনের মানুষ সে সব যুগে ছিলেন, এবং এখনই বা আমাদের কর্তব্য কি।

দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কোনও গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায় না। চর্যাপদ দ্বাদশ শতাব্দীর। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এটিও দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এদেশে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যই রচিত হইয়াছিল। মুনলমানরা আসিবার পর প্রায় আড়াইশত বৎসর বাঙালীর সৃষ্টি-প্রতিভা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেন গিয়াছিল জানা যায় না।

বাঙলাদেশের অতীত যুগের পরিচয় পাই সে-যুগের কাব্য ও পুরাণ হইতে। সে-যুগে মন্দ লোক যে ছিল না তাহা নয়। কিন্তু মনে হয় সে-যুগের সামাজিক ভিত্তিটা উদাত্ত এবং সুদৃঢ় আর্য আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া বেশ মজবুত ছিল। রামায়ণকে আমরা যদি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ না-ও করি, তবু তাহাকে একেবারে অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া শক্ত। কাব্যের মধ্যেও ইতিহাস প্রচ্ছন্নরূপে থাকে। যুগের চিন্তাধারা, যুগের সামাজিক ছাপ, যুগের বৈশিষ্ট্য কবির কাব্যেও প্রতিফলিত হয়। বাল্মীকি যে অমর কাব্য লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কালের প্রতিচ্ছবি নিশ্চয় ফুটিয়াছে। বাঙলাদেশ সে-সময় অনার্য-অধ্যুষিত ছিল। রামায়ণ হইতে বুঝিতে পারি অনার্যদের সহিত যুদ্ধ সে-যুগের রাজাদের একটা বিশেষ জীবনাদর্শ ছিল এবং সে আদর্শ প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা সর্বদা তৎপর থাকিতেন। সেই আদর্শই ক্রমশ বঙ্গদেশকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। আদর্শটা খারাপ ছিল না। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, সত্য ধর্মের অনুসরণ সে আদর্শের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। সীতার মতো সতী, ভরত ও লক্ষ্মণের মতো ভাই, বশিষ্ঠের মতো গুরু, বিশ্বামিত্রের মতো বিদ্রোহী, মহাবীরের মতো ভক্ত, রাবণের মত শত্রু, রামচন্দ্রের মতো

রাজা—হয়তো বাল্মীকির কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু সে-কল্পনার কি কোনই বাস্তব অবলম্বন ছিল না? মনে হয় ছিল। কোন কল্পনাই একেবারে নিরালম্ব হইতে পারে না। তাই মনে হয় রামায়ণে যে যুগ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা একেবারে অলীক নহে। মহাভারতেও আর্য-সভ্যতার বহু গৌরব কীর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা মহাভারতেরই অংশবিশেষ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের নায়ক। তবু বলিব মহাভারত রামায়ণের মতো পবিত্র নয়। মহাভারতে অনেক নোংরামি আছে। কুমারী কুন্তীর সদ্যোজাত শিশু কর্ণকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া, প্রকাশ্য সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা, দ্রৌপদীর শিশু-পুত্রদের হত্যা করা, যুদ্ধযাত্রাকালে যুধিষ্ঠিরের বারবনিতাদের লইয়া যাওয়া, দুঃশাসনের রক্তপান, অভিমন্যু বধ প্রভৃতি চিত্র ভদ্র রুচিকে ক্ষুণ্ণ করে।

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব বাঙলাদেশের উপর কবে পড়িয়াছিল তাহা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। রামায়ণের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। মহাভারতের রচনাকাল তাহার অনেক পরে। এ-প্রভাব যখনই পড়িয়া থাকুক, মনে হয় ইহার কাব্যরূপই বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বেদে বা উপনিষদেও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তেমন উল্লেখ নাই, যৎসামান্য যাহা আছে তাহা গৌরবজনক নহে। দস্যু, পক্ষী, ব্যাধ বা ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিশেষণে তৎকালীন বাঙালীর পরিচয় তাঁহারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় সেকালের বঙ্গবাসীদের সহিত তাঁহাদের শত্রুতা ছিল। বঙ্গদেশে কেহ গেলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। আর্য জাতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা বিজিত জাতির সহিত ভদ্র ব্যবহার করেন না। সুতরাং তাঁহাদের উক্তি হইতে প্রাক্-আর্য বঙ্গদেশের সত্য চিত্র পাওয়া শক্ত। আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্লিনি বাঙালী গঙ্গা-রাঢ়ীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন, সে বর্ণনা কিন্তু গ্লানিজনক নহে, গৌরবজনক। গঙ্গা-রাঢ়ীদের হস্তী-বাহিনীর ভয়ে আলেকজাণ্ডার ফিরিয়া গিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প হইতে জানা যায়, আর্যরাই দস্যুর মতো বাঙালীর

রাজ্যে বারংবার হানা দিয়াছেন, কিন্তু সহজে তাহাদের পরাজিত করিতে পারেন নাই। এই বীর আর্য-বিরোধী বাঙালীদের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। মহাভারতে কোথাও কোথাও তাহাদের অলৌকিক শক্তিশালী মায়ারূপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যে-যুগে ছাপাখানা তো ছিলই না, হস্তলিখিত পুস্তকের রেওয়াজও সর্বত্র ছিল না। তাই সে-যুগের অনার্যদের কোন সাহিত্য বা সংস্কৃতির পরিচয় আমরা পাই না। সে যুগের অনেক প্রাচীন জাতির সাহিত্য মুখে মুখে প্রচারিত হইত, নৃত্যো-গীতে রূপায়িত হইত। চারণ-চারণীদের কথা ইতিহাসে আছে। ভারতবর্ষে অনেক আদিবাসীর সাহিত্য এখনও মুখে মুখে গানে গানে প্রচারিত। হয়তো প্রাক্-আর্য যুগের বাঙালীরাও একেবারে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিবর্জিত ছিল না এবং সে সাহিত্য-সংস্কৃতি তাহাদের শক্তসমর্থ প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে-সাহিত্য হারাইয়া গিয়াছে। ঠিক কোন্ সময় আর্যরা বাঙলার বিভিন্ন অংশকে জয় করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু আভাস মহাভারতে পাওয়া যায়। কর্ণ, কৃষ্ণ, ভীম বঙ্গবিজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সে-বিজয় কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল তাহা জানা যায় না।

আমরা বাঙলাদেশের ইতিহাস স্পষ্টরূপে পাই গুপ্তদের আমল হইতে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন বৈদিক যুগের শেষের দিকে বাঙলাদেশে আর্যপ্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। সে সময় বাঙালী নিজের ভাষা ত্যাগ করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হইতেছে। বহু জাতির সংমিশ্রণে সমুদ্ভূত এই বাঙালী জাতির গোঁড়ামি বলিয়া কিছু ছিল না। তাঁহাদের মনের কপাট-জানালা সর্বদা খোলা। নূতন কিছু দেখিলেই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা আর্যযুগে সংস্কৃত শিখিয়াছেন। বৌদ্ধ যুগে পালি শিখিয়াছেন। মুসলমানদের আমলে আরবি, ফার্সি, উর্দু। ইংরেজদের সময় ইংরেজি এবং এখন হিন্দী শিখিতেছেন। বাঙালীর মাতৃভাষা এবং পোশাক এই কারণেই একটা মিশ্রবহুবর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে। বাঙালীর শিল্প ও সাহিত্য প্রতিভাও

সম্ভবত এই সংমিশ্রণের ফল। গুপ্তদের আমলে বাঙালী প্রতিভা সংস্কৃত-সাহিত্য সৃষ্টিতে স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। বাণভট্ট গৌড়ীয় সাহিত্যে সুনিপুণ শব্দবিন্যাসের চাতুর্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ভামহ বলিয়াছেন, সংস্কৃত-সাহিত্যে গৌড়ীয় রীতিই শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ বলেন, এই যুগেই নাকি হস্ত্যায়ুর্বেদ রচিত হইয়াছিল। তাঁহার রচয়িতা পালকাপ্য বাঙালী ছিলেন। হস্ত্যায়ুর্বেদ চারিখণ্ডে এবং ১৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত বিশাল একটি গ্রন্থ—হস্তীর নানারূপ ব্যাধির আলোচনা এ-গ্রন্থে আছে। এ-যুগের আরও দুইজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, চন্দ্রগোমিন এবং দার্শনিক গৌড়াচার্য গৌড়পাদ। চন্দ্রগোমিন পাণিনির ব্যাকরণ অবলম্বনে চান্দ্র ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'তারা ও মঞ্জুশ্রীর শ্লোক', 'লোকানন্দ নাটক' এবং 'শিষ্য লেখ-ধর্ম' নামক কাব্যগ্রন্থও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মনে হয় জনসাধারণের সঙ্গে এসব সাহিত্যের তেমন যোগাযোগ ছিল না। এসব গ্রন্থ বিদগ্ধ সমাজেই পঠিত ও আদৃত হইত। তখন বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে কি ধরনের সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহা জানা যায় না বটে, কিন্তু এ-কথা জানা যায় যে, তাহারা স্বাধীন জীবন্ত জাতি ছিল। বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার ইতিহাস এবং দিল্লীতে কুতুবমিনারের নিকট প্রোথিত লৌহস্তম্ভের গাত্রে খোদিত চন্দ্র নামক রাজার ইতিহাস আমাদের যদিও বিশদ করিয়া কিছু বলে না, তবু আমরা ইঙ্গিতে বুঝিতে পারি যে, সে-যুগে বাঙালী প্রাণবন্ত ছিল। শক-হূণদের আক্রমণ তাহারা প্রতিহত করিয়াছিল, গুপ্ত সাম্রাজ্যও বেশী দিন টেঁকে নাই. কিছুদিনের জন্য একটা স্বাধীন বঙ্গরাজ্যও তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি বাঙালী কিছুদিন পরাধীন থাকিয়া বারবার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছে। পালরাজাদের পূর্বে তাহাদের এই প্রবণতার মূলে সাহিত্যের কোন প্রাণদ প্রেরণা ছিল কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে এটা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না, বৌদ্ধ সাহিত্য এবং বুদ্ধের বাণী, সংস্কৃত-সাহিত্যের গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ জাতির চরিত্র নির্মাণে সাহায্য করিয়াছিল। জাতির মধ্যে একটা ধর্মভাব জাতিকে বিপথে যাইতে দেয় নাই। তাহারা আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন

বলিষ্ঠ জাতি ছিল। যুক্তপ্রদেশবাসী মৌখরী বংশের সহিত গৌড়ের যুদ্ধ বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। ইহার পরই শশাঙ্কের আবির্ভাব। ইতিহাস বলে বাঙালী রাজাগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম রাজা। তিনি শৈব ছিলেন। তাঁহার সময় যদি কোন জনপ্রিয় সাহিত্য থাকিয়াই থাকে, তাহা ধর্মকেন্দ্রিক ছিল বলিয়া মনে হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে মালবে কালিদাস উজ্জয়িনীর রাজসভায় সভাকবি ছিলেন। বঙ্গদেশে সে-সময় তাঁহার কাব্য-প্রতিভা আলোকপাত করিয়াছিল কিনা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু এটা জানা যায় মালব্যরাজ দেবগুপ্ত শশাঙ্কের প্রিয় মিত্র ছিলেন। কে জানে হয়তো এই মিত্রতার রাজরথেই কালিদাস বঙ্গদেশে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে বাঙালী সাহিত্যিকদের উপর কালিদাসের প্রভাব কম নয়। শশাঙ্ক ৬০৬ অব্দ হইতে ৬৩৭ অব্দ পর্যন্ত বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি ছিলেন। মহারাজা শশাঙ্কের পরই বাঙলাদেশে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশত বৎসর গৌড়ের ইতিহাস অন্ধকারময়। এই যুগকে মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলা হইয়াছে। সবল দুর্বলকে গ্রাস করিতেছে, বহিরাগত শত্রুরা আসিয়া লুটপাট করিতেছে। সে-সময়ে বিভিন্ন রাজাদের সমরাঙ্গনই হইয়া উঠিয়াছিল এই বঙ্গভূমি। একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, মহারাজ শশাঙ্কের মতো অমন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার রাজত্বের পরই জাতির এমন একটা অধঃপতন হইবার কারণ কি? ইহার একটা কারণ বোধ হয় শশাঙ্ক সুযোগ্য কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় হিন্দু ধর্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আজকাল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে, সেকালে ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমনি মানুষকে অমানুষ করিয়া ফেলিত।

একশত বৎসর দুর্গতি ভোগ করিয়া বাঙালী-প্রতিভা অভিনব অনন্যতায় আবার বিকশিত হইল। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—'এই চরম দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য বাঙালী জাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।' বিবাদ—

বিসম্বাদ ভুলিয়া দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করিলেন যে, একজন যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহারা রাজপদে বরণ করিবেন এবং তাঁহার শাসন মানিয়া চলিবেন। গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহারা মনোনীত করিলেন। এই গোপালই পাল-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল দেব। গোপাল দেব রাজপদে অধিষ্ঠিত হন ৭৫০ অব্দে। এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পালবংশ বাঙলাদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস বাঙালীর গৌরবময় ইতিহাস। দেবপাল ও ধর্মপাল অর্ধ শতাব্দীর অধিকলাল আর্যাবর্তে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহারা স্বীয় বাহুবলে আর্যাবর্তে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙালী জাতির ইতিহাসে ইহা এক গৌরবময় অধ্যায়। এত সুদীর্ঘকাল কোনও রাজবংশ এমন প্রতাপ ও দক্ষতার সহিত এত বড় সুসমৃদ্ধ সাম্রাজ্য ইতিপূর্বে শাসন করেন নাই। পৃথিবীর ইতিহাসেও ইহার তুলনা মেলে না। এই শক্তিশালী পাল-সাম্রাজ্যেরও কিন্তু অবশেষে পতন ঘটিয়াছিল। মজবুত শালের গুঁড়িতেও অবশেষে ঘূণ ধরিল। নানাদিকে অন্যায়, অবিচার এবং অনাচার দেখা দিতে লাগিল। বাঙালী যে ইহা সহ্য করে নাই, তাঁহার প্রমাণ বরেন্দ্র-বিদ্রোহ। তাহার পর বর্মরাজবংশও কিছুদিন আসিয়া বঙ্গদেশের রাজা হইল। তাহার পর সেন-বংশের রাজত্ব এবং তাহার পরই মুসলমানদের আগমন। এই ক্রমশ অবনতির কারণ কি? তবে একটা কারণ অনুমান করিতে পারি। পাল যুগের গোড়ার দিকে বাঙলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের খবর পাই। অনেকে মনে করেন মুদ্রারাক্ষসের প্রণেতা বিশাখ দত্ত, অনর্ঘরাঘবের কবি মুরারি, চণ্ডকৌশিক নাটকের গ্রন্থকার ক্ষেমীশ্বর, নৈষধ-চর্চিত শ্রীহর্ষ রামচরিত কাব্যের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী সকলেই না কি বাঙালী ছিলেন। দর্শনে, ব্যাকরণে বৈদ্যকশাস্ত্রেও বহু বিখ্যাত পুস্তক এ যুগে লিখিত হইয়াছিল। সে সবের বিস্তৃত বিবরণ এ প্রবন্ধের পক্ষে অনাবশ্যক। যেটি বিশেষরূপে উল্লেখ করিতে চাই সেটি এই যে পাল রাজাগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদেরই সময় বহু বৌদ্ধ তান্ত্রিক

এবং সহজিয়া ধর্মাবলম্বীদের লেখা বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেক লেখাই অপভ্রংশ ভাষায়। এই ভাষা সাধারণ লোকেরা সহজে পড়িত ও বুঝিতে পারিত। এই প্রসঙ্গে শীলভদ্র, শান্তি দেব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভয়ঙ্কর গুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের নাম পাই। আরও জানিতে পারি পালরাজত্বে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের এক বিপুল সাহিত্য ছিল এবং তাহাদের রচয়িতা ছিলেন প্রধানত বাঙালী। বৌদ্ধধর্মকে সহজিয়া ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া বাঙালী তাহার স্বকীয়তার এবং বিদ্রোহী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। বেদকে এবং প্রাচীন বৌদ্ধধর্মকে শুধু উপেক্ষা করিয়াই নহে ব্যঙ্গ করিয়া তাহারা যে সর্বজনীন সহজ মনুষ্যধর্মের প্রবর্তন করিল তাহাতে বাঙালীসুলভ অনন্যতার পরিচয় পাই। কিন্তু এই ধর্মের গুরুবাদ এবং এই ধর্মে শক্তি সহায়িকারূপে ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী প্রভৃতির নিয়োগ এই ধর্মকে ক্রমশ অধঃপাতের দিকে লইয়া গিয়াছে। ভাল দুধ পচিয়া গেলে তাহা যেমন দুর্গন্ধ অমেধ্য অপেয় বস্তু হইয়া ওঠে, সহজিয়া ধর্মেরও অনেক স্থলে সেই পরিণতি হইল। ইহা সমস্ত জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিল। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের পূজা শেষে গুহ্যপূজায় পরিণত হইয়া এমন একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ফেলিল যে সাধারণ ভদ্রলোকেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—'বৌদ্ধধর্মের মধ্যে গুহ্যপূজা আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব, কাহাকেও দেখিতে দিব না এ পূজার অর্থ কি? অর্থ এই যে সে সকল দেবমূর্তি সকলের সম্মুখে বাহির করা যায় না। এই সকল মূর্তির নাম উহারা বলিত শম্বর। একে তো অশ্লীল মূর্তি, তাহাতে ভালো কারিগরের হাতের তৈরি, সুতরাং অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। এই সকল মূর্তি যখন বুদ্ধের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল তখন আর অধঃপাতের বাকী রহিল কি? একজন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন বৌদ্ধদের এই সকল পুঁথি ঘোমটা-দেওয়া কামশাস্ত্র।'

আমার বিশ্বাস এই কামশাস্ত্রের প্রভাব পরবর্তী কবিদের উপরও পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ জয়দেব ও চণ্ডীদাসের নাম করিতে পারি।

চণ্ডীদাস বোধহয় সহজিয়া পন্থী ছিলেন, কারণ তাঁহার কাব্যেই তাঁহার প্রণয়িনী রামী রজকিনীর উল্লেখ পাই। কাব্যে ও শিল্পে শৃঙ্গার রস আদিরস বলিয়া স্বীকৃত। এই রসকে আদিরস বলা হয় বোধহয় এই কারণে যে এই রস আদিম মানবদের রস, যখন মানুষ পশুত্বের উর্ধ্বে ওঠে নাই তখন যে রস তাহাদের উৎফুল্ল করিত তাহাই আদিরস। কিন্তু মানুষ যখন সভ্য হইয়া সমাজ বাঁধিল তখন সে বুঝিল আদিরসের আধিক্য সমাজের ভিত্তিতে আঘাত করে। জাতির জীবনেও দুর্গতি দেখা যায়। আমার মনে হয় পালবংশের রাজত্বের শেষ দিকে এই দুর্গতিই দেখা দিয়াছিল। পচা বৌদ্ধধর্মের দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া বাঙালীরা শেষে অবাঙালী কর্ণাটক দেশবাসী ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেনবংশীয় বিজয় সেনকে আনিয়া বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন। আবার সনাতন আর্যধর্ম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজয় সেন অধঃপতিত বঙ্গদেশে নবজাগরণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বল্লাল সেনও ছিলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাঁহার দুইটি বিখ্যাত পুস্তক দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর পুস্তক তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি আদর্শ রাজা এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দৃঢ়তা ও উদারতা তাঁহার চরিত্রে পরিস্ফুট ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে ঐহিক এবং মানসিক উৎকর্ষ বাঙালীর গৌরবের বিষয়। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনও বীর ছিলেন, কবি ছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। পিতৃরাজ্য রক্ষার জন্য সারাজীবন তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে—যখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসর—তখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাহার পরও কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার সভাকবিদের মধ্যে ছিলেন ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতি ধর। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ। ইতিহাস পড়িলে মনে হয় তখন বাঙালী সংস্কৃতি অতি উচ্চপর্যায়ে উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই মুসলমানদের হাতে বাঙালীর পরাজয় ঘটিল। কেন? কারণটা ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় সংস্কৃতিবান ভদ্রলোকেরা একদল ডাকাত কর্তৃক হঠাৎ

আক্রান্ত হইয়া বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সংস্কৃতির আতিশয্য অনেক সময় জাতিকে দুর্বল করিয়া ফেলে ইতিহাসে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব অবশ্য হঠাৎ শেষ হয় নাই। বক্‌তিয়ারের আক্রমণের অনেকদিন পর পর্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের পুত্রেরা বাংলাদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই।

মুসলমান রাজত্বের সময় বাংলাদেশের চরিত্র ক্রমশ অবনতির দিকে গিয়াছিল। রাজারা নিজেরাই কামুক ছিলেন। তাঁহারা সুন্দরী নারী দেখিলেই তাহাকে নিজের হারেমে পুরিবার প্রয়াস পাইতেন। জোর করিয়া বা লোভ দেখাইয়া হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিতেন, তাহাদের দেব-মন্দির এবং দেবদেবীর প্রতিমা ধ্বংস করিতেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে ভীতত্রস্ত, চরিত্রভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট বাঙালী-সমাজ রাজপুরুষদের খোশামোদ করিয়া বশম্বদ আজ্ঞাবহ ভৃত্য ও পারিষদের মত জীবন-যাপন করিয়াছেন। মুসলমান শাসনের কালকে ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াও কিন্তু বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভা একেবারে নিষ্প্রভ হয় নাই। মুসলমানদের সময়েই রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। মধ্যযুগে সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙালী-প্রতিভার তিনটি সমুজ্জ্বল অবদান—স্মৃতি, নব্যন্যায় ও তন্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দন, নব্যন্যায়ে রঘুনাথ শিরোমণি এবং তন্ত্রে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বিশ্রুত-কীর্তি গ্রন্থকার। মধ্যযুগের কাব্যেও বাঙালী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরেই বাংলাদেশে প্রধানত কাব্যের জোয়ার আসে। চম্পূকাব্য, নানাবিধ স্তবস্তোত্রও সে যুগে রচিত হইয়া-ছিল। মধ্যযুগেই চর্যাপদের খবর পাওয়া যায় এবং তাহার সঙ্গে খবর পাই ময়নামতীর গানের। এই চর্যাপদগুলির রচয়িতা ছিলেন সিদ্ধাচার্যগণ। এই প্রসঙ্গে মীননাথ, গোরখ্‌নাথ, হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চর্যাপদে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাই বোধহয় আদিবাংলা ভাষার রূপ—অনেক ঐতিহাসিক একথা মনে করেন।

সুতরাং মধ্যযুগেও ইসলাম ধর্মের সংঘাত সত্ত্বেও বাঙালী-প্রতিভা সাহিত্য রচনা করিয়াছিল। শিল্পে ও সঙ্গীতে মুসলমানদের সহিত আমাদের যে হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল তাহা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। মুসলমান রাজাদের অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য অনেক হিন্দু সঙ্গীতকার মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলামী গানের গজল, ঠুংরি প্রভৃতির মাধুর্য বাঙালীর চিত্ত হরণ করিয়াছিল। আজও আমাদের দেশে সাহিত্য ও শিল্পের জগতে জাতিভেদ নাই।

কিন্তু একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মুসলমান রাজত্বের সময় আমাদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছিল। এ দুর্দশার চরম রূপ আমরা দেখিতে পাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। দিল্লীতে মোগল বাদশাহের প্রতাপ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল; বাংলায় সিরাজউদ্দৌলার খামখেয়ালী অত্যাচারে বিব্রত ভদ্রসমাজ ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে যাহা করিয়াছিলেন তাহা না করিয়া উপায় ছিল না। তখন বাঙালী সমাজের অবস্থা ভয়াবহ। ইংরেজরা শাসনভার গ্রহণ করিবার কিছু পরেই হুতোম প্যাঁচার নক্সা রচিত হয়। তাহাতেই সে যুগের বাঙালী সমাজের যে পরিচয় আছে তাহা মোটেই গৌরবজনক নহে। সে সময়ের সাহিত্য খেউড়-খিস্তির সাহিত্য। ইংরেজদের আনুকূল্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পত্তন হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসই এদেশে আসিয়া প্রথম নির্ভর-যোগ্য শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হেস্টিংস ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজে ভাল ফার্সি জানিতেন। কলিকাতা মাদ্রাসা এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই উৎসাহে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। তাঁহারই সমর্থনে ও সাহায্যে বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানার পত্তন হয়। আমাদের ক্ষীয়মাণ ম্রিয়মাণ সংস্কৃতিকে পুনর্জীবন দান করিবার চেষ্টা তিনি নানাভাবে করিয়াছিলেন। ইংরেজরাই ব্যবসায়ের নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া এদেশের প্রায় অশিক্ষিত বুভুক্ষু বাঙালীকে অন্নদান করিয়াছিলেন সেদিন। হয়তো নিজেদের স্বার্থের

অন্যই করিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন চাকুরি না দিলে কি বাঙালীর সাহিত্য- সংস্কৃতি রক্ষা পাইত? ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিয়াই বাংলায় রেনেশাঁসের জোয়ার আসে। আমরা সর্ববিষয়ে যুক্তিপরায়ণ হইবার চেষ্টা করি, আমাদের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া উঠি, পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিচয় লাভ করি। আমাদের স্বাদেশিকতা Nationalism আমাদের ইংরেজি শিক্ষারই ফল। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালী জাতির রূপ বদলাইয়া গেল, নানা বিভাগে তাহার প্রতিভা স্ফুরিত হইল এবং সে প্রতিভার আলো সমস্ত ভারতকে আলোকিত করিয়া দিল, জগতের জ্ঞানী গুণী সমাজে বাঙালীও সম্মানের আসন পাইলেন।

বাংলা সাহিত্য কেরি সাহেবের আশ্রয়ে প্রথমে শ্রীরামপুরে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশ মধুসূদন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথে মঞ্জুরিত হইল। ইংরেজদের ছত্রছায়াতেই বাঙালী সর্বভারতীয় কংগ্রেস গড়িল, সে কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট বাঙালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালীর মনে যতদিন বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজরা আমাদের প্রকৃত হিতৈষী ততদিন তাহার ইংরেজ-ভক্তি উচ্ছ্বসিত ছিল। নকল ইংরেজ সাজিয়া তাহারা ফিরিঙ্গি-মার্কা যে ইয়ং-বেঙ্গলের দল গড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যেও প্রতিভাবান বাঙালীর অভাব ছিল না। ডিরোজিওর এই ছাত্রদের বঙ্গ-জাগরণের চারণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাহাদের সমস্ত আদর্শ সমস্ত প্রেরণার উৎস ছিল বিদেশী সাহিত্য ও সভ্যতা। সে সময় মধ্যে মধ্যে যে সব বিদ্রোহ হইয়াছিল—যেমন জঙ্গল-মহলের বিদ্রোহ, চুয়াড়দের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ—এসব কোন বিদ্রোহেই শিক্ষিত বাঙালী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ক্রমশ বাঙালী সাহিত্যিকেরাই বাঙালীর এই মনোভাব পরিবর্তন করিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূত্র ধরিয়া তাঁহার যুগান্তকারী উপন্যাস 'আনন্দমঠ' লিখিলেন। কিছুদিন পর বাহির হইল 'দেবী চৌধুরাণী'। তাহারও কিছু পর তাঁহার প্রবন্ধ 'বাংলার কৃষক'। তাহার পর শোনা গেল হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা

বাজ এই রবে', শোনা গেল রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়', নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধকাব্যও পরোক্ষভাবে আমাদের স্বদেশপ্রীতি উদ্দীপ্ত করিল। রবীন্দ্রনাথ দেশমাতৃকার বন্দনা করিলেন—'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, জগত-জননী জননী'। তিনি আরও গাহিলেন—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' রবীন্দ্রনাথ শুধু নহেন তাঁহার পরবর্তী অনেক সাহিত্যিক কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের নব-জাত স্বদেশ-প্রীতির অগ্নিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিলেন এবং সে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল যখন লর্ড কার্জন আমাদের পৃষ্ঠে সবুট পদাঘাত করিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর আমাদের স্বদেশ-প্রেমের হুতাশন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিলেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র। দেশের যুবকরা দেশের নানা স্থানে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া ইংরেজ বিতাড়নের আয়োজন শুরু করিয়া দিল। মেদিনীপুরে তরুণ কিশোর ক্ষুদিরামের হাতেই ইংরেজঘাতী প্রথম বোমা গর্জিয়া উঠিল মজঃফরপুরে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকরা ইহার পর দেশব্যাপী যে আন্দোলন গড়িয়া তুলিল তাহা আধুনিক বাঙলার ইতিহাসে এক তিমির-বিদারী অভ্যুদয়। যে মুহূর্তে বাঙালী হৃদয়ঙ্গম করিল যে ইংরেজরা শাসক নয় শোষক, যে মুহূর্তে ইংরেজ রাজপুরুষদের অত্যাচার ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া গেল তখনই তাহারা স্থির করিল ইংরেজদের এ-দেশ হইতে দূর করিতে হইবে। হীরের টুকরো ছেলেরা হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে উঠিল, আন্দামানে নির্বাসিত হইল। এই স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী সাহিত্যিকদের অবদান প্রচুর। এ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বেও তাঁহাদের সঞ্জীবনী প্রেরণা দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ, তাহা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথের পরেও অনেক সাহিত্যিক আমাদের এই উদ্বোধনকে প্রাণবন্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এ সবের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে আলাদা একটি বই লিখিতে হয়। শুধু সাহিত্যই নয়, যাত্রা ও থিয়েটারও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সে যুগে। মুকুন্দ দাস, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ,

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশের মনকে স্বাধীনতার দিকে উন্মুখ করিয়াছেন। এই সব উদ্দীপনী প্রেরণার জোরেই বাঙালী জাতি অগ্নিযুগের অগ্নি-পরীক্ষায় এবং তাহার পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে জীবনকে তুচ্ছ করিয়া যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহা পৌরাণিক দধীচি মুনির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সে যুগের শত শত দধীচির আত্মোৎসর্গের ফলে অবশেষে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। দেখিতে দেখিতে সে স্বাধীনতার ২৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু আমরা কি পাইলাম? স্বাধীনতার আনন্দ, স্বাধীনতার স্বাচ্ছন্দ্য পাইয়াছি কি? না। এখনও আমাদের জীবন সঙ্কটময়। ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজের—যাহারা সর্বদেশেই সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ—আমাদের দেশে সেই মধ্যবিত্ত সমাজ আজ বড়ই বিপন্ন। তাহাদের অন্নবস্ত্র-শিক্ষা সবই অপ্রতুল। গুণ্ডা এবং মস্তানের দলেরাই সুখে আছে, ভদ্রলোকেরা দিশাহারা। আমাদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতেও ক্রমশ যেন পাশবিকতার ছায়া পড়িতেছে। আমাদের সাহিত্যে গ্রন্থকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে, প্রকাশকের সংখ্যা অনেক, সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা নিত্য বর্ধমান, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের মান কমিয়া যাইতেছে। প্রাচীনকালে সহজিয়াপন্থীদের অধঃপতনের যুগে যেমন ঘোমটা-দেওয়া কামশাস্ত্র সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, বর্তমান যুগেও তাহার আবির্ভাব কোন কোন ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছি। বাস্তব নাম দিয়া অনেক লেখক আজকাল যাহা লিখিতেছেন তাহা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইতেছে না। লালসাকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। এসব সাহিত্য কালোত্তীর্ণ হইবে না, কিন্তু সমসাময়িক কালে ইহার প্রভাব বিষময়। আমাদের দেশে তরুণ বেকারের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, তাহাদের মনে কেবল যৌনবোধ বা হতাশা ছাড়া অন্য কোন মহত্তর চিন্তা এসব সাহিত্য জাগাইতে পারিতেছে না। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত—মহৎ সাহিত্যের ইহাই মূল বাণী। অধঃপতিতকে হাত ধরিয়া তুলিতে হইবে, তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতে হইবে, অন্ধকারের পর আলো আছে, তুমি আগাইয়া চল। অবশ্য ফরমাস দিয়া সুসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি—যখনই

দেশে অন্ধকার ঘনাইয়াছে তখনই বাঙালীর বিদ্রোহী মনোভাব সত্যের মশাল জ্বালিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে আত্মপ্রকাশ দেখিয়াছি মাৎস্যন্যায়ের যুগে, সে আত্মপ্রকাশ দেখিয়াছি মুসলমান আমলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে, সে আত্মপ্রকাশ দেখিলাম ইংরেজদের আমলে শহীদদের আত্মোৎসর্গে। বাঙালী অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার বেশীদিন সহ্য করে না। ইহার প্রতিবাদ একদিন আসিবেই। সাহিত্যিকদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা দেশবাসীকে মনুষ্যত্বের দিকে উদ্বুদ্ধ করুন। আমাদের ঐতিহ্যের হর্ম্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহাকে রক্ষা করুন। বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেক প্রতিভাধর শক্তিশালী লেখক আছেন। তাঁহারা জনপ্রিয় আপাতমনোরোচক সাহিত্য সৃষ্টি না করিয়া মহৎ শাশ্বত সাহিত্য সৃষ্টি করুন—দেশকে জাগাইয়া তুলুন। বাঙালীর মহিমা আবার প্রতিষ্ঠিত হোক।*

শিক্ষার তত্ত্ব

পৃথিবীতে এক মানুষ ছাড়া আর কোনও প্রাণী স্কুল কলেজে গিয়ে শিক্ষালাভ করে না। কিছু আরণ্যক মানুষ এখনও আছে যাহাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। একমাত্র সভ্য মানবই 'শিক্ষিত' হইতে চায়। এই শিক্ষার মূল তত্ত্বটা কি? নিতান্ত আধিভৌতিক কারণেই মানুষ প্রথমে শিক্ষার পথে পা বাড়াইয়াছিল। প্রকৃতির পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই একদল বিদ্রোহী মানুষ অস্বাভাবিক উপায়ে নিজেদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই প্রাচীন প্রয়াসের আধুনিকতম প্রকাশ বর্তমান যন্ত্রসভ্যতা। প্রকৃতির পীড়ন হইতে আমরা কতকটা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছি বটে কিন্তু কিছুদিন পরেই আমরা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছি যে আমাদের আসল

শক্র বাহিরে নাই, আছে আমাদের ভিতরে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—আমাদের স্বাধীনতার সন্ধানে, আমাদের মুক্তির পথে প্রধান বাধা। ভারতবর্ষের ঋষিগণ এইগুলিকে ষড়রিপু নাম দিয়াছেন। সুতরাং ষড়রিপুকে দমন করিতে না পারিলে শিক্ষার পূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায় না। শিক্ষার স্বাদ মানে স্বাধীনতার স্বাদ, মুক্তির স্বাদ, ভূমার স্বাদ। এই ষড়রিপুকে দমন করিতে পারে নাই বলিয়া আজ পৃথিবীর বড় বড় ঐশ্বর্যশালী রাষ্ট্রও সুখী হইতে পারে নাই। প্রকৃত শিক্ষা লাভ না করিলে সুখ পাওয়া অসম্ভব। শিক্ষার এইটিই মূলতত্ত্ব।

সাহিত্যের প্রকাশ

সাহিত্য একটা বিরাট ব্যাপার। মানব-মনীষার সমস্ত আলোকই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাস বিজ্ঞান ভ্রমণকাহিনী সমাজতত্ত্ব রাজনীতি—এ সমস্তই আজ সাহিত্যের এলাকায়। বস্তুত যা-কিছু লেখা হয়, এবং ছাপা হয় তাই নাকি সাহিত্য। আমি এই প্রবন্ধে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের, বিশেষ করে কবিতার, প্রকাশ সম্বন্ধেই কিছু বলব।

সাহিত্যকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রথম—সংবাদ-ধর্মী, দ্বিতীয়—সৃষ্টিধর্মী। আমার এই আলোচনা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের প্রকাশ নিয়ে। যা আলোকিত, যা দ্যুতিমান তার নামও প্রকাশ। কবি বা শিল্পীর প্রতিভাই এই প্রকাশের উৎস। Ovid বলেছেন, "there is a deity within us who breathes the divine fire by which we are animated."[১] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়···মানুষ আপন সৃষ্টকার্যে আপন পূর্ণতাকে দেখতে চাচ্ছে···তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোক, লক্ষপতির কোষাগার নয়, পৃথ্বীপতির জয়স্তম্ভ নয়।"[২]

---

১. Dictionary of Thoughts

২. সাহিত্যের পথে, 'সৃষ্টি'

কথাটা যত সহজে বলা হয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়। সৃষ্টি করব বলে বললেই সৃষ্টি করা যায় না। Divine fire বা আত্মার প্রেরণা হুকুম করলেই এসে হাজির হয় না। তার জন্যে অনেক প্রস্তুতি, অনেক সাধনা, অনেক আরাধনার দরকার। কলম হাতে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও সেই প্রেরণা আসে না যা কবির মনে সৃষ্টির উৎসব জাগাবে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে এই আকুতি প্রকাশ পেয়েছে—

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয় নি সে গান গাওয়া—
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া…
শুধু আসন পাতা হল আমার
সারাটি দিন ধরে—
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকব কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয় নি আমার পাওয়া।

কবির মনের মধ্যেই সৃষ্টির সব উপাদান রয়েছে—আলো, অন্ধকার, সুর, রং, ভাষা, ছন্দ সবই রয়েছে—কিন্তু কখন কোন বিশেষ যোগাযোগে সেগুলি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠবে, অনন্ত অপরূপ অনবদ্য হয়ে উঠবে তা কবিও জানেন না। কিন্তু তা জানবার জন্যে তাঁর অহোরাত্র ব্যাকুলতা, তা আবিষ্কার করবার জন্যেই তিনি পাগল, তাকে রূপ দেবার জন্য তিনি যে কোনও পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। বস্তুত যাঁরা প্রতিভাবান কবি তাঁরা এই নিদারুণ শ্রম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে করেই চলেছেন। তাই Longfellow বলেছেন, "Genius is infinite painstaking।" Owen Meredith আর একটু অন্য সুরে বলেছেন, "Genius does what it must and talent what it can।" প্রতিভাবান কবিকে সৃষ্টি করতেই হবে, না করে তার উপায় নেই, স্বস্তি নেই, বিশ্রাম নেই। তিনি

সবার অলক্ষ্যে প্রতীক্ষা করেন প্রেরণার—যে প্রেরণার বলে মনের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ঐশ্বর্যসম্ভারকে সৃষ্টির মহিমায় মহিমান্বিত করতে পারবেন। Talent গুছিয়ে-গাছিয়ে একটা চলনসইগোছ জিনিস খাড়া করতে পারেন—কিন্তু তা সৃষ্টি হয় না। তা P. W. D.-র তৈরি বাড়ির মতো একটা বাড়ি হতে পারে—হয়তো ভালো বাড়িই হতে পারে—কিন্তু তা কখনও তাজমহল হয় না। এই তাজমহল বানানোই প্রতিভাবান শিল্পীর লক্ষ্য, তাঁর সৃষ্টি হল অনন্য। মনে হয়তো একটা ভাব এল, কিন্তু ঠিক তাকে কোন্ ছন্দে কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবেন এ-ও কবির কাছে মস্ত সমস্যা। মনোমত বাক্যটি, মনোমত বিশেষণটি, মনোমত অলংকার ও বক্রোক্তির সমন্বয়টি ঠিক সময় মনে আসে না। অনেক সময় তার জন্যে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয়, অনেক সময় লিখে আবার কেটে দিতে হয়, অনেক সময় ছাপতে পাঠিয়েও প্রুফে আবার সব বদলে দিতে হয়। বড়ো বড়ো লেখকের লেখা পাণ্ডুলিপি যদি দেখে থাকেন তা হলে বুঝতে পারবেন, কত খুঁতখুঁতে তাঁদের মন। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখার পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হয় যেন একটা রণাঙ্গন, সুন্দরের অসুন্দরের যেন নীরব একটা যুদ্ধ চলেছে সেখানে। ভাবকে রূপ দেওয়া সত্যিই বড় কঠিন কাজ। কারণ তাকে সাধারণ বেশবাসে সাজিয়ে আটপহুরে পোশাক পরিয়ে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে কোনো প্রথমশ্রেণীর কবিই রাজি নন—সে প্রকাশে যদি অভিনবত্ব না থাকে, যদি মৌলিকতার দীপ্তি তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বিচ্ছুরিত না হয় তা হলে তাঁর মনে হয় কিছুই হল না। কেবলমাত্র ভাবই কাব্যের অনন্যতা হতে পারে না, বস্তুত কোনো ভাবই অনন্যতা দাবি করতে পারে না, সব ভাবই তো পুরাতন। তার প্রকাশের বৈশিষ্ট্যই তার আসল বৈশিষ্ট্য, রস-সৃষ্টিতেই তার প্রধান পরিচয়। বামন দণ্ডী প্রভৃতি আলংকারিকরা বলবার রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কুণ্ডল মম্মটভট্ট প্রাধান্য দিয়েছেন বক্রোক্তিকে, রুদ্রত ও ভামহ অলংকারকে, আনন্দবর্ধন ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন।[৩] কবির আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করেছেন

৩. ভাব ও প্রকাশভঙ্গী : সাহিত্য প্রসঙ্গ : কবিশেখর কালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথ এই কটি ছত্রে—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।

এই আকাঙ্ক্ষাই বস্তুত সব কবিরই আকাঙ্ক্ষা। নানা কবি নানা উপায়ে এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের আকুতি নিজের স্বকীয়তা নিয়ে যখন ছন্দবন্ধনে বাঁধা পড়ে তখন আমরা অনুভব করি বিষয়টা যদিও এক কিন্তু প্রকাশভঙ্গী আলাদা আলাদা এবং সেই জন্যেই প্রত্যেকটা আলাদা রকম সৃষ্টি। সবাই ফুল, কিন্তু কেউ পদ্ম, কেউ গোলাপ, কেউ চন্দ্রমল্লিকা, কেউ নাগকেশর। উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়ে আমরা জেনেছি ফুল ফোটাবার জন্যে ফুলগাছকে কোনও সক্রিয় চেষ্টা করতে হয় না, সময় হলে ফুল আপনিই ফোটে। ফুলেরা যন্ত্রচালিতবৎ ফুল ফুটিয়ে চলেছে চিরকাল, তাদের মধ্যে প্রতিভার কোনো লক্ষণ নেই, সবাই একরকম। গোলাপগাছ গোলাপই ফোটাবে চিরকাল, গোলাপগাছে নাগকেশরের আবির্ভাব আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু মানুষ-কবির কাছে এই অপ্রত্যাশিতকেই আমরা প্রত্যাশা করি। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি যা খুশী সৃষ্টি করতে পারেন। বাংলা সাহিত্যের তিন জন প্রথমশ্রেণীর সৃষ্টিকর্তার—মাইকেল মধুসূদন দত্তের, বঙ্কিমচন্দ্রের এবং রবীন্দ্রনাথের—সৃষ্টির আলোচনা করলে তাঁদের সৃষ্টির বৈচিত্র্যই আমাদের বিস্মিত করে। যে মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছেন, তিনিই আবার লিখেছেন ব্রজাঙ্গনা কাব্য, তাঁরই কল্পনা আবার সৃষ্টি করছে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর, বিবিধ প্রবন্ধ, মুচিরাম, বিজ্ঞানরহস্য, লোকরহস্য, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি যে একই লোকের রচনা এর অকাট্য প্রমাণ না থাকলে বিশ্বাস করা শক্ত হত। আর রবীন্দ্রনাথের কথা বলাই বাহুল্য, তিনি কী-না লিখেছেন, তাঁর বিরাট সাহিত্যকীর্তির সৌধে কত বিভিন্ন রঙের মণিমাণিক্য যে তিনি গেঁথে দিয়েছেন, কত রং, কত রূপ, কত ঐশ্বর্যের যে

অনন্য সমাবেশ করেছেন তার প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হয় নি। যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের সৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ। একই স্রষ্টার নানা রচনার স্টাইলও নানারকম। অনেকে মনে করেন 'স্টাইল' লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাবান লেখকরা বহু-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কারণ তাঁদের বিভিন্ন লেখার বিভিন্ন রকম স্টাইল। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি—

হে নূতন, এস তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোর স্তূপে।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্-দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল।

এই নূতনকেই আবার তিনি ভিন্ন ছন্দে ভিন্ন সুরে ভিন্ন স্টাইলে আহ্বান করেছেন—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

এই নূতনকেই সূর্যের জবানীতে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছেন খুব ছোটো একটি কবিতাতে। সেখানে তাঁর স্টাইল ও সুর অন্যরকম—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।

ধিক্-ধিক্ করে তারে কাননে সবাই ;
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছ ভাই ?।

প্রতিভাবান লেখকদের এই বহু-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখে আমরা চমৎকৃত হই, কিন্তু একটা কথা ভাবি না, এই বহু-ব্যক্তিত্বের বিরাট বোঝা বহন করতে তাঁদের কি পরিমাণে ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছে। একটা ব্যক্তিত্বের ভার বহন করেই সাধারণ মানুষ কুব্জ হয়ে পড়েন, সেই ব্যক্তিত্বকে পোষণ-পালন করবার রসদ সংগ্রহ করতেই তাঁকে হিমসিম খেতে হয়। প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাবান সাহিত্যিকদেরও হিমসিম খেতে হয়, কিন্তু বাইরে তার সার্থক প্রকাশ হয় বহুবর্ণবিচিত্র সাহিত্য-সম্ভারে। তাঁর বহু-ব্যক্তিত্বের রসদ তিনি নিজেই সংগ্রহ করেন তাঁর রহস্যময় অন্তর-ভাণ্ডার থেকে, যার নাম আমরা দিয়েছি প্রতিভা। এই বহু-ব্যক্তিত্বের চাপে অনেক কবির বাইরের সামাজিক চেহারা অবশ্য অনেক সময় স্বাভাবিক থাকে না। কেউ খামখেয়ালী, কেউ রাগী, কেউ নির্জনতা-প্রিয়, কেউ অতি-দাম্ভিক, কেউ বা অতি-বিনয়ী হন। তাঁর বহু-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাধারণ সমাজের যেন খাপ খায় না। অনেকে পাগল হয়ে পাগলা-গারদে জীবন কাটিয়েছেন এ খবরও শোনা যায়।

এই বহু-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কবিরা সাদা কাগজের উপর কালির আঁচড় দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে যখন প্রকাশ করেন তখন সেটাকে জননীর সন্তান-প্রসবের সঙ্গে উপমিত করা যায় কি—এই প্রশ্ন অনেকে করেন। এর উত্তর হচ্ছে, যায় এবং যায়ও না। জীবজগতের সমস্ত ব্যাপারই অমোঘ অলজ্ঘ্য নিয়তি-চালিত। জননী নিজ দেহেই সন্তান ধারণ করেন, তাঁর দেহের উপাদান দিয়েই সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয়, কিন্তু সে সন্তান নির্মাণে তাঁর নিজের কোনও হাত থাকে না। তা সুন্দর, কুৎসিত, অঙ্গহীন, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক জননী তাকেই মেনে নেবেন, তুলে নেবেন বুকে। কবির কাব্যও জন্মগ্রহণ করে কবির মনে। কিন্তু সে মন বাইরের মন নয়—অন্তরের অন্তর্লোকে, আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় নির্জ্ঞান মনে। সেই নির্জ্ঞান মনে সজ্ঞান মনোভূমিতে যখন সে কাব্যটিকে প্রকাশ

করে তখনি কবির মনে জাগে প্রসব-বেদনা, তখনই তিনি সেটাকে লিখে প্রকাশ করতে ব্যগ্র হন। তা তখন ভাষার মাধ্যমে মূর্তি পরিগ্রহ করে কবির খাতার পাতায়। জননী তাঁর সন্তানের রূপ-বৈগুণ্যকে সংশোধন করতে পারেন না, যা পেয়েছেন মেনে নেন। কবি কিন্তু তা নেন না। তিনি তাকে বার বার ঘষে-মেজে অদলবদল করে নিজের মনোমত করে রসোত্তীর্ণ করতে চান। রসের যে আবছায়া তাঁর মনে অস্পষ্ট ভাবে প্রথমে প্রতিভাত হয়, সেটাকে স্পষ্টরূপ দেবার জন্যে তিনি সর্বদা সচেষ্ট। তাঁর সমস্ত শক্তিকে তিনি বারবার বলেন—ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না, আর-একটু আলো জ্বালো। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা—

জলের পারে ঝাউএর সারি জ্যোৎস্নালোকে দেখায় কালো
অনেক দূরে পাহাড়-চূড়ে রাতের কাজল হয় ঘোরালো।
আবছায়া সে বেড়ায় ঘুরে ডাক দিয়ে যায় চেনা সুরে
মুখের রেখা যায় না দেখা—চলার সাথী বাতি জ্বালো।

সব কবিই এই আবছায়ার মায়াকেই সার্থক রসোত্তীর্ণ কাব্য করেন প্রতিভা-আলোর সাহায্যে। অর্থাৎ তিনি শুধু সৃজন করেন না, নিজের সৃজনকে বারবার সংশোধনও করেন। জননীর সে ক্ষমতা নেই! তিনি যা সৃজন করেন তাকেই মেনে নেন, ছোট চোখকে পদ্মপলাশলোচন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

কাবর এই সৃজনী-শক্তির সঙ্গে সংশোধনী-শক্তি মিলিত হয়ে কাব্যসৃষ্টি করে। বিভিন্ন কবির এই শক্তি বিভিন্ন—তাই কাব্যেরও বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই আমরা বিভিন্ন কবির লেখায়। কাব্যের রূপ যে কি মন্ত্রবলে কবির মানস-নয়নে উদ্ভাসিত হয় তার রহস্য কেউ জানে না, এমন কি কবি নিজেও জানেন না বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ আমাকে একবার বলেছিলেন—'ওসব উনপঞ্চাশ বায়ুর লীলা'। এই উনপঞ্চাশ বায়ুর লীলা নানা কবির মনে নানারকম ছবি আঁকে। এক সমুদ্রের বিষয়েই কয়েকটি কবির কবিতা উদ্ধৃত করছি, তার থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।—

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন। তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি। তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন করো আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।—

করুণানিধান লিখেছেন ঃ

ভো মহার্ণব, নীল ভৈরব
গর্জদ্-জল-ভঙ্গে
দূর অম্বুদ মন্দ্র-সমান
তুলিতেছ কার বন্দনাগান
নক্তন্দিব উদ্বোধনের
দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।
নীলকণ্ঠের বিরাট পিনাক
টঙ্কারে অহোরাত্র
আজো কি ভোলনি মন্থনরোল
.দেব-দানবের উন্মাদ রোল
ইন্দিরা আজি উঠিবেন বুঝি
কক্ষে অমৃত পাত্র।...
হে দুর্নিবার, মুক্ত-উদার
হে পূর্ণ অফুরন্ত
চেয়ে চেয়ে ওই বিপুল উরসে

অসীমের ভাষা অন্তরে পশে
হেরি নেপথ্যে অন্তবিহীন কল্পলোকের পন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

সিন্ধু তুমি, মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অতি ;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে 'বিরাট রূপা-সরস্বতী'।
আর্য তুমি বীর্যে বিভু, ঝঞ্ঝা তব উত্তরীয় ;
মন্দ্রভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়!
সিন্ধু তুমি প্রবাল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-উষা!
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ো ;
উপপ্লবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।
তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্যুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নর্মসখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো।
লাস্যগতি, হাস্যরতি সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখ ও হতাশার কবি। তিনি লিখেছেন ঃ

চলে বিষপান চলে বিষদান চলে চির-মন্থন
অনন্ত নাগ বন্ধনে ঘোরে অনন্ত ক্রন্দন
দেবতার সুধা দেবতা হরিয়া অদৃশ্য কোন্‌খানে
বিশ্বনাথের কণ্ঠে বিশ্ব নীল হল বিষ-পানে।
তবু মন্থন চলে মন্থন অবারিত অকারণ
জীব সাথে শিব বিষ-নির্জীব, কেবা করে নিবারণ ?
তাই নিরুপায় চির হায় হায়, হে সিন্ধু তব জলে
অমৃত-প্রয়াসে যত ওঠে বিষ তত মন্থন চলে।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের সমুদ্র বিষয়ে যে কবিতাটি পড়েছি—তার সুর একটু ভিন্ন রকম। কবির স্নেহপ্রবণ মন যেন ধরা দিয়েছে কবিতাটিতে। সিন্ধুর কাছে বিদায় নিতে গিয়েও যেন তাকে ছেড়ে যেতে পারছেন না—

বিদায় সিন্ধু; আসি,
প্রবাস-বন্ধু, নীল ছন্দের নীলানন্দের রাশি,
ফুরালো জীবনে নয়নোৎসব লহরী-পুঞ্জ গোনা
সন্ধ্যা-প্রভাতে তোমার নান্দী বন্দনা-গান শোনা
ঊর্মি-কেশর ছুঁয়ে ভয়ে ভয়ে ফুরাইল ছেলে-খেলা
ফুরালো বালুকামন্দির গড়া আনমনে সারাবেলা।
হেরিব না আর কণা-সহস্রে নিশীথে মণির দ্যুতি
মহানীলিমায় ইন্দ্রিয়াতীত লভিব না অনুভূতি।
ছেড়ে যেতে তাই পিছু পানে চাই, আর একবার হেরি
আগাতে পারি না, পদে পদে বাধা দেয় বালুকার বেড়ি।
বালু-স্তূপ হতে গুল্‌ফ ধরিয়া প্রীতির ফল্গু টানে
বল্লিত হয় যাত্রা আমার চাহিলে তোমার পানে···

ফিরে যেতে হবে দৃষ্টি যেথায় যখন যেদিকে ধায়
প্রাচীরে ব্যাহত হইয়া জানায় ব্যাঘাতের বেদনায়—
ঠাঁই নাই মোর, হে বিরাট, তব লোকাতীত পরিষদে
তোমারে ছাড়িয়া ফিরে যেতে হবে জনপদে-গোষ্পদে।

সমুদ্র-বিষয়ে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিতা লিখেছেন। যাঁর কবিতায় স্বকীয়তা আছে, যাঁর কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, যিনি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছেন তিনিই সাহিত্য-প্রকাশের বিচিত্র ক্ষেত্রে নিজের দাগ রেখে গেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের একটি কবিতাও মনে পড়ছে। তাঁর 'এষা' কাব্যের 'শোক' কবিতাটি অপূর্ব। এখানে শোকার্ত কবি সমুদ্রের সমীপবর্তী হয়ে যেন তার মধ্যেই নিজের শোক-বিক্ষুব্ধ অন্তরের আলোড়ন প্রত্যক্ষ করছেন।

উচ্ছ্বসিয়া—উল্লঙ্ঘিয়া,
সহস্র তরঙ্গ নিয়া,
সহস্র বাসুকি-ফণা ঘর্ঘর-নির্ঘোষে—

বক্ত্রে ফেন রাশি রাশি,
কি বিকট অট্টহাসি!
ধরারে ফেলিবে গ্রাসি' আহত সংরোষে!
এইখানে ধরা শেষ—
ধরার সংঘর্ষ-ক্লেশ,
জীবনে মরণে সন্ধি—লুপ্ত আত্ম-পর!
কম্পিত ভঙ্গুর তট;
মহাকাশ সন্নিকট,
সাগরে জলদ-বিম্ব—জলদে সাগর!
এই চির হাহা-রবে—
যেন আমি একা ভবে
হেরি মূল-প্রকৃতির হৃদয়-স্পন্দন!
পলকে পলকে হয়
কত-না উত্থান লয়—
কত অনির্দেশ আশা, অস্ফুট স্বপন!

রবীন্দ্রনাথের মতো অক্ষয়কুমারও বিহারীলালের শিষ্য ছিলেন। "বিহারীলালের ভাষা, ভঙ্গী ও ভাব অক্ষয়কুমারেই সর্বাধিক পরিণতি লাভ করেছিল।"[৪]

কবি-মনের এই প্রকাশের নেপথ্যে যে রহস্যাবৃত অন্ধকার আছে—ঊষার প্রকাশের পূর্বে রাত্রির অন্ধকারের মতো—সেই অন্ধকারের কাহিনী জানবার উপায় নেই। সেই অন্ধকারেই অমূর্তরা মূর্তি পরিগ্রহ করে প্রস্ফুট হয় অস্ফুটরা, সেই অন্ধকারেই ধ্বনিত হয় আলোর চরণধ্বনি, সেই অন্ধকার সৃষ্টিলোকের সৃষ্টির লীলা ধীরে ধীরে সুগোপনে লীলায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই অন্ধকার-লোকের খবর আমরা জানি না। কিন্তু একটা কথা জানি সেই অন্ধকার অস্পষ্ট-লোকে কবির কল্পনার প্রেরণা আনন্দ, সে কল্পনার লক্ষ্যও আনন্দ। বস্তুত সৃষ্টির আনন্দ না থাকলে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় আর সে আনন্দ যদি রসিকের মনে সঞ্চারিত হয়ে তাঁকেও

৪. অক্ষয়কুমার বড়ালের গ্রন্থাবলীর সম্পাদকীয় ভূমিকা—সজনীকান্ত দাস

আনন্দ-বিহ্বল না করতে পারে তা হলেও সে সৃষ্টি সাহিত্যের শাশ্বত মন্দিরে স্থান পায় না। নিজে আনন্দিত হয়ে রসিককে আনন্দ-লোকে নিয়ে যাওয়াই কবির কাজ। এ কাজ করতে হলে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি, দুঃখ-বঞ্চনা, অপমান-অবহেলা, লাঞ্ছনা-ধিক্কারের ঝড়-ঝাপটা বাঁচিয়ে কবিকে এমন একটা লোকে উত্তীর্ণ হতে হয় যেখানে তিনি সামাজিক-সুখদুঃখের-দোলায় আন্দোলিত মানুষ নন, যেখানে তিনি কবি। তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ছোঁয়া লাগতে দেন না তিনি তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁর সৃষ্টিতে থাকে কেবল প্রতিভার ভাস্বর দ্যুতিতে উদ্ভাসিত তাঁর আনন্দময় অনন্যতা। তাঁর কাব্যে তাঁর ব্যক্তি-সত্তাকে চেনা যায় না। চেনা যায় তাঁর কবি-সত্তাকে। শেক্‌সপীয়র ম্যাকবেথ না হ্যাম্‌লেট্‌, ইয়াগো না ফল্‌স্টাফ্‌, ব্রুটাস না আন্টোনিও, ক্লিওপেট্রা না পোর্শিয়া—কার মতো ছিলেন তা তাঁর কাব্য থেকে সনাক্ত করা যায় না—শুধু বোঝা যায় তিনি প্রথমশ্রেণীর কবি, প্রথমশ্রেণীর শিল্পী, তাঁকে আমরা ভুলে যাই, কেবল মনে থাকে তাঁর কাব্যের প্রতিটি চিত্র অনবদ্য, অনন্য, অপরূপ। সেই ছবির ভীড়ে মানুষ শেক্‌সপীয়রই আত্মগোপন করে আছেন কিন্তু তিনি নিজের সুখদুঃখ হতাশা-বিলাপ নিয়ে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন নি একবারও। তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন শুধু অমৃত, শুধু আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি'তে 'কাব্য' নামে একটি কবিতায় এই কথা চমৎকার ভাবে লিখেছেন তিনি—

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত,
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরই মতো,
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভাষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল

ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্যপানে ; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ-দৈন্য-দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

শাশ্বত সাহিত্যের প্রকাশে ওই অমৃতই রসিকদের তৃপ্ত করে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অনেক শোকদুঃখ এসেছে, অনেক অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে আমাদের দেশের লোকেরই হাতে—যদি তারিখ মিলিয়ে মিলিয়ে কেউ একটা প্রবন্ধ লেখেন তা হলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক জীবনে যখন তুমুল ঝঞ্ঝা বইছে, তখন তিনি অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। সে কাব্যে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের আক্ষেপ-হাহাকার ছায়াপাত করে নি, তাতে মূর্ত হয়েছিল আনন্দ আর অমৃত।

আজকাল কবির ব্যক্তি-সত্তা এবং সামাজিক-সত্তা নিয়ে একটু বেশি আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এরকম অজস্র আলোচনা হয়েছে। এ ধরনের আলোচনার একটা আলাদা রস আছে, সেটা হচ্ছে কৌতূহলের রস। সে রসের সঙ্গে কাব্যের কোনো সম্পর্ক নেই, রবীন্দ্রনাথ মংপুতে শিলাইদহে লণ্ডনে বা আমেরিকায় যেখানেই গিয়ে থাকুন, যে যে বিশেষ খাবার তিনি পছন্দ করতেন বা যে ধরনের কাপড়জামা পরতে ভালবাসতেন—এ সবের ফর্দ যতই হৃদয়গ্রাহী হোক—তাঁর কাব্যের সঙ্গে এ সবের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং আমার মনে হয় ও ধরনের আলোচনার বাড়াবাড়ি হলে আসল রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমি এমন লোক দেখেছি যিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ধরনের খুঁটিনাটি অনেক খবর রাখেন, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বড়ই সংকীর্ণ। কালিদাস ভবভূতি চণ্ডীদাস বা শেক্সপীয়র সম্বন্ধে এ ধরনের খবর পাওয়ার উপায় নেই, তাই তাঁদের পরিচয় পেতে হলে আমরা তাদের কাব্যলোকেই প্রবেশ করি এবং সেইখানেই সম্ভবত তাঁদের সত্য পরিচয় পাই। সাহিত্যিকের পরিচয়

যদি তাঁর সাহিত্য-পরিচয়কে ঢেকে ফেলে তা হলে সেটা নিঃসন্দেহেই দুঃখের বিষয়। আজকাল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে। সাহিত্যের প্রকাশ একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কিন্তু সাহিত্যিকের পরিচয় নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক জিনিস। আর অধিকাংশ মানুষের মনই বৈষয়িক। সাধারণ লোকের কাছে যিনি দামী হীরের আংটি গরদের কাপড় পরে দামী মোটরে চড়ে বেড়ান তাঁর কদর যিনি ভালো কবিতা লেখেন তাঁর চেয়ে অনেক বেশি। এই দু রকম অভিব্যক্তি যদি একই লোকের হয় তবু সাধারণ লোকের দৃষ্টি কবিতার চেয়ে হীরের আংটি, গরদের কাপড় আর দামী মোটরের উপর পড়বে বেশি। সাধারণ লোকেরা সাহিত্যের প্রকাশ সম্বন্ধেও এই রকম আরও নানা রকম বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা করতে ভালোবাসেন। সাহিত্যিকেরা কে কি রকম বেগে লেখেন এ নিয়েও অনেকের কৌতূহল আছে। অনেকেই হয়তো জানেন না যে কাব্য যখন কাগজে আত্মপ্রকাশ করে তার বহুপূর্বেই তার জন্ম হয় কবির মনের আকাশে নীহারিকার মতো, সেই নীহারিকা কখনও হয়তো অতি দ্রুতবেগে সৃষ্টিমহিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, কখনও হয়তো অনেক দেরি হয়, কখনও হয়তো ওঠেই না, অস্পষ্ট নীহারিকার মতোই থেকে যায় চিরকাল। কিন্তু তবু সাধারণ লোকেরা জানতে চায় কোন্ কবির সাহিত্য-প্রকাশের বেগ কত দ্রুত। আজকাল স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের যুগ, এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখবেন কেউ হয়তো গ্রাফ এঁকে। সেদিন Charles Chaplin-এর আত্মজীবনীতে এই রকম একটি ফর্দ দেখে কৌতুক অনুভব করেছিলাম। Charles Chaplin সিনেমা জগতের একজন দিক্‌পাল, যদিও তিনি শিল্পী হিসাবে খুব উঁচুদরের, কিন্তু তিনি যে-শিল্পের কারবারী সে-শিল্পে art-এর চেয়ে box-office-টারই সম্মান বেশি। তাই তাঁর মনটাও সম্ভবত একটু বৈষয়িকগোছের। তিনি লিখেছেন—"I like to know the way the writers work and how much they turn out a day. Thomas Mann averaged about 400 words a day. Lion Fechtwagener dictated 2000 words which averaged 600 written words a day. Somerset Maugham wrote 400 words a day just to keep

in practice. H. G. Wells averaged 1000 words a day. Hannen Swaffer, the English journalist, wrote from 4000 to 5000 words a day. The American critic, Alexander Woollcott wrote a 700-word review in fifteen minutes. then joined a poker game—I was there when he did it. Hearst would write 2000-word editorial in an evening. Georges Simenon has written a short novel in a month and of excellent literary .quality. Georges tells me that he gets up at five in the morning, brews his own coffee, then sits at his desk, and rolls a golden ball, the size of a tennis ball and thinks. He writes with a pen and when I asked him why he wrote in such small handwriting, he said—'It requires less effort of the wrist'. As for myself I dictate about 1000 words a day which averages me about 300 in finished dialogue for my films."

এই ধরনের আরও নানারকম খবর পাওয়া যায়। কোনো কবি নির্জন ঘরে বসে লেখেন, ভীড়ে বসেও কারও লেখা অপ্রতিহত বেগে চলতে থাকে, লিখতে লিখতে কে কটা সিগারেট খান বা কতবার নস্যি নেন, রেডিওতে বা গ্রামোফোনে Jazz বা বীটোফেন বাজালে কার কল্পনা উদ্বুদ্ধ হয়, ভালো ফুলের গন্ধ, বা পচা আপেলের গন্ধ কার সাহিত্য-প্রেরণার পক্ষে অত্যাবশ্যক—এ ধরনের নানা খবর পড়েছি। কোন্ কবির কোন্ কাব্য কোন নারীর দ্বারা প্রভাবিত এ রকম মুখরোচক আলোচনাও করেছেন অনেক তথাকথিত লেখক—এঁরা পূর্বজন্মে হয়তো চণ্ডীমণ্ডপ-বিহারী নিম্নকণ্ঠ ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপকারী জমাটি লোক ছিলেন—এ জন্মে লেখক-বৃত্তি গ্রহণ করে নিজের কুৎসা করবার প্রকৃতিটাকে সাহিত্যের আবরণে ঢেকে সাহিত্যসমাজে আস্ফালন করবার সুযোগ পেয়েছেন।

একটা কথা কিন্তু নিঃসংশয়ে জেনে রাখা উচিত সাহিত্য-প্রকাশের অন্তরতম রহস্য বাইরের থেকে জানা অসম্ভব। কবির জীবনচরিত্রের

ঘটনাবলী থেকে কবিকে বোঝা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন তাঁর 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে—

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে—
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।···
নাহি জানি আমি কী পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি—
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে।
যে আমি স্বপনমূরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি—
সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে!
মানুষ-আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

হতে পারে—হতে পারে কেন, নিশ্চয়ই—বাইরের ঘটনাবলীর সংঘাত কবির মনে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা জাগায়, কিন্তু যে সৃষ্টি তিনি করেন তার সঙ্গে ওই সংঘাতের কোনও মিল থাকবেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

'একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি—তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী'—কিন্তু যে ফাল্গুনী কবি রচনা করেন তার সঙ্গে ওই ছোঁওয়ার বা কথার কোনও সাদৃশ্য এমন কি প্রভাবও হয়তো থাকে না শেষ পর্যন্ত। রসায়নশাস্ত্রে catalytic agent বলে একটা পদার্থ আছে, তার

সামান্যতম ছোঁওয়ায় বড় বড় রাসায়নিক কাণ্ড ঘটে যায়। যে কাণ্ডটা ঘটে তার সঙ্গে কিন্তু ওই catalytic agent-এর কোনও সাদৃশ্য থাকে না। Catalytic agent ঘটনাটা কেবল শুরু করে দেয়, কিন্তু ফলে যা হয় তা একেবারে অন্যরকম। কবির মন এই রকম নানা সুর, নানা ছোঁওয়া, নানা চাহনি দিয়ে যে কাব্য সৃষ্টি করেন তা সৃষ্টি, তা কোনও বিশেষ ছোঁওয়া বা চাহনির ফোটোগ্রাফ নয়। তা ছাড়া কবি যখন লেখায় আত্মপ্রকাশ করেন তখন সেটা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে ঢেকে প্রকাশ করেন—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার আবির্ভাবের মতো অনেকটা তা। কবি ইচ্ছে করলেও অনাকৃতভাবে নিজেকে তাঁর কাব্যে প্রকাশ করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন[৫] —"যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিক বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না এবং যেটুকু তাদের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না—তখন মনের ভাবগুলি সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকেই যায়। এর থেকে বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই···আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই; আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি না—চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত···"।

এই সাধ্যাতীত কাজই সব কবিরা সারাজীবন করবার চেষ্টা করেছেন, এরই নাম সাধনা, এরই নাম তপস্যা। এই তপস্যার উপকরণ কবিরা শুধু বহির্জগৎ থেকেই সংগ্রহ করেন না অন্তর্জগৎও তাঁদের কাব্য-প্রেরণার অনেক উপকরণ জোগায়। কবিদের কাব্যে যাঁরা কবিদের

৫. ছিন্নপত্র

ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ সন্ধান করবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হন তাঁরা সেই দলের লোক যাঁরা ফুলের মধ্যে মাটির এবং ফলের মধ্যে পরাগবাহী কীটের নৈপুণ্য আবিষ্কার করে আমোদ পান। এও একরকম আমোদ, কিন্তু কাব্যের আমোদ নয়। লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের জীবনচরিতে। বিশেষ করে আত্মজীবনচরিতে। বিদেশী লেখকরা 'জার্নাল' বলে যা লেখেন তাতেও তাঁদের ব্যক্তিজীবনের অনেক খুঁটিনাটি পরিচয় মেলে। সবচেয়ে প্রচণ্ড আত্মজীবনী হচ্ছে—'রুশো'র 'The Confessions' যার গোড়াতেই তিনি বলেছেন—"My purpose is to display to my kind a portrait in every way true to nature and the man I shall portray will be myself... ।" তা তিনি নিরঙ্কুশভাবেই করেছেন। আর একটি প্রকাণ্ড আত্মজীবনী হচ্ছে বস্‌ওয়েলের লেখা ডক্টর জন্‌সনের জীবনী। আরও অনেক লেখক (এদেশের এবং বিদেশের) আত্মজীবনী লিখেছেন—Goethe, Harzen, Tolstoy, Mill, Ruskin, Trollope, Moon, Bunnin, Gide[৬] এবং আরও অনেকে এ কাজ করেছেন। অনেকের জীবনীতে কাব্যরসও আছে, তাও সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে আমেরিকার থিয়েটার জগতের নামকরা নাট্যকার Moss Hart 'The Man who came to Dinner' লিখে ওদেশের নাট্যামোদীদের প্রাণে তুমুল আলোড়ন জাগিয়েছিল। তাঁর Act One নামে একটি আত্মজীবনী আছে। খুব ভাল লেগেছিল বইটি পড়ে। বইটি রসোত্তীর্ণ। একটা নাটক ওদেশের মঞ্চে নাবাতে হলে নূতন নাট্যকারকে যে কি সংশয়-সন্দেহ-যন্ত্রণার দোলায় তুলতে হয়, ওদেশের থিয়েটারের নেপথ্যে কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে এ বইটি পড়লে তার খবর পাওয়া যায়। এতে লেখকের বৈষয়িক জীবনের খুঁটিনাটি খবর তেমন পাওয়া যায় না, কিন্তু লেখকের অন্তর্দ্বন্দ্বের খবর পাওয়া যায় অনেক। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীকে লেখা 'চিঠিপত্রে' মানুষ রবীন্দ্রনাথকে অনেকটা পাই আমরা। কিন্তু তবু আমার মনে হয় সবটা

৬. Introduction to 'The Confessions'

বেন পাই না। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব লাজুক এবং আভিজাত্যপূর্ণ প্রকৃতি তাঁকে 'রুশো'র মতো উলঙ্গ হতে দেয় নি। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে বা অন্য কোথাও যখন নিজের কথা বলেছেন তখন বেশ সামলে-সুমলেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য বিরাট। সেই বিরাটের মধ্যে মানুষ রবীন্দ্রনাথ আছেন, কিন্তু অনেক সময় লুকিয়ে আছেন, বেশি প্রকট হয়ে উঠেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

এইবার সাহিত্যের প্রকাশের আর-একটা দিক সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করব। কবি সাহিত্যকে নিজের খাতায় লিপিবদ্ধ করেই সন্তুষ্ট হন না, তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয় তাঁর সৃষ্ট কাব্যকে রসিক লোকের দরবারে পৌঁছে দিতে। আগে, যখন ছাপাখানা ছিল না, তখন কবিরা নিজেই নিজের লেখা পাঠ করে জনসাধারণকে শোনাতেন। পুরাকালে অধিকাংশ সাহিত্যই গানে কবিতায় লেখা হত। কবিরা তা সাধারণতঃ নিজেরাই সুর করে বা আবৃত্তি করে শোনাতেন সকলকে। মেলায় মেলায় যাত্রায় বৈঠকে ধনীদের উৎসব-প্রাঙ্গণে কবির আসর বসত তখন। কবির সঙ্গে রসিকের তখন সামনাসামনি দেখা হত। কিন্তু যখন ছাপাখানা এল তখন কবির আর রসিকদের মাঝে দুটো প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়াল প্রায় আকাশচুম্বী হয়ে। একটি প্রাচীর প্রকাশক, আর একটি প্রাচীর সমালোচক। এদের আনুকূল্য না পেলে লেখকরা পাঠক-সমাজে পৌঁছতে পারেন না। প্রকাশকরা ব্যবসায়ী, তারা সাধারণত সেই বই ছাপতে চান যা বেশি বিক্রী হয়। কবিতার বই বা প্রবন্ধের বই কম বিক্রী হয় তাই তাঁরা তা ছাপতে চান না। নাটকও যদি মঞ্চস্থ এবং জনপ্রিয় না হয় তা হলেও তার পুস্তক-আকারে আত্মপ্রকাশ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। পাঠকদের কাছে যাওয়ার আর একটা পথ সাময়িক পত্র-পত্রিকা। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় যদি লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয় তা হলে তা ভালো হলে পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রন্থপ্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বৃহত্তর রসিকসমাজ সে লেখার রসাস্বাদন করবার সুযোগ পান। কিন্তু হায়, আমাদের দেশের অধিকাংশ সাময়িক পত্রই ব্যবসায়ী পত্রিকা, ব্যবসায়ের হাল ধরে যিনি বসে থাকেন তিনি সাহিত্যিক বা

রসিক নন, তিনি কোনও ধনীপুত্র। তাঁরও লক্ষ্য সাহিত্যের উন্নতি নয়, ব্যবসায়ের উন্নতি। তাঁরা তাই নামজাদা লেখকদের লেখা ছাপেন, আর ছাপেন সেই সব লেখা যা প্রাকৃত-জন-মন-রোচক। আজকাল অধিকাংশ পত্রিকাতেই সিনেমার সচিত্র খবর থাকে, রান্নার খবর থাকে, জ্যোতিষের খবর থাকে, যৌন-আবেদনমূলক লেখা থাকে, রাজনীতির খবর থাকে, বিদেশী সাহিত্যের পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত অনেক বাজে খবর থাকে, উদ্ভট রসিকতা এবং দুর্বোধ্য কবিতা থাকে—থাকে না কেবল এদেশের নূতন লেখকদের লেখা সৎসাহিত্য। এ দেশের উদীয়মান সাহিত্য-সমাজ তাই আজ অনুদিত। আমাদের দেশে নূতন প্রতিভাবান সাহিত্যিক আর জন্মগ্রহণ করছে না এ কথা অবিশ্বাস্য। প্রকৃত কথা হল—তাঁরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা নূতন লেখকের লেখা পড়েও দেখেন না। আমরা যখন লেখা শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু এরকমটা ছিল না—আমি যখন স্কুলে পড়ি তখনই আমার লেখা রামানন্দবাবু 'প্রবাসী'তে ছেপেছিলেন। তখন টাকায় আট সের দুধ ছিল, ভালো রুদ্‌নি চাল সাত টাকা মণ ছিল, ঘি পাওয়া যেত টাকায় এক সের, ইলিশমাছ টাকায় চারটে, পাকা রুই ছ আনা সের, ভালো খাসির মাংস আট আনা সের, মুর্গি টাকায় চারটে পাঁচটা। এই অনুপাতে ভদ্রলোকের সংখ্যাও দেশে অনেক ছিল তখন। অধিকাংশ পত্রিকার সম্পাদকেরা তখন মাননীয় বিবেকবান সম্পাদক ছিলেন, কোনও ধনীপুত্রের চাকর ছিলেন না তাঁরা। তাই সে যুগে তাঁরা উদীয়মান সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিয়ে, তাঁদের লেখা সংশোধন করে, তাঁদের লেখা প্রকাশ করে তাঁদের মানুষ করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু এ যুগে? আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও যদি এ যুগে জন্মাতেন তা হলে তাঁরাও বোধ হয় কলকে পেতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এদিক দিয়েও সৌভাগ্যবান ছিলেন, কারণ তাঁদের নিজেদেরই কাগজ ছিল—সাধনা, বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্য-প্রতিভা-উন্মেষের একটা নবযুগের ইতিহাসকে বিবৃত করে রেখেছে। কিন্তু সব লেখকদের এ সৌভাগ্য

হয় না, সবাই নিজেদের কাগজ বার করতে পারে না। তাঁরা আধুনিক নামজাদা পত্র-পত্রিকার আপিসেই লেখা পাঠান এবং তা সম্ভবত অপঠিত অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়। বর্তমান যুগে চাল ডাল তেল নুন মাছ মাংস প্রভৃতির সমস্যায় আমরা ব্যাকুল, আমাদের দেশের উদীয়মান সাহিত্য-প্রতিভা প্রকাশের অভাবে শুষ্ক শীর্ণ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, এ নিয়ে আমরা এখনও ব্যাকুল হয়ে উঠি নি। কিন্তু দেশকে যদি বড় করতে হয় তা হলে এ সমস্যারও সমাধান আমাদের করতে হবে। আমাদের দেশে ভালো লেখকরা আত্মপ্রকাশ করতে পারছেন না বলে ভালো পাঠকও তৈরি হচ্ছে না। যাঁরা ভালো লেখক তাঁরাও ভালো লেখা লিখতে চান না, 'পপুলার' লেখা লিখতে চান, তাঁরাও যৌনসমস্যা, রাজনীতি আর সিনেমা-মার্কা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। কারণ তাঁরা জানেন ভালো লেখা লিখলে বাজারে তা চলবে না। ভালো পাঠক নেই। আজকাল ভালো সাহিত্য সৃষ্টি করা তাই অধিকাংশ লেখকদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য বাজারে চালু থাকা। ওদেশেও বোধহয় এই রকম অবস্থা। Arnold Wesker-এর লেখা Roots নাটকের হতাশ নায়িকা Beatie Bryant শেষ দৃশ্যে যে কথা বলেছেন তা পড়ে এই কথাই মনে হয়। Beatie Bryant অশিক্ষিতা। সে একটা হোটেলের waitress। Beatie Bryant বলছে যে দেশের প্রতিভাবান শিল্পীরা তাদের রুচির বহর দেখে ঘাবড়ে গেছে। তাদের জন্য ভালো কিছু তাই তারা আর সৃষ্টি করছে না। ভুল ইংরেজিতে সে যা বলেছে তা উদ্ধৃত করি—

"Do you think when the really talented people in the country get to work they get to work for us? Hell, if they do! Do you think they don't know we won't make the effort? The writers don't write thinking we can understand, nor the painters don't paint expecting us to be interested—that they don't, nor don't the composers give out music thinking we can appreciate it. 'Blust' they say, 'the masses is too stupid for us to come down to them. 'Blust' they say, 'if

they don't make no effort why should we bother? So you know who come along? The slop singers and pop writers and the film makers and women's magazines and the Sunday papers and the picture strip love stories—that's who come along, and you don't have to make no effort for them, it come easy."

আমাদের দেশেও slop singers and pop writers আবির্ভূত হয়েছে এবং তারাই জনসাধারণের মানসিক খোরাক সরবরাহ করছে। আমার বিশ্বাস, সত্যিকার প্রতিভাবান লেখক-লেখিকারা যে নেই তা নয়, কিন্তু তাঁরা আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাচ্ছেন না। 'ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে'? সব সলিলই 'সমল' হয়ে গেছে। ধনী পত্রিকাওয়ালারা এবং সম্পাদকরা বাংলার প্রতিভা-ধারার উপর যে 'ড্যাম' চাপিয়ে দিয়েছেন তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে সুস্থ সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে। আমাদের সরকার নানারকম পরিকল্পনা করে দেশের উন্নতির চেষ্টা করছেন, কিন্তু সুস্থ সাহিত্য বিকাশের কোনো পরিকল্পনা যদি না হয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত সব পরিকল্পনাই পানচাল হয়ে যাবে। কারণ সব পরিকল্পনাতে মানুষই প্রধান উপাদান। দেশের সাহিত্যই দেশের মানুষ তৈরি করে। সাহিত্যের যদি অবনতি হয়, জাতিরও অবনতি হতে বাধ্য। গ্যেটে (না, গ্যয়টে?) বলে গেছেন—The decline of literature indicates the decline of a nation: the two keep pace in their downward tendency।[৭] দেশকে মহৎ করতে হলে মহৎ সাহিত্যকে বাঁচাতে হবে এবং এ দায়িত্ব সরকারের।

৭. Dictionary or Thoughts

ছোটগল্প

ছোটগল্প পৃথিবীর সব সাহিত্যেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। সে স্থান শুধু বিশিষ্ট নয়, তা সমুজ্জ্বল। বিধাতার মতো মানুষ স্রষ্টারাও তাঁদের সৃষ্টিনৈপুণ্যকে একটা সীমার মধ্যে নিবদ্ধ করেও তার মধ্যে অনন্তের আভাস পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছেন যুগে যুগে। অতিশয় সীমাবদ্ধ হলেও ক্ষুদ্র যে বাস্তবিক ক্ষুদ্র নয় তার প্রমাণ বিজ্ঞান জগতেও আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। পরমাণুর মধ্যেও ইলেক্ট্রন পজিট্রনের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা। পরমাণুর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিও যে নিহিত আছে এর প্রমাণও বিশ্ববাসী পেয়েছে। ছোটগল্প তেমনি আকারে ছোট হলেও গুণে ছোট নয়। মহাকাব্য বা মহা-উপন্যাসের মতো অতিকায় না হয়েও সে বিদগ্ধজনের চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে পারে।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা কি ?

নানা গুণীজন এর নানা সংজ্ঞা দিয়াছেন। অনেকদিন আগে শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু—স্বনামধন্য পরশুরামের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার পত্রালাপ হয়েছিল। তাঁর সেই পত্র থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি করছি এই জন্যে যে সংক্ষেপে এতে ছোটগল্পের মূল মর্মটি আপনারা বুঝতে পারবেন। পরশুরাম লিখেছিলেন—"ছোটগল্প বললে কি বোঝায়—আপনার এই প্রশ্ন শুনেই মুখে উত্তর আসে—মানে তো স্পষ্ট, যেমন ছোট এলাচ, ছোট সাহেব, ছোট লোক, তেমনি ছোটগল্প। কিন্তু এ উত্তর অচল। কত ছোট ? কিসের চাইতে ছোট ? ছোট হলে শুধু আকার কমে যায় না গুণও বদলায় ? গল্প মানে কি ?

আধুনিক বাংলা ভাষা ইংরেজির অনুগামিনী ল্যাংবোট। ইংরেজি শব্দের যে অর্থব্যাপ্তি বা Connotation, বাংলা প্রতিশব্দেরও ঠিক তাই হওয়া চাই। আজকাল 'প্রতিভার লক্ষণ' লিখলে চলে না, Promise-এর মাছি-মারা নকলে লিখতে হবে 'প্রতিভার প্রতিশ্রুতি'। ভবিষ্যতে

হয়তো আমরা হিন্দীর বশে চলব, কিন্তু আপাতত ইংরেজিই বাংলার প্রভু। অতএব নভেল আর স্টোরি শব্দের মানে আগে বুঝতে হবে।

Concise Oxford Dictionary-তে novel এর অর্থ—fictitious prose narration of sufficient length to fill one or more volumes, portraying characters and actions representation of real life in continuous plot. এই অভিধানের স্টোরির অর্থ—tale of any length told or printed in prose or verse of actual or fictitious events, legend, myth, anecdote, novel, romance.

উক্ত সংজ্ঞার্থ অনুসারে রূপকথা, পুরাণ কাহিনী, কিংবদন্তী, নক্‌শা বা স্কেচ, নভেল প্রভৃতি ছোট বড় সব রকম আখ্যান স্টোরির অন্তর্গত, কিন্তু নভেলে বাস্তব-তুল্য মানবজীবনের একটানা বর্ণনা থাকা চাই। বাংলায় উপন্যাস বললে মোটামুটি বোঝায় কয়েকজন পাত্রপাত্রীর জীবন ও চরিত্রের আনুপূর্বিক বিবরণ। উপন্যাসে মধ্য ঘটনাবলীই প্রধান কিন্তু আদি ও অন্ত ঘটনারও অল্পাধিক বিবরণ আবশ্যক। পক্ষান্তরে গল্পে আদি মধ্য অন্ত যেখান থেকে হোক একখণ্ড ঘটনা দেখালেও চলে।

ইংরেজি স্টোরি শব্দ আজকাল ব্যাপক অর্থে চলছে। অনেক ম্যাগাজিনে স্টোরি নামে এমন রচনা ছাপা হয় যা সাধারণ বাঙালী পাঠকের বিচারে গল্প নয়।

কৌতূহলজনক, চিত্তাকর্ষক বা চিন্তার উদ্দীপক ক্ষুদ্র ঘটনার বিবরণও স্টোরি। বিষয়টি অসম্ভব হলেও ক্ষতি নাই। রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার-ভূত' নিঃসন্দেহে স্টোরি।

অতএব গল্প বা স্টোরির অর্থ উপন্যাস বা নভেলের চাইতে ব্যাপক। উপন্যাস গল্পের অন্তর্গত কিন্তু গল্প মাত্রই উপন্যাস নয়······ইংরেজি গল্পের বিষয়ের সীমা নেই। Erewhon, Penguin Island, Animal Farm প্রভৃতি রূপক গল্প। বাঙালী পাঠকের রুচির বৈচিত্র্যও পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেছে।

সংস্কৃতে কবি বললে গল্পকারও বোঝায়। যিনি রসের উপলব্ধি করেন এবং নিজ রচনার দ্বারা সেই রস অন্যের মনে সঞ্চারিত করেন তিনিই কবি। (ভাগ্যক্রমে রসের ইংরেজি নেই)। কাব্যকার ও গল্পকার দুজনেই রসের ভাবক ও সঞ্চারক, যদিও তাঁদের কলাবিধি পৃথক। যে লেখক শুধু পাঠকের রুচি বশে চলেন তিনি পেশাদার মাত্র। যিনি নিজের নব নব রসানুভূতি ব্যক্ত ক'রে পাঠকের রুচি প্রভাবিত করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক······"

পরশুরাম পত্রে আরও অনেক কিছু লিখেছিলেন, সেগুলি বাদ দিলাম। তিনি যা লিখেছেন তার থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে—ছোটগল্পের বিষয়ের কোনো সীমা নেই, আকারেরও বাঁধা ধরা কোন ছক নেই। তা দু-ইঞ্চিও হতে পারে, আবার দু-হাজার গজও হতে পারে। তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ যতই হোক তার একটা গুণ কিন্তু থাকতে হবে। তাতে একটি মাত্র সুর, একটি মাত্র ভাব থাকা চাই। সেই সুর বা সেই ভাবকে ঘিরে স্রষ্টা শিল্পী তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নানা রূপে, নানা বর্ণে, নানা গন্ধে,—কিন্তু তাতে সেই গুণটি থাকা চাই যা গীতিকবিতার প্রাণ। বস্তুত লিরিক কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের মূলত কোনো প্রভেদ নেই। ছোটগল্প ভূরি-ভোজনের আয়োজন করে না, সে একটি মাত্র খাবার সুন্দর সুশোভন পাত্রে নিপুণ হস্তে পরিবেশন করে। তা মিষ্টি হতে পারে, ঝাল হতে পারে, নোনতা হতে পারে, তিক্তও হতে পারে। রসিক ভোক্তার রসচেতনায় যে রসটি সে জাগাতে চেয়েছে তা যদি জেগে থাকে তা হলেই সে গল্প সার্থক সৃষ্টি। আর একটা উপমাও দেওয়া যায়। বড় বড় এপিক উপন্যাসগুলি যেন বড় বড় শহর। সে শহরে ভালো লোক আছে, মন্দ লোক আছে, দেবতা আছে, পিশাচ আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপথ আছে, ছোট ছোট গলি আছে, বিরাট বিরাট হর্ম্য আছে, খড়ের ঘর, খাপরার ঘর আছে, বস্তি আছে, পার্ক আছে, পুকুর আছে, নানাজাতের যানবাহন আছে। সৌন্দর্যও যেমন আছে কদর্যতাও তেমনি আছে। আগেকার মহাকাব্যে আমরা এইরকম একটা সৃষ্টির মহিমা দেখে মুগ্ধ হই: আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, ওদেশের ইলিয়াড,

অডিসি, প্যারাডাইস লস্ট—এই ধরনের বিস্ময় জাগায় মনে। এ যুগে মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে এপিক উপন্যাসগুলি। টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস্', টুর্গেনিভের 'ফাদারস্ এণ্ড সনস্', রমাঁ রোঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ্', ভিক্টর হুগোর 'লে মিজারেবলস্', ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিলড', 'ব্লিক হাউস', শলকভের 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন', ব্যালজাকের 'হিউমান কমেডি', ডুমার 'কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো', হামসুনের 'গ্রোথ অব দি সয়েল', সিগ্রিড উনড্‌সেটের 'ক্রিস্টিন লাভারানস্ ডাটার', সিনক্লেয়ার লুইসের 'মেন স্ট্রীট', আপটন সিনক্লেয়ারের 'অয়েল', 'জাংগ ল্', গলস্‌ওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা', জর্জ বরোর 'দি বাইব ল ইন স্পেন'। দস্তয়ভস্কির 'ব্রাদার্স কার্মাজোভ', 'ইডিয়ট', 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট', টমাস ম্যানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন', ব্রেখটের 'থ্রি পেনি নভেল', মিচেলের 'গন উইথ দি উইণ্ড'—এলোপাতাড়িভাবে যে বইগুলির নাম করলাম এগুলি সবই এপিকধর্মী উপন্যাস। ইংরেজি ভাষায় এ ধরনের অনেক উপন্যাস আছে। বাংলায় খুব বেশি নেই। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এপিক-ধর্মী উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'কেও এই পর্যায়ে ফেলা যায় বোধহয়। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' এবং অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য'ও এই জাতের উপন্যাস। বিমল মিত্রও এপিকধর্মী উপন্যাস লিখেছেন —'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'বেগম মেরী বিশ্বাস'।

ছোটগল্প কিন্তু শহর নয়। সে বড় জোর শহরের একটি রাস্তা, কিম্বা রাস্তার উপর একটি বাড়ি, কিম্বা বাড়ির মধ্যে একটি ঘর কিম্বা ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটি তাক বা জানলা। সে একটি যন্ত্রে একটি সুর বাজায়। সে সুর একটি মাত্র সুর, তা অর্কেস্ট্রা নয়। এই একটি সুর সৃষ্টি করেই প্রতিভাবান গল্পকার কিন্তু বিস্মিত ক'রে দিতে পারেন রসিক পাঠক-পাঠিকাদের, প্রমাণ ক'রে দিতে পারেন যে বিন্দুর মধ্যেও সিন্ধুর আভাস প্রতিফলিত করা সম্ভব। অতি ক্ষুদ্র কাহিনীর মধ্যেও অতি বৃহৎ সত্য যে লুকিয়ে আছে এ কথা প্রতিভাবান ছোটগল্পকাররা শুধু যে জানেন তা নয় সুনিপুণভাবে সেটা ফুটিয়ে তুলতেও পারেন। ছোটগল্পে সব রকম রসই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। অদ্ভুত রসের

পরিচয় সাহিত্যে খুব বেশী নেই। কিন্তু একটি চীনে ছোটগল্পে তা আস্বাদ করেছিলাম একবার। গল্পটি খুবই ছোট। হু হু ক'রে ট্রেন চলছে অন্ধকার ভেদ ক'রে। ট্রেনের একটি কামরায় একটি লোক একা বসে ছিল কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল কামরার ও-কোণে আর একজন বসে আছে কে যেন। এটা মনে হওয়ামাত্র সে লোকটি কোণ থেকে উঠে এসে তার সামনা সামনি বসল। কিন্তু আবছা-অন্ধকার, তার মুখটা ভালো দেখা গেল না। সে এসেই একটি প্রশ্ন করল— 'আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?' লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে ইতস্তত করে উত্তর দিল—'না করি না'। 'আমি কিন্তু করি'—বলেই অন্তর্হিত হয়ে গেল সে সহসা। এইখানেই গল্প শেষ, কিন্তু ওর মধ্যে যেটুকু অশেষ, যে রহস্য কোনো কালে সমাধান হবার নয় তার অদ্ভুত সুর মনে বাজছে আজও।

জীবনে অনেক ছোটগল্প পড়েছি। যেগুলি মনে দাগ কেটে যায়, আমার মনে হয়, শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সেইগুলিই সার্থক। সত্য, ক্ষুরধার। আর সত্যকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করাই ছোটগল্পের শিল্প। প্রকাশ করতে আ।পাতা লাগতে পারে আর ছোট একটা বইও হয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয় হেমিংওয়ের বিখ্যাত গল্প 'The old man and the sea'—একটি ছোটগল্প। যদিও সেটা ছোট উপন্যাসের মতো। একটি শাশ্বত সুরই ওতে বেজেছে, যে সুর রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতার একটি ছত্রেই প্রকাশ করেছেন—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই না।' বুড়ো Santigo দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল একটি ছেলেকে নিয়ে। তার নৌকো, মাছ ধরবার সাজসরঞ্জাম সবই অকিঞ্চিৎকর। তবু তার সাধ ছিল একটা বড় মাছ ধরবার। ভাগ্যক্রমে একটা বড় মাছ ধরা পড়েছিল। আঠারো ফুট লম্বা মাছ। কিন্তু সে সমুদ্রের ভিতর অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, বেচারা মাছটাকে নিয়ে নির্বিঘ্নে আর তীরে পৌঁছাতে পারল না। হাঙ্গরে আর সামুদ্রিক জীবজন্তু ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে তার মাছটাকে খেয়ে ফেলল। তীরে যখন তার নৌকো ভিড়ল তখন মাছের কঙ্কালটা রয়েছে খালি। বুড়োর

জীবনের ট্র্যাজেডির সুর আমাদেরও জীবনে নানাভাবে বেজেছে এবং বাজবে।

'স্টিন-বেক্'-এর লেখা 'Of mice and men'-ও এমনি একটি চমৎকার গল্প। যদিও আকারে বড়, কিন্তু সুর একটি। দুজন নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মজুর, দুজনেই খুব বন্ধু। কাজ খুঁজতে বেরিয়েছে। একজন বিশালকায় শক্তিধর মানুষ, নরম জিনিস পেলে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে আদর করবার জন্যে। কিন্তু মুঠোর চাপে তারা মরে যায়। কত ইঁদুর, কত খরগোশ মেরে ফেলেছে সে এমনি করে। ইচ্ছে ক'রে মারে নি, আদরই করতে চেয়েছিল সে, সেই আদরের প্রাবল্যেই শেষে মরে গেছে তারা। শেষকালে একটি মেয়েও মারা গেল তার হাতে। শেষ পর্যন্ত তাকেও মরতে হোল তার বন্ধুর হাতের গুলি খেয়ে। সংক্ষেপে এই গল্প, কিন্তু লেখায় কি মুনশীয়ানা, বক্তব্যের কি শাশ্বত মূল্য। বেশী আঁকড়ে ধরতে গিয়েই তো আমরা শেষ পর্যন্ত সব হারাই।

এমনি আরও অনেক বিশ্ববিখ্যাত ছোটগল্পের নাম মনে পড়ছে। মনে পড়ছে পুশকিনের অনেক গল্প। তাঁর Queen of Spades অদ্ভুত গল্প একটি।

মনে পড়ছে শেখভের 'ডার্লিং' গল্পটা। সদানন্দময়ী মেয়ে একটি। সকলের ডার্লিং। জীবনে দুঃখের আঘাত তাকে বিধ্বস্ত করতে পারে নি। জলের মতো স্বভাব তার, যখনি যে পাত্রে থাকে তখনই সে পাত্রের আকার ধারণ করে।

মনে পড়ছে শেখভের 'ভ্যাঙ্কা' গল্পটিও। পিতৃমাতৃহীন ভ্যাঙ্কা অন্যগ্রামে এক মুচির কাছে কাজ করে। ঠাকুরদা ছাড়া তার আপন লোক কেউ নেই। বড়দিনের সময় সে ঠাকুরদাকে নিজের মনের দুঃখ জানিয়ে চিঠি লিখছে। লম্বা চিঠি লিখল। কিন্তু ঠিকানার জায়গায় শুধু লিখল—ঠাকুরদা, গ্রাম কনশট্যানটিন মাকারিচ। তারপর ফেলে দিয়ে এল সেটি লেটার বক্সে। সে চিঠি তার ঠাকুরদা পায় নি। কিন্তু আমরা পেয়েছি অমর শিল্পী শেখভের মারফত।

শেখভের আর একটি আশ্চর্য ছোটগল্প মনে পড়ছে। সেই মাতাল টম্‌টম্‌ওলার গল্পটা। মত্ত অবস্থায় সে একদিন টম্‌টম্ হাঁকিয়ে চলেছে। বৃষ্টি পড়ছে, বরফ পড়ছে। টম্‌টমের পিছনে শোয়ানো তাঁর অসুস্থ স্ত্রী। পা দুটো ঝুলছে তার। টম্‌টম্‌ওলা বলতে বলতে চলেছে—তুমি ভালো হয়ে ওঠো। আর আমি মদ ছোঁব না, তোমার কথা শুনে চলব এবার। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুও আমাকে দেখা হলেই বলেছেন, তুমি মদ ছেড়ে দাও। তিনি এবার তোমায় ভালো করে তুলুন, আর আমি মদ ছোঁব না। তোমাকে নতুন জামাকাপড় কিনে দেব এবার। ভালো হয়ে ওঠো তুমি। টম্‌টমের ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে ক্রমাগত এইসব বলে যাচ্ছে সে। স্ত্রীর মুখে কিন্তু কোনো উত্তর নেই। হাসপাতালে যখন সে পৌঁছাল, তখন ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। তার স্ত্রীকে পরীক্ষা ক'রে বললেন—সে অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টম্‌টম্‌ওলা। তারপর যা বলল তা একটি শাশ্বত সত্য—It ends so quickly। শেখভের আর একটি চমৎকার ব্যঙ্গগল্প—A work of art—কিন্তু আমি এ কি করছি, যদি প্রত্যেক বিখ্যাত গল্পের সংক্ষিপ্তসার দিতে হয় তা হলে তো প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হয়ে পড়বে, আপনাদের সহ্যের সীমাও অতিক্রম করবে হয়তো। তাই যে সব বিখ্যাত ছোটগল্প আমার খুব ভালো লেগেছে তার একটা তালিকা দিচ্ছি। বিদেশী গল্পের তালিকাই আগে শুনুন। তালিকাটা এলোমেলো। মোপাঁসার Boule de Suif, The Necklace, His son, ব্যালজাকের Droll Stories-এর অনেক গল্প, আনাতোল ফ্রাঁসের 'জোকাস্টা' 'দি প্রকিউরেটার অব জুডিয়া', চার্লস্ ডিকেন্সের The Holly Tree, রিচার্ড গার্নেটের Ananda the Miracle Worker, Bret Harete-এর The Luck of Roaring Camp—ব্রেট হার্টের সব গল্পই ভালো লেগেছে আমার, জেকিল, ও হাইডের স্রষ্টা লুই স্টিভেনসনের The Sire de Maletroits Door, সমরসেট মমের The Ranis, The Unconquered, জিভ্‌সের স্রষ্টা ওড্‌ হাউসের—The Fiery Wooing of, Mordred, সাকির

Open Window, জঁ পল সার্ত্রর The Hell ; মার্ক টোয়েনের সব গল্পই ভালো লাগে আমার। বিশেষ ক'রে লেগেছে The Stolen White Elephant গল্পটি, Edgar Allan Poe-রও সব গল্পই চমৎকার, বিশেষ ক'রে ভালো লেগেছিল—The Purloined Letter গল্পটি, টমাস হার্ডির—Three Strangers, H. G. Wells-এর—A Slip under the microscope, Katherine Mansfield-এর Sun & Moon, Constant Holme-এর The Last Inch—প্রত্যেকটিই ভালো ছোটগল্প। Ambrose Bierce অনেক ভালো ভূতের গল্প লিখেছেন, তাঁর লেখা A Horseman in the sky গল্পটি অদ্ভুত। অসকার ওয়াইলডেরও সব গল্প ভালো, বিশেষ করে তাঁর The Remarkable Rocket গল্পটি তো অতি সুন্দর, Rudyard Kipling-এর জঙ্গলের গল্পগুলি অতি চমৎকার, তাঁর The Miracle of Purun Bhagat গল্পটি অতি সুন্দর। মরিস লাভালের Crises এবং স্তিফান জোয়াইগের ক্যালিডোস্কোপও চমৎকার দুটি গল্পসংগ্রহ।

জ্যাক লণ্ডনের লেখা পড়েছেন ? অদ্ভুত লেখক Jack London, কত রকম লেখাই যে লিখেছেন। Emperor তাঁর বিখ্যাত বই। অনেক সুন্দর ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর ছোটগল্প—To build a fire অপরূপ ছোটগল্প একটি। তুষার মেরুতে জমে গিয়ে কি করে একটি লোক সঙ্গে দেশলাই থাকা সত্ত্বেও আগুন জ্বালাতে পারল না, ঠাণ্ডায় মরে গেল শেষে, তারই করুণ কাহিনী। ছোটগল্প হিসাবে প্রথম শ্রেণীর। টলস্টয়ের লেখা Twenty Three Tales-এর সব গল্পগুলিই চমৎকার। প্রত্যেক সাহিত্যপাঠকের অবশ্য-পাঠ্য। What men live by, the story of Ivan the fool চিরন্তন সত্যের অপরূপ শিল্পরূপ। তাঁর বড়গল্প The Yardstick-ও চমৎকার। টলস্টয়ের ছোট-বড় কোন্ লেখাটা ভালো নয় ? টুর্গেনিভের কথিকা-আকারে লেখা কাব্যরসাত্মক গল্পগুলিও খুব ভালো লেগেছিল এককালে। ভালো লেগেছিল Yama the Pit-এর লেখা কুপ্রিনের The Bracelets of Garnets নামে ছোটগল্পটি। অতি সুন্দর। আর একজন বিখ্যাত ছোটগল্প লেখকের

উল্লেখ করা হয় নি এখনও। ও হেনরি। তিনি ছোটগল্প জগতে যাতুকর একজন। তাঁর The Gift of Magi, The Skylight Room, A Service of Love, The Romance of a Busy Broker, The Furnished Room প্রভৃতি গল্প অনবদ্য। ছোট ছোট ঘটনা অবলম্বন করে তিনি আশ্চর্য কৌশলে অত্যাশ্চর্য রূপ-কথালোকে নিয়ে যান আমাদের যেখানে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাণের নিগূঢ় তন্ত্রী অপরূপ সুরে বেজে ওঠে। আর একজন লেখকের কথাও মনে পড়ছে—লিকক্। তিনি ব্যঙ্গ-ধর্মী ও হাস্য-ধর্মী লেখাই লিখেছেন বেশি। তাঁর সব লেখা ছোটগল্পও নয়, কিন্তু কতকগুলি অন্তত ছোটগল্প আছে—Behind the Beyond এবং Nonsense Novels বই দুটিতে। অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক রস ফুটিয়েছেন তিনি তাঁর গল্প-গুলিতে। বস্তুত যে কোনো রসই সার্থক ও সুন্দর ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারে তার স্রষ্টা যদি শক্তিমান লেখক হন। ডিটেকটিভ গল্পও যে সার্থক সৃষ্টির পর্যায়ে উঠতে পারে তা প্রমাণ করেছেন কোনান্ ডয়েল, জি. কে. চেস্টারটন, এড্গার ওআলেস, অগাথা ক্রিস্টি। চেস্টারটন তাঁর Tremendous Trifles বইটিতে কতকগুলি ছোটগল্প-ধর্মী অদ্ভুত রম্যরচনাও লিখেছেন। আমেরিকার অনেক লেখক অনেক সুন্দর ছোটগল্প লিখেছেন। হেমিংওয়ের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। ফক্নারের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা—That Evening Sun Go Down কিম্বা Barn Burning প্রভৃতি গল্পে তাঁর প্রতিভা দেদীপ্যমান। James Joyce-ও ক্ষমতাশালী লেখক একজন। তাঁর ছোটগল্প The Boarding House একটি অপূর্ব সৃষ্টি। আর একজন নামজাদা মার্কিন লেখক—জোসেফ কনরাড। তাঁর The Lagoon বা An Outpost of Progress অনবদ্য গল্প।

সবশেষে মনে পড়ল—W. W. Jacobs-এর Monkey's Paw। তাঁর Many Cargoes বইতে আরো চমৎকার হাসির গল্প আছে। ইংরেজি ভাষায় অসংখ্য লেখক। তাঁদের সকলের নাম করতে গেলেও একটা প্রকাণ্ড বই হয়ে যাবে। সকলের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয়ও

নেই, যাদের সঙ্গে আছে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবারও সময়াভাব এখন। তাই সে চেষ্টা আর করব না। অনেকেই প্রশ্ন করেন এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক কে? এর উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ এর উত্তর নেই। শিল্পের জগতে কেউ শ্রেষ্ঠ নয় কেউ নিকৃষ্ট নয়। সবাই নিজের মর্যাদায় নিজের সৃষ্টির সিংহাসনে সমাসীন। পদ্ম শ্রেষ্ঠ না, গোলাপ শ্রেষ্ঠ, বেলা, মল্লিকা, যুঁই, চম্পা এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে কার দাবি বেশি এ নিয়ে মাথা ঘামান বেরসিকেরা। কিম্বা মতলববাজরা,—যাঁরা একজন লেখকের জয়ঢক্কা পিটিয়ে তাঁকে সম্রাট বা শাহনসাহ বানিয়ে অন্য লেখকদের ছোট করতে চান ঈর্ষাবশে বা অন্য কোনও স্বার্থসিদ্ধির আশায়। যে জগতে সার্থক শিল্পীরা বাস করেন সে জগতে সবাই রাজা, কেউ কারো চেয়ে বড় নন, কেউ কারো চেয়ে ছোট নন। সবাই অনন্য, সবাই স্বয়ম্প্রভ স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। একজনকে অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেওয়া যায়—তিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ভগবান। তিনি নীহারিকা সৃষ্টি ক'রে, বড় বড় সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি ক'রে, হিমালয়, আল্পস্, এণ্ডিজ্ সৃষ্টি ক'রে, গোবির আরবের রাজপুতানার মরুভূমি সৃষ্টি করে, উত্তর মেরুর হিমশিখর সৃষ্টি করে, আফ্রিকার জটিল অরণ্য সৃষ্টি করে যেমন এপিক-রচনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তেমনি আবার অসংখ্য প্রজাপতি, পতঙ্গ, জীব-জন্তু, ফুল-ফল-লতা-পাতা সৃষ্টি করে, প্রত্যেকটি নর-নারীর দেহ-মনকে অপরূপ স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করে, লিরিক-সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয়ও দিয়েছেন। একটি রঙীন প্রজাপতিকে, একটি চমৎকার ফুলকে, একটি রূপসী মেয়েকে, একটি প্রাণবন্ত শিশুকে—আপনি ছোটগল্পও বলতে পারেন, ছোট কবিতাও বলতে পারেন, চমৎকার গানের সুরও বলতে পারেন, অনবদ্য চিত্রও বলতে পারেন। মূলত ওরা সবই এক। একটি সুন্দর অনন্য প্রকাশ মাত্র। দেবী সরস্বতীর প্রসন্ন প্রকাশ, অমর্ত্য-আলোকের মর্ত্য-মহিমা।

এইবার বাংলা সাহিত্যের গল্পের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। বাংলা সাহিত্যে গল্পের আরম্ভ কবে থেকে তা নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করেছেন। সে গবেষণার জটিলতায় প্রবেশ করবার সামর্থ্য

আমার নেই। আমাদের দেশে—বস্তুত সবদেশেই গল্প প্রচলিত ছিল লোকের মুখে মুখে। ঠাকুমার গল্প, রাজার বা বড়লোকের পারিষদের গল্প, ভ্রমণের গল্প, ভূতের গল্প, চোর-ডাকাতের গল্প, বীরপুরুষদের গল্প লোকের মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল বহুকাল। ধর্মের জন্য, ব্রতের জন্যও নানারকম গল্প উপকথা প্রচলিত ছিল মুখে মুখে আমার মনে হয় পৃথিবীর বিখ্যাত ছোটগল্প সংগ্রহগুলি প্রথম লোকমুখেই সঞ্চারিত হয়েছিল দেশবিদেশে। 'জাতকে'র গল্প, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাসের গল্পগুলি, ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথা সরিৎসাগর—এ সবেরই প্রথম ধারক এবং বাহক ছিল মানবের রসনা। তারপর এগুলি ছাপা হয়েছে। প্রায় সব দেশেই সব ভাষাতেই হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভিত্তিপত্তন হয়েছিল অনুবাদ সাহিত্য দিয়ে। প্রথম কোন্ লেখকের নিজস্ব প্রতিভায়—বাংলা ভাষায় ছোটগল্প সৃষ্টি হয়েছিল তার ঠিক তারিখ আমার জানা নেই। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আস্বাদ খানিকটা পাওয়া যায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য়। ওই নক্শায় সে যুগের চিত্রটিকে জীবন্ত করে মূর্ত করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ জোরালো চলতি ভাষার স্বচ্ছ দর্পণে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার প্রথম প্রতিভাবান গল্পকার। কিন্তু তিনি ছোটগল্প লেখেন নি, লিখেছিলেন রোমান্টিক উপন্যাস। অবশ্য তাঁর কিছু লেখায়—যেমন হনুমদ্বাবু সংবাদ, মুচিরাম গুড়, কমলাকান্তের কয়েকটি রচনায়, যুগলাঙ্গুরীয় এবং রাধারাণীতে আমরা ছোটগল্পের আস্বাদ পাই একটু একটু। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ছোটগল্প-রসিক ছিলেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি অনুবাদ করেছিলেন তিনি। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে তিনি নিজেই হয়তো ভালো ভালো ছোটগল্প লিখতে পারতেন—এর প্রমাণ তাঁর অসমাপ্ত গল্পটি—'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী'। তিনি মুখে মুখে অনেক ছোটগল্প সরস ক'রে বলতে পারতেন তার প্রমাণ তাঁর জীবনীতে আছে। এই প্রসঙ্গে আর একজনের নামও শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করা কর্তব্য মনে করি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মুখে মুখে অনেক চমৎকার

ছোটগল্প বলতেন, শ্রী'ম' সেগুলি সংগ্রহ ক'রে গেছেন তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পুস্তকে।

বাংলাসাহিত্যে অবশ্য সত্যিকারের রসসমৃদ্ধ নিটোল ছোটগল্প প্রথম পরিবেশন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলাসাহিত্যে তিনি অনেক রকম রসের প্রথম স্রষ্টা। তাঁর ছোটগল্পে সব রকম রসই ফুটেছে, ফোটেনি কেবল অভব্য অশ্লীলতার রস। এইজন্যেই বোধহয় আজকাল গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল জাতের অনেক সমালোচক তাঁকে 'বুর্জোয়া' লেখক বলে ঠাট্টা করেছেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরই একটি ছোট কবিতা উদ্ধৃত করছি—

হাউই কহিল মোর কী সাহস ভাই
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কয় তার গায়ে লাগে নাকো কিছু
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরই পিছু পিছু।

রসের জগতে জাতিভেদ নেই, রাজনীতির মাপকাঠি সেখানে অচল। বলশেভিক রাশিয়ার রসিকসমাজ তাই ক্যাপিটালিস্ট সমাজের পুসকিন, টলস্টয়, টুর্গনিভ, লারমেনটফ, গোগল শেখভকে অপাঙ্‌ক্তেয় ক'রে রাখেন নি, সম্মানের উচ্চশিখরে বসিয়ে আজও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের জগতে একাধিকবার ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে। গল্পগুচ্ছের প্রথম দুইখণ্ডে যে স্বাদ, তৃতীয় খণ্ডের গল্পগুচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি নেই। সেখানে নূতন ধরনের স্বাদ। তারপর 'চতুরঙ্গ' 'দুই বোন' 'মালঞ্চ' 'চার অধ্যায়' 'তিন সঙ্গী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রত্যেকটিতে আবার ভিন্নতর স্বাদের সমারোহ। 'সে' বইটি অদ্ভুত রসের ব্যঙ্গরসের অভূতপূর্ব গল্পসংকলন। এর তুলনা ইংরেজি সাহিত্যে Alice in Wonderland বা 'গালিভার্স ট্রাভেলস্'-এ মেলে। বাংলায় এই স্বাদ কিছুটা পেয়েছিলাম সুকুমার রায়ের 'হযবরল' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি এবং গীতিকবিতার দিকেই তাঁর বেশি প্রবণতা। আমার মনে হয় এইজন্যেই তাঁর ছোটগল্পগুলি এত সুন্দর, এমন রসোত্তীর্ণ। কবিতাতেও চমৎকার চমৎকার গল্প বলেছেন তিনি—তাঁর 'কথা ও কাহিনী',

'পলাতকা', ও 'পুনশ্চ' বই তিনটিতে সংকলিত কতকগুলি কবিতা—কাব্য ও গল্পের অপূর্ব সমন্বয়। *তাঁর 'লিপিকা' গ্রন্থের গদ্যে লেখা সৃষ্টিগুলিতেও* ছোটগল্পের স্বাদ পাই আমরা যেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের জগৎ অফুরন্ত বিস্ময়ের জগৎ। তিনি শুধু যে চমৎকার চমৎকার গল্প সৃষ্টি করেছেন তাই নয় তিনি তাঁর গল্পগুচ্ছের মধ্যে এমন সব সম্ভাবনার বীজ ছড়িয়ে রেখে গেছেন যা পরবর্তী যুগের প্রতিভাবান লেখকদের উদ্দীপ্ত করেছে সেই ছোট ছোট বীজগুলি পরবর্তী অনেক লেখকের প্রতিভা-প্রভাবে বিরাট বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে বাংলাসাহিত্য-কাননকে রমণীয় শোভায় সজ্জিত করেছে। পল্লীগ্রাম এবং পল্লীগ্রামের অখ্যাত মানুষদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা নিয়ে যে ভালো গল্প লেখা সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী যুগের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিভাবান গল্পকাররা এই সম্ভাবনাকে আরও প্রশস্ত, আরও বিশদ, আরও বিস্তৃত ক'রে আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন বাংলাভাষায়। এই প্রতিভাধর লেখকদের প্রতিভা বিকশিত হয়েছে গ্রামীণ চরিত্র এবং গ্রামবাংলাকে অবলম্বন করে। ঔপন্যাসিক হার্ডির লেখায় যেমন ওয়েসেক্স অঞ্চল মূর্ত এঁদের লেখাতেও তেমনি বাংলাদেশের এক একটি অঞ্চল বিধৃত। বস্তুত এঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিই পল্লী অঞ্চলের মানব-মানবীদের কেন্দ্র করেই প্রস্ফুটিত হয়েছে।

তবে এ কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাভাষায় পল্লীসাহিত্য রচনার উৎস রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকিরণে প্রভাবিত রবীন্দ্রোত্তর সমস্ত যুগটাই। তাঁর জীবদ্দশাতেই অনেক প্রতিভাবান ছোটগল্প লেখকের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে। তাঁর পরিবারেই জন্মেছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লেখা রম্য-রচনাগুলিতে ছোটগল্পের আমেজ আছে। ঋতেন্দ্রনাথ 'পুণ্য' পত্রিকায় ছোটগল্প লিখতেন। জাপানী-গল্প লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুধীন্দ্রনাথও একজন ছোটগল্প লেখক। আমার যতদূর মনে পড়ছে স্বর্ণকুমারীর লেখাও দুই একটি গল্প ছেলেবেলায় যেন পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ইন্দ্রনাথ 'গালগল্পের' লেখক হিসাবে পরিচিত। আর একজন নামজাদা লেখকের নাম মনে পড়ল, যাঁর লেখা এখনও আমরা মহানন্দে পড়ি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'কঙ্কাবতী', 'ডমরুচরিত', 'মুক্তামালা' রসিকসমাজে চিরকাল সমাদৃত হবে। রসরাজ অমৃতলাল বসুও চমৎকার কয়েকটি ছোটগল্প নক্শা আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁর 'রায়-গৃহিণী', 'গোকুল তুই ক্ষ্যান্ত দে'—অপূর্ব রচনা। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আরও দু'জন প্রখ্যাত শিল্পীর নাম এইখানেই উল্লেখ করা উচিত। একজন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আর একজন বীরবল। প্রভাতকুমারের হাস্যরসস্নিগ্ধ গল্পগুলি অনন্য। তাঁর অনেক গল্প আছে। তাঁর 'ষোড়শী', 'দেশী ও বিলাতী', 'নব-কথা' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে যে গল্পগুলি আছে সেগুলির অনন্যতা আজও আমাদের মুগ্ধ করে। আর বীরবল? তাঁর তুলনা তো বঙ্গসাহিত্যে কোথাও পাই না। ফরাসী সাহিত্যের প্রাণবন্ত আবহাওয়া যেন তাঁর সৃষ্টির জগৎকে জীবন্ত করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেও নিজের স্বকীয়তায় তিনি প্রদীপ্ত। তাঁর 'চার ইয়ারি কথা' তাঁর 'ফরমায়েসি গল্প', তাঁর 'আহুতি', তাঁর 'ঘোষালের ত্রিকথা' তাঁর 'নীল-লোহিত চরিত্র' বিশ্বের যে কোনও ভাষার সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করত। তাঁর 'সবুজ পত্র' বাংলা সাহিত্যে সত্যই সবুজের সমারোহকে মূর্ত করেছিল একদিন। রবীন্দ্রনাথের সমীপবর্তী আরও কয়েকটি লেখকের নাম মনে পড়ছে—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গাঙ্গুলি, সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁরা অনেক ছোটগল্প লিখেছিলেন এককালে। বেশ ভালো ভালো গল্প। কিন্তু এঁদের গল্পে বিদেশী গল্পের প্রভাব পড়েছিল বেশি। আর একজন লেখক তিনিও বোধহয় এঁদের সমসাময়িক—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়—'আঙুর', 'আপেল' প্রভৃতি ফলের নাম দিয়ে গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন কয়েকখানি বেশ ভালো লাগত তাঁর গল্প। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা

দেবী শৈলবালা ঘোষজায়া উপন্যাস লিখেই যশস্বিনী হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের দুচারটি ছোটগল্পও আছে।

শরৎচন্দ্রের নাম আগেই করেছি। রবীন্দ্র-যুগে এই জন-মন-বিজয়ী লেখকের আবির্ভাবে গল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন একটা প্রবল জোয়ারের মতো আবেগ সৃষ্টি হল। তিনি তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে আলাদা একটা যুগই প্রবর্তন করলেন বাংলাসাহিত্যে। সে যুগের বিশেষত্ব, পল্লীপ্রবণতা, সে যুগের বিশেষত্ব দেশের দীন-দরিদ্র অখ্যাত অবজ্ঞাত ঘৃণিত মানব-মানবীর সত্য রূপকে, তাদের সুখ-দুঃখকে দরদী শিল্পীর আলেখ্য-সৌন্দর্যে সকলের সামনে তুলে ধরা। অগ্রগামী কবি রবীন্দ্রনাথ এ কাজ আগেই করেছিলেন। গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পে তার প্রমাণ আছে। শরৎচন্দ্র সেটা আরও বিশদ করে করলেন। সাধারণ গ্রামবাসীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর সহজ সরল ভাষায় গল্প বলবার অপরূপ ভঙ্গি বাঙালী পাঠকসমাজের মনে এমন একটা বিপুল আলোড়ন তুলল যা অভূতপূর্ব, যা ইতিপূর্বে আর হয় নি। শরৎচন্দ্র সত্যই কীর্তিমান শিল্পী। তাঁর 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পথ নির্দেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' তাঁর 'মহেশ' তাঁর 'নিষ্কৃতি' এবং তাঁর আরও অনেক গল্প যেন এক একটি মহামূল্য রত্ন। বঙ্গভারতীর মুকুটে চিরকাল তারা দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে। শরৎচন্দ্রের মাতুলরাও —উপেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিলেন। এঁদের কতকগুলি ছোটগল্প অপরূপ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার অবকাশ নেই।

এঁদেরই যুগের আরও কয়েকজন শিল্পীর নাম মনে পড়ছে। প্রথমেই মনে পড়ছে বঙ্গসাহিত্য-সংসারের দাদামশাই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব স্পষ্ট ভাবে পড়ে নি। তাঁর গল্প বলবার নিজস্ব একটা ধরন ছিল। তাঁর লেখার সরসতা, রসিকতা, অনুপ্রাস, রঙ্গব্যঙ্গ সবই তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় দীপ্ত। তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালীদের—বিশেষ করে চাকুরিজীবী বাঙালীবাবুদের নিয়েই গল্প

লিখেছেন। তাদের দুঃখে তিনি দুঃখী ছিলেন। তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যেই লেখনী ধারণ করেছিলেন তিনি শেষ বয়সে। কৃতকার্য যে হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর 'আমরা কি ও কে' তাঁর 'হিসেব-নিকেশ' তাঁর 'সন্ধ্যা-শঙ্খ' প্রভৃতি ছোটগল্পের বই বাংলা সাহিত্যে যে নূতন সুর বাজিয়েছে, যে অভিনব সরস স্বাদ রেখে গেছে তা সহৃদয় রসিক পাঠকমাত্রেই চিরকাল উপভোগ করেন। তিনি প্রাচীনপন্থী ছিলেন। তাঁর 'থাকো' গল্পটি অধুনালুপ্ত একান্নবর্তী পরিবারের অমর চিত্র। 'থাকো' ঐ পরিবারের কর্ত্রী। 'থাকো' মহিমময়ী। কিন্তু 'থাকো'রা আব নেই, অবলুপ্ত হয়েছে। তাঁর 'আই হ্যাজ', 'পাওনা' 'কোষ্ঠির ফলাফল' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাসও এককালে খুব নাম করেছিল। দাদামশায়ের সঙ্গে নাম করছি আর একজন গল্পলেখকের, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর 'স্বয়ংসিদ্ধা' উপন্যাস খুব বিখ্যাত হয়েছিল। তিনি কয়েকটি সুন্দর গল্পও লিখেছিলেন। শিশুসাহিত্যের গল্পলেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারও বোধহয় এঁদের সমসাময়িক। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'ঠানদির থলে', 'চারু ও হারু' বইগুলি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব অর্জন করেছে। এঁদেরই সঙ্গে উল্লেখ করছি আর একজন প্রবীণা লেখিকার। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প লেখিকা ইনি। তাঁর 'সোনা রূপা নয়' 'আরাবল্লীর কাহিনী' পড়ে শুধু যে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয় একটি শুচিস্নিগ্ধ বাঙালী মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাঙালী গৃহস্থ ঘরের অনেক ছবি তো এঁকেছেনই, রাজপুতানার পাঞ্জাবের নর-নারীদেরও ডেকে এনেছেন বাঙালীর অঙ্গনে, উদ্বাস্তুদের মর্মান্তিক রূপ ফুটিয়েছেন তাঁর 'সেই ছেলেটা' গল্পে। তিনি বৃদ্ধা হয়েছেন তবু তাঁর কাছে আমাদের আরও অনেক প্রত্যাশা।

ডক্টর সুকুমার সেন এক জায়গায় লিখেছেন—'বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভালো গল্প লিখেছেন ও লেখেন এমন সাহিত্যিকদের খুব অভাব নেই। তাঁদের অনেকের গল্পে নিজস্বতা আছে তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে বাংলা ছোটগল্পে সুস্বাদের ও সুবাসের

বৈচিত্র্য কম। তাদের কেউ কেউ জলের মতো ঘুরে ঘুরে অথবা দক্ষিণ হাওয়ার মতো ফিরে ফিরে চমৎকার ভাবে একই কথা কন। সেই এক-কথার একতারা দোতারাতেই তাঁদের মহিমা।'

ডক্টর সেনের মতো বিদগ্ধ সুরসিক যা বলেছেন তা কিছু কিছু লেখকের সম্বন্ধে হয়তো নৃত্য, কিন্তু আমরা যখন সমগ্রভাবে বাংলা ভাষার ছোটগল্পের বিচার করব তখন একথা আমাদের মানতেই হবে যে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পর আসরে নানা সুরের আলাপ করেছেন নানা জাতের শিল্পীরা। সেখানে এক সুর বাজে নি। বহু বিভিন্ন সুরের ঝংকার সেখানে।

দাদামশায়ের সমসাময়িক বা কিছু পরে আরও কয়েকজন অতি শক্তি-শালী ছোটগল্প লেখকের আবির্ভাব হয় বাংলা সাহিত্যে। প্রথমেই নাম করছি স্বীয় বিশিষ্ট দ্যুতিতে দ্যুতিমান পরশুরামের। রসায়ন শাস্ত্রে পণ্ডিত, বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানির কর্ণধার রাজশেখর বসু যখন বঙ্গসাহিত্যে পরশুরাম রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল একটা। তাঁর 'কচি সংসদ' 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেট', 'ভুশণ্ডীর মাঠ' প্রভৃতি গল্প বাঙালী পাঠকের মনে যে অভিনব রসের পসরা বহন করে আনল তা অপূর্ব, তা অতুলনীয়। পরিশীলিত ব্যঙ্গরঙ্গ ছাড়াও তাঁর গল্পগুলিতে আছে পরিচ্ছন্নতার রসবৈদগ্ধ্যের জ্যোতি এবং যথাযথ বাকভঙ্গীর কৌশল। বোঝা যায় যে তিনি একজন বিজ্ঞানী এবং প্রথম শ্রেণীর কলাবিদ বলেই অবান্তর অত্যাবশ্যক বস্তুকে পরিহার করে অনায়াস সাবলীলতায় লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছেন। তিনি অনেক গল্প লিখেছেন, সব কটিই রসোত্তীর্ণ গল্প। তবে তিনি কেবল গল্পই লেখেন নি, অভিধান সঙ্কলন করেছেন রামায়ণ মহাভারতের সহজপাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। মেঘদূতের সুন্দর অনুবাদ করেছেন সরল গদ্যে, প্রবন্ধও লিখেছেন অনেকগুলি। কবিতাও লিখেছেন কয়েকটি। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী। পুরাণের পরশুরামের কুঠার ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করেছিল। বাংলা সাহিত্যের পরশুরাম ব্যঙ্গের কুঠার দিয়ে সমাজের ন্যাকামি বোকামি পেজোমি ভণ্ডামিকে আঘাত করেছেন বারবার।

এরপর নাম করতে হয় রোমন্টিক লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর। তিনি কম লিখেছেন। কিন্তু লিখেছেন যা চমৎকার। তাঁর 'রমলা' উপন্যাস এবং তাঁর অনেক ছোটগল্প অতীতের অন্ধকারে রঙিন আলেয়ার মতো আজও আমাদের মনকে টেনে নিয়ে যায়। তাঁর সৃষ্টি স্বল্প, কিন্তু সমুজ্জ্বল। এঁরই সমসাময়িক বোধ হয় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তাঁর 'মেঘনাদ' এককালে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আমাদের প্রচলিত যৌন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিনি, অপরাধ বিজ্ঞান বিষয়েও তাঁর কয়েকটি সুন্দর গল্প আছে। রমেশচন্দ্র সেন এঁদের সমসাময়িক। অতি সুন্দর প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প লিখেছেন ইনিও।

এঁদের যুগেই শাণিত কৃপাণের মতো আর একজন লেখকের এবং কার্টুনিস্টের আবির্ভাব ঘটেছিল। ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁর আশ্চর্য ছোটগল্প 'নরকের কীট' আর 'সিরাজীর পেয়ালা'। বনবিহারী অপরাজেয় ব্যঙ্গদৃপ্ত যোদ্ধা ছিলেন। আর একজন বিশিষ্ট লেখকের নাম মনে পড়ছে। জগদীশ গুপ্ত। তাঁর গল্প বলবার নিজস্ব একটি শৈলী ছিল। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের যুগের লেখক হয়েও তিনি তাঁর স্টাইলের স্বকীয়তায় মুগ্ধ করেছিলেন আমাদের। 'সবার শেষে গয়া' প্রভৃতি গল্প তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য চিরকাল প্রস্ফুটিত করে রাখবে বাংলা সাহিত্যে। এই সময় আর একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর—শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উৎকৃষ্ট গল্পকার রূপেও আবির্ভূত হন বাংলা সাহিত্য-সংসারে। তিনি ছোট ছেলেদের জন্যই গল্পই লিখেছিলেন প্রথমে। তাঁর 'রাজকাহিনী' 'ক্ষীরের পুতুল' 'শকুন্তলা' 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি অমর শিশুগ্রন্থগুলি ছাড়াও বড়দের জন্যও তিনি একটি অদ্ভুত গল্পসংগ্রহ রেখে গেছেন—'পথে বিপথে'। 'পথে-বিপথে'র গল্পগুলি অদ্ভুত রসের গল্প। তার সঙ্গে মিশেছে ভৌতিক গল্পের স্বাদ। রহস্যগল্পের আমেজ। এ রকম গল্প বাংলা সাহিত্যে নেই। অবনীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য বইগুলির উল্লেখ করতে গিয়ে আর দুজন বড় প্রতিভাবান শিল্পীর কথা মনে পড়ে গেল। এঁদের নাম আগেই উল্লেখ করা উচিত ছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং তাঁর ভ্রাতা কুলদারঞ্জন। এঁদের দানও গল্পসাহিত্যে প্রচুর।

উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির' গল্প 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' প্রভৃতি গল্প চিরকাল মহিমান্বিত হয়ে থাকবে আমাদের সাহিত্যে। কুলদারঞ্জনও অনেক ভালো গল্প লিখেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের মতো এঁরাও উঁচুদরের চিত্রকর ছিলেন। শুনেছি ব্লক নির্মাণে এঁরাই পথিকৃৎ। এঁদের সঙ্গেই মনে পড়ছে সুখলতা রাওয়ের কথা। ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক ভালো গল্প লিখেছিলেন ইনি। উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায়ের কথাও এখানে উল্লেখ করছি। তিনিও শিশুসাহিত্যে একজন দিকপাল লেখক। তাঁর 'হযবরল' বইটির আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর 'পাগলা দাশু' এবং 'আবোল-তাবোল'ও অপূর্ব সৃষ্টি। 'আবোল-তাবোল' ছন্দে লেখা অদ্ভুত গল্পের আনন্দভাণ্ডার। এই সঙ্গে মনে পড়ল শিশুসাহিত্যের অবিস্মরণীয় লেখক বিশ্রুতকীর্তি যোগেন্দ্রনাথ বসুর নামও। তিনি এঁদের পূর্ববর্তী ছিলেন। আর একজন জনপ্রিয় গল্প-লেখিকা প্রভাবতী দেবীসরস্বতী। অনেক গল্প লিখেছেন এককালে। নানা রকম গল্প। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই এঁর আবির্ভাব ঘটে। শরৎ-সাহিত্যের প্রভাব এঁর লেখায় সুস্পষ্ট।

শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই আরও অনেকগুলি শক্তিমান লেখক ভিড় করেছিলেন বঙ্গবাসীর মন্দির প্রাঙ্গণে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী পরলোক গমন করেছেন। বেঁচেও আছেন অনেকে। কালানুক্রমিক ভাবে এঁদের বাণী-অর্চনার তালিকা করতে পারলাম না। যেমন যেমন মনে পড়ছে বলছি। প্রথমেই পরলোকগত শিল্পীদের নাম করছি। সর্বপ্রথম মনে পড়ছে রবি মৈত্রের নাম। বিখ্যাত নাটক 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র স্রষ্টা ইনি। প্রথম শ্রেণীর অনেক ছোটগল্প লিখে গেছেন। তাঁর একটি ছোটগল্প সংগ্রহের বই আছে। নাম 'থার্ড ক্লাস'। গল্পগুলি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস। সেকালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় 'দধিকর্দম' নাম দিয়ে অনেক রম্যরচনাও লিখেছিলেন। বিরাট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অকালে মারা গেলেন।

এর পর মনে পড়ছে বুড়োদার নাম—যাঁর পোশাকী নাম প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। মহাস্থবির জাতকের অমর স্রষ্টা ইনি। অনেক ভালো ভালো

ছোটগল্পও লিখেছেন। একটি গল্পসংগ্রহের কথা মনে পড়ছে—'স্বর্গের চাবি'। তাঁর গল্প বলার একটা স্বকীয় মজলিশি ধরন ছিল। তিনি মানুষটিও ছিলেন মজলিশি। যে আসরে যেতেন সেই আসরকেই মাতিয়ে তুলতেন বুড়ো দা। তাঁকে হারিয়ে আমরা সত্যিকার একটি স্রষ্টা রসিক সহৃদয় মানুষকে হারিয়েছি।

এর পর মনে পড়ছে বিভূতির কথা, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'পথের পাঁচালি', 'আরণ্যক', 'ইছামতী'র অলোকসামান্য কবি বিভূতিভূষণ অনেক আশ্চর্য ছোটগল্পও লিখেছিলেন। তাঁর অনেকগুলি গল্প সংকলন আছে। আমি কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের নাম করছি শুধু—'কিন্নর দল', 'পুঁইমাচা', 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প', 'মেঘমল্লার', 'বিপদ', 'তুচ্ছ', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ'—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার নাম করব বুঝতে পারছি না। তাঁর বৈশিষ্ট্য তিনি শুধু মানুষকেই ভালো-বাসেন নি, প্রকৃতিকেও ভালোবেসেছিলেন। পরলোক সম্বন্ধেও গভীর ঔৎসুক্য ছিল। তাঁর উপন্যাস 'দেবযান' এই ঔৎসুক্যের আশ্চর্য রস-সমৃদ্ধ ফল একটি।

এর পর মনে পড়ছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শরদিন্দুর অনন্যতা তার রোমান্টিক ঐতিহাসিক গল্পগুলিতে, তার ডিটেকটিভ গল্পগুলিতেও। ইংরেজি ভাষায় যেমন শার্লক হোমস, পাইরো—বাংলা ভাষায় যেমনি ব্যোমকেশকে অমর ক'রে রেখে গেছে সে। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যও অনেক চমৎকার গল্প লিখেছে সে। কবিতাও চমৎকার লিখতো। ব্যঙ্গকবিতায় তাঁর দান অসামান্য। শব্দের চয়নে, শৈলীর বৈশিষ্ট্যে, ভাষার কারুকার্যে সুনিপুণ এই গল্পকারের 'জাতিস্মর', 'চুয়াচন্দন' প্রভৃতি বই চিরকাল রসিক সমাজে সমাদৃত হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। নাট্যকারও ছিল সে, ভালো অভিনেতাও ছিল। এ যুগে ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্তও একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী।

এর পর বলছি, সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম। শরদিন্দুর অনেক আগেই মারা গেছে সে। রবি মৈত্রের মতো সতীনাথেরও প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিল সতীনাথ। সে ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র এবং

বহুভাষাবিদ্। তাঁর বড়গল্প 'জাগরী' তুমুল আলোড়ন জাগিয়েছিল একদা। তার 'ঢোঁড়াই-চরিত-মানস', তার 'অচিন রাগিণী' এবং আরও অনেক সুন্দর সুন্দর গল্পের জন্য বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সে গল্পের আসরে। আর একজন প্রতিভাবান লেখককে আমরা কিছুদিন আগেই হারিয়েছি। টেনিদার স্রষ্টা সুনন্দের জার্নালের লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুব জনপ্রিয় লেখক ছিলেন একজন। তাঁর উপন্যাস 'উপনিবেশ' নামকরা বই। তাঁর ছোটগল্প—'টোপ', 'আইসক্রীম', 'পূর্বরাগ', আরও অনেক হাসির ও ব্যঙ্গের গল্প অমর করে রাখবে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে। ছোটগল্প সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইও লিখেছেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন, লেখক মহলেরও প্রিয়-সুহৃদ ছিলেন তিনি। এই প্রিয়দর্শন প্রতিভাবান লেখকের অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

এর পর মনে পড়ল সজনীকান্ত দাস ও নরেন্দ্র দেবকে। গল্প লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধ না হলেও এঁদের দুজনেরই অনেক ছোটগল্প আছে। সজনীকান্ত দাসের 'কলিকাল' চমৎকার গল্পসংগ্রহ একটি। 'মেবার পতন', 'পা', 'কৌপীন', 'দেখে যা পাগলী' প্রভৃতি গল্পগুলি অনবদ্য। নরেন্দ্র দেবের 'সুহাসিনী' চমৎকার হাসির গল্পসংগ্রহ। নরেন্দ্র দেবই প্রথম ছোটগল্প লেখকদের একশত টাকা পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন।

এর পর উল্লেখ করছি সেই লেখকটির নাম, যিনি হঠাৎ সেদিন ছেড়ে চলে গেছেন আমাদের। যাঁর শোকের ক্ষত এখনও সারা দেশের মনে দগ দগ করছে। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর একটি অবিনশ্বর নাম। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি বঙ্গবাসীর সেবা করে গেছেন। উপন্যাস, ছোটগল্প নাটক—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার সমুজ্জ্বল দীপ্তি আমাদের মুগ্ধ করেছে, বিস্মিত করেছে। যদিও তিনি বিশেষ একটা অঞ্চলের লোকদের নিয়েই গল্প লিখেছেন বেশি কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি রসোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে চিরন্তন মানবতার শাশ্বত সুখদুঃখের সুর বেজেছে। অনেক উৎকৃষ্ট ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। কয়েকটির নাম করছি। প্রশস্ততর

আলোচনা করবার সুযোগ নেই এই প্রবন্ধে। তাঁর 'জলসা ঘর', 'তিন শূন্য', 'অগ্রদানী', 'বন্দিনী কমলা', 'মাটি', 'না', 'বেদেনী', 'মাছের কাঁটা', 'তমসা' এবং আরও অনেক গল্প বঙ্গসাহিত্যের গৌরব হয়ে চিরকাল বিরাজ করবে। তিনি শুধু বাস্তব রসের কারবারীই ছিলেন না জীবনের রূপক রহস্যও তাঁর রসচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করত। তারাশঙ্কর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—

"তারাশঙ্কর জীবনকে আর একরূপে উপভোগ করেন—তিনি

Night, the shadow of light
And life the shadow of death.

এই দুয়ের রহস্য মিশাইয়া দেখিতে চান। তাঁহার কল্পনায় প্রকৃতির নিয়মই মানুষের নিয়তি নয়···তারাশঙ্করের সকল উৎকৃষ্ট রচনায় এই ইঙ্গিত-মূলক প্রদর্শন আছে। সেই রূপক-রস-সঙ্কেত আছে; কোন যুক্তি-তন্ত্র, কোন থিয়রি বা মতবাদ কোন কিছুর ঘোষণা তাহাতে নাই। ···এই দৃষ্টি তাঁহার ছোট গল্পগুলিতে প্রায়ই সার্থক হইয়াছে।"

তারাশঙ্করের সমকালীন অনেক প্রসিদ্ধ লেখক এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে পরলোকগত আরও চারজন লেখকের কথা সংক্ষেপে বলব। অকালমৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রতিভাধর লেখক ছিলেন। তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মা নদীর মাঝি' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি যে অনন্য শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সে শক্তির পরিচয় তাঁর অনেক ছোটগল্পেও আমরা পাই। তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ-দুঃশাসন', 'আর না কান্না' প্রভৃতি গল্প-শাশ্বত সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। আর একজন—অমলা দেবী। বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক ললিত গুপ্তর ছদ্মনাম অমলা দেবী। ইনিও অনেক ভালো ভালো গল্প লিখেছেন। তাঁর লেখা 'ন্যাড়া' গল্পটি মনে এখনও দাগ কেটে রেখেছে। অনেক ছোটগল্প লিখেছেন, উপন্যাসও লিখেছেন কয়েকটি। তৃতীয় জনের নাম—ভাস্কর। জ্যোতির্ময় ঘোষ তাঁর আসল নাম। পেশায় অধ্যাপক। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কিছুদিন।

সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরস চমৎকার মূর্ত হত তাঁর লেখা ছোটগল্পে। চতুর্থ ব্যক্তি—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মধুর গল্পগুলি অপূর্ব অনবদ্য।

তারাশঙ্করের সমসাময়িক যে সব গল্প-লেখক এখনও পর্যন্ত জীবিত আছেন তাঁদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় বোধহয় ক্ষুদু দা—শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়। প্রখ্যাত ব্যঙ্গপত্রিকা শনিবারের চিঠির প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তাঁর লেখা গল্পগুলিতে নূতন ধরনের ব্যঙ্গরসের আস্বাদ পাই আমরা। 'আনন্দবাজার' নামক পুস্তকে তাঁর কয়েকটি অনবদ্য ব্যঙ্গগল্পের সন্ধান পাবেন রসিক পাঠক-পাঠিকারা। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে ইংরেজি লেখক ওড্‌হাউসকে মনে পড়ে যায় বার বার। বয়সের হিসেবে এর পরই নাম করতে হয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে প্রচুর প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প লিখেছেন। উপন্যাসও লিখেছেন অনেক। এখনও লিখছেন। তাঁর সৃষ্ট রানু, বাদল, গণশা আর তার বন্ধুদের কে না চেনে? তারা আমাদের আপনজন হয়ে গেছে। বিভূতিবাবু উচ্চ কোটির শিল্পী। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবার স্থান এই ছোট প্রবন্ধে নেই। এইটুকুই শুধু বলছি তাঁর সৃষ্টির বিশালত্ব দেখে বিস্মিত হয়ে গেছি। সম্প্রতি 'লেখা' পত্রিকায় লিখছেন 'প্রচুর ও দুর্লভ', চমৎকার লেখা। এই যুগে 'সম্বুদ্ধ' নাম দিয়ে অধ্যাপক অমূল্য দাশগুপ্ত চমৎকার কয়েকটি গল্প লিখেছেন। কান্তিবাবুর গল্পগুলি অনবদ্য। এঁদের সমসাময়িক আরও কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর গল্প-লেখকের সকলেই প্রায় বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু এখনও লেখনী সংবরণ করেন নি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কয়লা কুঠির' গল্প লিখে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আঞ্চলিক সাহিত্যের ঐশ্বর্য-মহিমার দিকে। আরও অনেক ভালো ভালো গল্প লিখেছেন শৈলজানন্দ। তাঁর যেমন সুন্দর হস্তাক্ষর তেমনি মিষ্টি গল্পগুলি। তাঁর 'অতসী মামী', 'অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর', 'কাঞ্চন মূল্য', 'ভয়', 'সত্য-মিথ্যা', 'শাশুড়ী-বৌ' এবং আরও অনেক গল্প বাংলা গল্পসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে রাখবে। সিনেমা-ডিরেকটার হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি এককালে। সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ফসিল' নামক গল্প-সংগ্রহে প্রথম প্রমাণিত করেছিলেন যে তিনি

কত বড় ছোটগল্প লেখক। তারপর তিনি অনেক গল্প উপন্যাস লিখেছেন। প্রত্যেকটিতে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি। এখন তিনি আনন্দ-বাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখেন।

এর পর পর-পর তিনটি নাম মনে পড়ছে—বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বুদ্ধদেব বসু ছোটগল্প লেখক হিসাবে তত প্রসিদ্ধ নন, তিনি মূলত কবি। ঘরেতে ভ্রমর এলো—তাঁর নাম করা ছোটগল্পের বই। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুও অনেক ভালো ভালো ছোটগল্প লিখেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমার এঁরা দুজনেও কবি এবং আমার মনে হয় কবি বলেই এত সুন্দর ছোটগল্প লিখেছেন তাঁরা। নানারকম অপূর্ব গল্প লিখেছেন দুজনেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিকে 'পাঁক' লিখেছিলেন, শেষের দিকে 'সাগরসঙ্গম' লিখেছেন। দুটি গল্পেই তাঁর শক্তিমত্তা প্রকাশিত। আরও অনেক ভালো ভালো গল্প লিখেছেন প্রেমেন্দ্র। ঘনাদার স্রষ্টা তিনি। ডিটেকটিভ গল্প, শিশুদের জন্য গল্প দুঃসাহসের গল্প, অনেক প্রবন্ধ, অনেক কবিতা, অনেক উপন্যাস তাঁর প্রতিভার মহিমা বিকীর্ণ করছে বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে। তাঁর পুন্নাম, জনৈক কাপুরুষের কাহিনী, হয়তো প্রভৃতি গল্প অনুপম। অচিন্ত্যকুমারও সাহিত্যজীবনের প্রথমে লিখেছিলেন—'বেদে' এখন তিনিই মহাপুরুষ চরিত্র-মহিমার বেদ পাঠ করছেন। উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর দ্যুতিমান প্রতিভার পরিচয়। অনেক গল্প লিখেছেন তিনি। প্রত্যেক গল্পেই তাঁর স্বকীয়তার পরিচয়। প্রথম যে ছোটগল্পটি লিখে তাঁর খুব খ্যাতি হয়েছিল সে গল্পটির নাম 'দুইবার রাজা'। কিন্তু বঙ্গবাণীর দরবারে বহুবার রাজা হয়েছেন তিনি তাঁর অনন্য প্রতিভার দৌলতে। মুন্সেফ হিসাবে অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তার প্রমাণ তিনি সমুজ্জ্বল ভাবে রেখে গেছেন—'কাঠ খড় কেরাসিন', 'আসমান জমিন' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে, তাঁর 'শত গল্প' বইটি বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য গল্প-সমাহার। নানা রসের গল্প আছে ওতে। তার ওই বইয়ের ভূমিকায় তিনি ছোট গল্প সম্বন্ধে যে যে উক্তি করেছেন—"পরিমাণ বোধ

হচ্ছে ছোটগল্পের নিরিখ। সংস্কৃত সাহিত্যে যাকে বলেছে 'লাঘবান্বিত' অর্থাৎ 'বিস্তর দোষ শূন্য'—চাই সেই সংযম, চাই সেই নিবৃত্তি"—এই উক্তি অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে সার্থক সমুজ্জ্বল করেছেন কৃতী শিল্পী অচিন্ত্যকুমার। তাঁর বাকভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যও মুগ্ধ করে আমাদের।

প্রমথনাথ বিশীও এ যুগের একজন যুগন্ধর শিল্পী। তিনি সুযোগ্য অধ্যাপক বহুমুখী প্রতিভা তাঁর। উপন্যাস, ছোটগল্প, ব্যঙ্গকবিতা, প্রেমের কবিতা, রম্য-রচনা, নাটক, প্রবন্ধ সবই চমৎকারভাবে লিখেছেন তিনি। তাঁর ছোটগল্পগুলি ব্যঙ্গধর্মী। অনেকে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের G. B. S. বলেন। G. B. S. -এর কিন্তু এমন বহুমুখী প্রতিভা ছিল না। প্রমথনাথের কলমের এমনই যাদু যে নীরস জীবনীকেও তিনি ছোটগল্পের স্বাদে মণ্ডিত করেছেন। তাঁর 'চিত্র চরিত্র' বইটি অনন্য। এর পরই মনে পড়ছে বিরূপাক্ষের নাম। আসল নামটি সর্বজন পরিচিত —বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তিনি তাঁর অপরূপ কয়েকটি ছোটগল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী অন্তঃপুরের যে সত্য চিত্র উদঘাটিত করেছেন, নির্মল হাস্যরসের মাধ্যমে যে শিল্প সৃষ্টি করেছেন তাঁর তুলনা খুঁজে পাই না। তাঁর 'ঝঞ্ঝাট' 'নিদারুণ অভিজ্ঞতা' প্রভৃতি বইগুলি নিজস্ব মহিমায় উদ্ভাসিত। তিনি নিজে নাট্যকার এবং নাট্য-প্রযোজক। তাই তাঁর লেখাগুলিতে নাটকীয় গুণও প্রচুর পরিমাণে আছে। এঁরই প্রায় সমসাময়িক—বোধ হয় কিছু অগ্রবর্তী—লেখক স্বনামধন্য শিবরাম চক্রবর্তী। শিশু-সাহিত্যের আসরে অট্টহাসির ভট্টারক তিনি। বঙ্গবাণীকে যে অলঙ্কারগুলি তিনি পরিয়েছেন তা যদিও 'পান'এ ভরতি কিন্তু অলঙ্কারগুলি রমণীয়। বড়দের জন্যও 'অল্প-বিস্তর' লিখেছেন তিনি। এখন তো প্রকাণ্ড একটি উপন্যাসই শুরু করেছেন। ভাবলে অবাক লাগে এককালে ইনি চমৎকার প্রেমের কবিতা এবং আধ্যাত্মিক কবিতা লিখতেন।

এ যুগের একজন সেরা গল্প লিখিয়ে মনোজ বসু। তাঁর এমন একটি মন-ভোলানো মিষ্টি স্টাইল যে পড়লেই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এই স্টাইলেই ফুটে উঠেছে তাঁর অনন্যতা। অনেক ছোটগল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন। 'নিশিকুটুম্ব' 'জলজঙ্গল' যেমন মনোহারী, তেমনি

মনোহারী ছোটগল্পগুলি। 'মাথুর', 'কুম্ভকর্ণ', 'বনমর্মর', 'লালচুল', 'রায়রায়ানের দেউল' প্রভৃতি গল্প তাঁর শিল্পপ্রতিভার আলোকে ঝলমল করছে। চিরকাল করবে।

এর পর বলছি প্রবোধকুমার সান্যালের কথা। তিনি ভবঘুরে লোক। অনেক চমৎকার ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে' একদিন অনেক পাঠক-পাঠিকার মনে আলোড়ন এনেছিল। গল্প উপন্যাসও লিখেছেন অনেক। বিশেষ একটি জোরালো ভঙ্গী আছে তাঁর। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি তিনি সুনিপুণ শিল্পকৌশল নৈবেদ্যের মতো স্থাপন করেছেন বঙ্গবাণীর মন্দিরে। এঁর একটা আশঙ্কা —নিত্যপরিবর্তনশীল কালের তরঙ্গে হয়তো বা তাঁর নৈবেদ্য ভেসে যাবে। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি যেখানে সত্যদ্রষ্টা শিল্পী সেখানে তিনি অমর। তাঁর 'নীচের তলায়', 'মূলমন্ত্র', 'আত্মাজ্ঞান', 'সিংহাসন' প্রভৃতি গল্প রসিক সমাজকে চিরকালই আনন্দ দেবে। তাঁর 'তুচ্ছ' যে উচ্চমূল্যের শিল্প এ কথা তারা চিরকালই বলবে।

আরও কয়েকজন শক্তিশালী প্রতিভাবান গল্পলেখক আছেন এ যুগে। পরিমল গোস্বামীর একটি বিশিষ্ট সম্মানিত স্থান আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আসরে। তিনি বর্তমান যুগের জীবিত ও মৃত বহু সাহিত্যিকদের, অভিনেতাদের, চিত্রকরদের, সাংবাদিকদের স্মৃতিকথার ভাণ্ডারী। তার স্মৃতিচারণগুলি অপূর্ব শিল্পসুষমা-মণ্ডিত। যুগান্তর পত্রিকায় 'এককলমী' নামে যিনি প্রতি সপ্তাহে 'ইতশ্চেতঃ' লেখেন তিনি এই পরিমল গোস্বামীই। ছোটগল্প লেখাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। সূক্ষ্ম হাস্য এবং ব্যঙ্গরসই তাঁর রচনার মূল সুর। উইট এবং হিউমার এ দুটিরই প্রচুর নিদর্শন তাঁর রচনায়। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে মনে পড়ে লিককৃকে, মার্ক টোয়েনকে। তাঁর ছোটগল্পের বই 'মারকে লেঙ্গে', 'ঘুঘু', 'বুদ্‌বুদ', 'শুভ বিবাহ' প্রভৃতি বইগুলি খুবই উপভোগ্য। 'ঘুঘু' বইটি ছোট ছোট নাটকের সমষ্টি। কিন্তু প্রত্যেকটি ছোট নাটকই ছোটগল্পের স্বাদবাহী। এই হাস্যরসের প্রসঙ্গে মনে পড়ল দাদাঠাকুরকে এবং তাঁর জীবনীকার নলিনীকান্ত সরকারকে। দাদাঠাকুর মুখে মুখে

অসংখ্য সরস গল্প বলে বেড়াতেন পরিচিত মহলে। নলিনীদা তার কিছু সংগ্রহ করে রেখেছেন। নলিনীদা নিজেও একজন স্রষ্টা—তাঁর 'হাসির অন্তরালে' বইটি তাঁর প্রতিভার গৌরব বহন করছে। যদিও বইটি ঠিক ছোটগল্পের বই নয়, তবুও এতে ছোটগল্পের আস্বাদ প্রচুর পাবেন রসিক পাঠক-পাঠিকারা। এই যুগের আর একজন লেখক মৌলানা খাফী খান। 'যদ্দৃষ্টং' নামে একটি সুন্দর ব্যঙ্গগল্পের বই লিখেছিলেন। শুনেছি প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট পিসিয়েলের ছদ্মনাম খাফী খান। ঠিক জানি না। 'যদ্দৃষ্টং'-এর গল্পগুলি কিন্তু অপূর্ব।

প্রায় এই সময় একজন তরুণী লেখিকা আশালতা সিংহ 'অমিতার প্রেম' নামে একটি গল্প লিখে অনেকের কৌতূহল জাগিয়েছিলেন। অতি-আধুনিকতার ধ্বজা বাহিকা ছিলেন ইনি। অনেক গল্প লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাও পেয়েছিলেন। এখন আর লেখেন না, সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছেন। এখন নাম আশাপুরী। আরও একজন সর্বজনবিদিতা আশা আছেন বঙ্গসাহিত্যে—আশাপূর্ণা দেবী। 'রাজুর মা' গল্পটিতে তাঁর প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর অনেক ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মেজ বউ। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের মেয়েদের দুঃখ বেদনা সমস্যা শিল্পসুষমায় প্রস্ফুটিত তাঁর গল্পগুলিতে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি সম্মার্জনী হস্তে সমাজ সংস্কারে নেমেছেন কিন্তু রসিক পাঠক-পাঠিকারা তাঁর প্রতিভার দ্যুতিটা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন গল্পগুলিতে।

এইবার উল্লেখ করছি 'লৌহকপাট' খ্যাত জরাসন্ধর। বাংলা সাহিত্যে নানারকম 'পেশা'র প্রভাব পড়েছে। ডাক্তার-ডাক্তারি-জীবনের গল্প বলেছেন, উকীল বলেছেন ওকালতি জীবনের। পুলিসের লোক পুলিস জীবনের নানা কাহিনী শুনিয়েছেন। পঞ্চাননবাবুর অপরাধ-বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট গল্পগুলি সত্যই মনোরম। জরাসন্ধ ছিলেন কারাধ্যক্ষ। তিনি বলেছেন কয়েদীদের গল্প। আর কি চমৎকার করেই না বলেছেন। তাঁর 'লৌহকপাট' তাঁর 'তামসী' যদিও কয়েদীদের নিয়ে লেখা তবু তারা চিরন্তন মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রুর শিল্পান্বিত

প্রকাশ বলেই উঁচুদরের সাহিত্য হয়েছে। তাঁর অনেক ছোটগল্প আছে, তাঁর হ্যাংম্যানের গল্পটিতো অপূর্ব।

এপিক উপন্যাস-লেখক প্রাবন্ধিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ও চমৎকার ছোটগল্প লিখেছেন কিছু—তাঁর 'কন্যা', 'তৃষ্ণার জল' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলিতে এমন কতকগুলি গল্প আছে যা অনন্যতায় স্বকীয়তায় বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। আর একজন এপিক উপন্যাস-লেখক বিমল মিত্র ছোটগল্পতেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'কন্যাপক্ষ' নামক সংগ্রহের গল্পগুলি চমৎকার। তাঁর ছোটগল্প 'বেনারসী' সুন্দর ছোটগল্প একটি। অনেক ছোটগল্প লিখেছেন ইনি। এখনও লিখে যাচ্ছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলি আর একটি স্মরণীয় সুরসিক অনন্য সাহিত্যিকের নাম। এঁর বাচন-ভঙ্গী, বৈদগ্ধ্য, দেশবিদেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এঁর বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিভার সমন্বয় এঁকে বাংলা সাহিত্যের আসরে একটি গৌরবময় স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। মজলিশি মেজাজের লেখক ইনি। গল্পের আসরেই হোক, বা উপন্যাসের দরবারেই হোক, বা রম্যরচনার বৈঠকেই হোক যেখানেই বসেন সেখানেই মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন সকলকে। এঁর রম্য-রচনাগুলি ছোটগল্প কিনা এ বিচারে আমি প্রবৃত্ত হব না। শুধু বলব ওগুলি পড়েও ছোটগল্প পড়ার আনন্দ পেয়েছি। ওঁর 'ময়ূরকণ্ঠী' 'পঞ্চতন্ত্র' ওঁর 'দেশেবিদেশে' ওঁর 'শবনম্' এবং ওঁর আরও অনেক বই রসিকসমাজে সমাদৃত হবে চিরকাল।

আর একটি লেখকের নাম করছি এবার—অবধুত। মরুতীর্থ হিংলাজ, উদ্ধারণপুরের ঘাট প্রভৃতি উপন্যাস লিখে সহসা যিনি খ্যাতির শিখরে উপনীত হন তিনি অনেক সার্থক ছোটগল্পও লিখেছেন। তাঁর লেখার বিস্তৃত সমালোচনা করবার স্থান নেই এখানে। শুধু এইটুকু বলব শক্তিমান লেখক তিনি একজন। তাঁর ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে রসের ভিয়ানে চড়িয়ে তিনি যে মোদক প্রস্তুত করেছেন তা রসিকজনের চিত্তামোদী। তিনি সব সময়ে মিষ্টরস পরিবেশন করেন নি। ভয়ঙ্কর রস, বীভৎস রসও পরিবেশন করেছেন। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে কখনও বোদলেয়ার, কখনও এড্‌গার অ্যালেন পোকে মনে

পড়েছে। শক্তিশালী লেখক অবধূত ছোট বড় অনেক গল্প লিখেছেন। এঁর সঙ্গে মনে পড়ছে ভ্রাম্যমাণ চিত্রকর প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়কে। ভ্রমণকাহিনী বলতে বলতে অনেক সুন্দর ছোটগল্পও শুনিয়েছেন তিনি আমাদের। এই প্রসঙ্গে আরও একজন সার্থক ভ্রমণকাহিনী লেখককেও মনে পড়ছে। রম্যানি বীক্ষ্য গ্রন্থমালার লেখক শ্রীসুবোধ চক্রবর্তীও তাঁর ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে ছোটগল্পের স্বাদ পরিবেশন করেছেন অনেক জায়গায়। ছোটগল্প বহুরূপী। তার বাঁধা ধরা কোনো রূপ নেই, বাঁধা ধরা কোনো আঙ্গিক নেই। তা ছোট একটি কারুকার্য বা খেলনা হতে পারে আবার উড়ন্ত ফানুসও হতে পারে। ছোট পুঁটি এবং বিরাট তিমি তুজনেই ছোট গল্পের পর্যায়ে পড়ে। প্রজাপতি ছোটগল্প, হাতীও ছোটগল্প।

বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ও ছোটগল্প লিখেছেন অনেক। কিন্তু লিখেছেন নাটকের আঙ্গিকে। বাংলা সাহিত্যে একাঙ্কিকা তিনিই বোধ হয় প্রথম লিখেছিলেন। তাঁর প্রত্যেক একাঙ্কিকাই চমৎকার ছোটগল্প একটি। এই যুগের বৈশিষ্ট্য, এই যুগে অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প-লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। আরও তুজন সার্থক ছোটগল্প-লেখকের নাম করে এ যুগের উপর যবনিকা পাত করছি। এঁদের একজন হলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আর একজন সুমথনাথ ঘোষ। এঁরা তুজনে যদিও আবাল্য বন্ধু, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যুগল কর্ণধার তবু এঁদের তুজনের লেখায় কিন্তু মিল নেই। গজেন্দ্রকুমার মিত্র শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারায় নূতন নূতন ঢেউ তুলেছেন। 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং' এবং আরও অনেক গল্পসংগ্রহে শহর, শহরতলীর এবং পল্লী-গ্রামের নরনারীর ভিড়। এঁদের যে শিল্পরূপ এঁকেছেন গজেন্দ্রকুমার তাতে তাঁর অনন্যতার ছাপ আছে। সুমথনাথ কিন্তু তাঁর সার্থক গল্প-গুলিতে অন্যরকম সুর বাজিয়েছেন। ব্যাধিগ্রস্ত মানসিকতা morbid সাইকোলজি—তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির উপজীব্য। এই কঠিন বিষয়কে তিনি শিল্পসুষমায় ভূষিত করেছেন। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

এ যুগের পর আধুনিক যুগ, তারপর অতি আধুনিক। এ তুটি যুগেও

অনেক প্রতিভাবান লেখক লেখিকাদের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু অনেকের সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয় নি এখনও। সেজন্য তাঁদের সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করতে পারব না। করা উচিতও নয়, কারণ তাঁরা এখনও লিখছেন, তাঁদের সম্পূর্ণ রূপ এখনও উন্মোচিত হয় নি। একটি কথা শুধু বলব। বাস্তবের নাম দিয়ে যাঁরা নোংরামিকে সাহিত্যের আওতায় এনে হাজির করেছেন নগ্নভাবে, তাঁদের জানা উচিত যে রসোত্তীর্ণ না হলে কোনো কিছুই সাহিত্যে টিকবে না। আদিরসের অনেক গল্প বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে সেগুলো প্রকৃত শিল্প রসান্বিত বলে। কাঁচা খিস্তি কোনো দিনই কিস্তি মাত করতে পারে নি। নগ্ন বাস্তবের শ্রীহীন বর্ণনা খবর হতে পারে, বিজ্ঞান হতে পারে, কিন্তু কাব্য হবে না কস্মিন্ কালেও। কাব্যে রূপ চাই, কল্পনার লালিত্য চাই, লাঞ্ছিত অসহায় মানব মনকে আশ্বাস দেবার ক্ষমতা থাকা চাই। শুধু অশ্লীলতা আর অসভ্যতা, বিষ্ঠা এবং জঞ্জালের স্তূপ মক্ষিকা জাতীয় পাঠক-পাঠিকাদের কিছুক্ষণের জন্য আকর্ষণ করবে হয়তো, কিন্তু ভদ্র রসিক পাঠক-পাঠিকারা ওসবের ধার কাছ দিয়েও যাবেন না কোনো কালেও। আধুনিক এবং অতি আধুনিক যুগের নাম-করা লেখকদের কথা ভাবতে গিয়েই প্রথমেই মনে পড়ল 'অচল পুত্রে'র সম্পাদক দীপ্তেন সান্যালকে। অকালে মারা গেছে। অনেক সম্ভাবনা ছিল, হঠাৎ নিবে গেল। তাঁর ব্যঙ্গ-প্রখর লেখনী কয়েকটি ভালো ছোটগল্প লিখেছিল। এর পরের যুগের কিংবা বোধহয় সমসাময়িক, কয়েকজন শক্তিমান শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, দীপক চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সমরেশ বসু, বাণী রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মহাশ্বেতা দেবী, রমাপদ চৌধুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, লীলা মজুমদার, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, কুমারেশ ঘোষ, ইন্দ্র মিত্র, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, রূপদর্শী, সত্যজিৎ রায়, দিব্যেন্দু পালিত, দীপেন রাহা, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, মতি নন্দী প্রভৃতি। এঁরা এখনও লিখছেন, এঁদের সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আলোচনা করবার সময়ও নেই করা উচিতও নয় বোধহয়

কারণ এঁদের সম্পূর্ণরূপ এখনও অপ্রকাশিত। তবে যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয় বাংলা ছোটগল্পের আসরে এঁরা নূতন সুরই বাজাবেন আধুনিকতার গীটারে।

এই প্রবন্ধে সম্ভবত অনেকের নাম বাদ পড়েছে তার কারণ আমার স্মৃতির বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা। এখন হঠাৎ মনে পড়ল আবর্তের লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম। 'মুমূর্ষু পৃথিবী'র লেখক হীরেন্দ্র-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম, 'দৃষ্টিপাতে'র লেখক যাযাবরের নাম আর 'একদা'র লেখক গোপাল হালদারের নাম। এঁরা চারজনই বাংলা সাহিত্যের সার্থক কথাশিল্পী।

এইবার ছোট্ট একটি কবিতা পড়ে বক্তব্য শেষ করি। কবিতাটি ছোটগল্প বিষয়েই।

নদীর বুকে আলোর ঝলক,
গালের উপর চূর্ণ অলক,
মুচকি হাসি, ত্রস্ত পলক,
হলদে পাখীর 'টিউ'
বর্ষা-ঘন রাত্রি নিবিড়,
'দেশ' রাগিণীর সুমিষ্ট মীড়,
গঙ্গা ফড়িং, বিহঙ্গ নীড়,
টিকিট কেনার 'কিউ'
জোনাকীদের নেবায় জ্বলায়
রূপসীদের ছলায় কলায়
প্রতিদিনের থামায় চলায়
ছোট গল্প আছে
পাহাড় কভু, কখনও মেঘ,
কখনও থির, কখনও বেগ,
কান্না কভু, কভু আবেগ
বিদ্যুতেরি নাচে
এই আছে এই নেই,

ধরতে গেলে বদলে যে যায়
একটি মুহূর্তেই !
ছোটগল্প বহুরূপী
শিল্পী-স্বয়ম্বরা
তাদের কাছেই মাঝে মাঝে
দিয়ে ফেলেন ধরা
গৃহস্থ হন বন্য
আমরা তখন মহানন্দে
করি ধন্য ধন্য ।

আধুনিক কবিতা

কবিতার দু'রকম বিশেষণ হতে পারে, ভালো কিংবা মন্দ, রসোত্তীর্ণ কিংবা রস-ভ্রষ্ট। কবিতার আগে আধুনিক বিশেষণ ঠিক মানায় না। আধুনিক ফুল, আধুনিক মেঘ, আধুনিক ঊষা শুনলে হাসি পায়, তেমনি আধুনিক কবিতা শুনলেও পাওয়া উচিত। কিন্তু পায় না। ওটা আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে—আধুনিক কবিতাটা যোগরূঢ় শব্দের মতো একটা বিশেষ অর্থও বহন করে আজকাল। এই আধুনিক কবিতা নিয়েই কিছু আলোচনা করব আজ। এ আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগেই একটি অপ্রিয় সত্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত মনে করি। উৎকৃষ্ট কবি বা শিল্পী যেমন বিরল, উৎকৃষ্ট রসিকও তেমনি। কাব্য বা শিল্পের মূল্য নির্ণয় করবার ক্ষমতা আমাদের সকলের নেই, এ ক্ষমতা বিধাতা সকলকে দেননি। সব পাথরই কষ্টিপাথর নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করতে পারে না। সংসারে বিদ্বান্,

বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন, কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছেড়ে নলের গলায় মালা দিয়েছিলেন তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর সকলকে বাদ দিয়ে কেবল রসিকের সন্ধান করে থাকেন। সমালোচক বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে বলেন, আমিই সেই রসিক। প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না, কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক ব'লে জেনেছে সংসারে এ অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না।

এইজন্য কবি এবং শিল্পীরা বড় অসহায়। তাঁরা তাঁদের সাধনার ধনকে নিবিড় আনন্দকে, বর্ণাঢ্য কল্পনাসম্ভারকে—বস্তুত তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সেই বাজারে আনতে বাধ্য হন, যেখানে অরসিক সবজান্তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আগেই বলেছি, প্রকৃত কবির মতো প্রকৃত রসিকও বিরল। মনের দিক থেকে রসিকও কবির সমপর্যায়ের লোক, প্রকৃতপক্ষে তিনিও কবি। কবি না হ'লে কবির সম্যক মর্যাদা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। Neckar-এর উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

> To love one that is great is almost to be great one's self:

আর একজন বিদেশীয় রসিক Joubert বলেছেনঃ

> You will find poetry nowhere unless you bring some with you.

সুতরাং কোনও কাব্যজিজ্ঞাসার প্রথমেই আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে—শুধু এই সত্যটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আরও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বঙ্গসাহিত্যে আধুনিক কবিতার ভগীরথ মাইকেল মধুসূদন দত্তও দুর্বোধ্যতার জন্যে নিন্দিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালও তাঁদের অভিনবত্বের জন্য অনেক নিন্দা সহ্য করেছেন। আধুনিক কবিদের কবিতাতেও অভিনবত্ব আছে—এক রকম অদ্ভুত ধরনের অভিনবত্ব; কিন্তু তা দেশের রসিকসমাজের মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অনেক সমালোচকের সম্মুখীন হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু একদল

রসিক বরাবরই ছিলেন যাঁরা ওঁদের মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ছিলেন, সমালোচনার নিষ্ঠুর বাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন তিনি। তাই নূতনকে তিনি বারবার উদাত্ত আহ্বানও জানিয়েছেন তাঁর নানা লেখায়, কিন্তু তিনিও এই আধুনিক কবিতাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি। এ সম্বন্ধে তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু যা লিখেছেন তাতে আধুনিক কবিদের গর্ব করবার মতো কিছু নেই। একটা প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

তারা যে বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত।···ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে, বলে, আসল জিনিসটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

পৃথিবীতে মানব-সমাজে চিরকালই একটা "ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া" অংশ আছে, তার চেহারা যুগে যুগে বদলেছে ; অবশ্য তা নিয়ে অনেক কবি ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছেন নানা ছাঁদে, কিন্তু সেইটেই জীবনের একমাত্র রূপ, তাছাড়া যে জীবনে আর কিছুই নেই, এই হতাশা—বিদ্বেষপূর্ণ সিনিসিজম্ আগে কোনও প্রতিভাবান্ কবিদের কাব্য-দর্শনের একমাত্র বিষয় হয়নি। এই আধুনিক কবিরা সমসাময়িক নিতান্ত ক্ষুদ্র একটা গণ্ডীতে আবদ্ধ হ'য়ে দুর্বোধ্য ভাষায় যা বলেছেন তা দুর্বোধ্য বলে আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছে রসিকসমাজে। অলডাস্ হাক্সলিও একজন সিনিক্ লেখক, তিনি তিক্ততার নানা পঙ্কে বারবার আবর্তিত হয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যেই ডুবে যাননি একেবারে। নিজেকেই আবার নিয়ে গেছেন অন্য একটা আদর্শলোকে এবং শেষ পর্যন্ত "যা তাঁর উপহাসের বস্তু" ছিল—তাই হয়েছে তাঁর পরম নির্ভর"। তিনি বারবার নিজেকে এবং নিজের প্রতিভাকে যাচিয়ে দেখেছেন তাঁর নানা সৃষ্টির মধ্যে। ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ অলডাস্ হাক্সলি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

এই স্বতঃবিরোধের হাত থেকে কোন কালেই তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁর এককালীন প্রিয় লেখক ব্লেইকের ভাষায়, Without contraries there is no progression, বৈপরীত্য বিনা প্রগতি কোথায়?"[১]

বস্তুত সব সৃষ্টিধর্মী জীবন্ত কবি-মানসে এই বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ কাব্যসৃষ্টি মানে—আত্মানুসন্ধান, সত্য-শিব-সুন্দরের নাগাল পাওয়ার শিল্পমণ্ডিত প্রয়াস—সুতরাং সে সন্ধানে এবং সে প্রয়াসে বৈপরীত্য আসবেই। আজ যা সত্য বলে মনে হয় কাল তা মিথ্যা হয়ে যায়—এরই শিল্পায়িত প্রকাশের নামই কাব্য। এক হিসেবে এই ক্ষত-বিক্ষত বিভ্রান্ত কবি-মানসই আধুনিকতার বাহক। তাই এলিয়ট দান্তে ও শেক্সপীয়রকে আধুনিকতার দিকপাল বলে বর্ণনা করেছেন—যদিও দান্তে মধ্যযুগের কবি এবং শেক্সপীয়র রেনেসাঁস যুগের নাট্যকার:

Dante and Shakespeare divide the modern world between them ; there is no third.—T. S. Eliot, Dante. P. 51[২]

আজকালকার সাময়িক পত্রে আধুনিক কবিদের যে সব দুর্বোধ্য কবিতা প্রকাশিত হয়, যাদের কবিতা না বলে হেঁয়ালি বলাই উচিত, তাতে সত্য-সন্ধানের বা বিপ্লবী-মনের কোনও প্রকাশ যদি বা থাকে তা যে কোন গুহায় নিহিত তা খুঁজে পাওয়া যায় না। ওসব কবিতা অনেকটা ধাঁধার মতো। মেদিনীপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় বহুদিন আগে এ সম্বন্ধে আমি আলোচনা করেছিলাম। তাতে বলেছিলাম—এগুলো জিগ্‌'স-পাজ্‌লের মতো, অনেক মাথা ঘামাবার পর একটা কষ্ট-কল্পিত অর্থ সে-সব থেকে বার করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তা চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে না, চিত্তকে ঠিক সেই লোকে নিয়ে যায় না যেখানে যাওয়ার জন্যই আমরা কবিতা পড়ি, যেখানে যাওয়ার জন্যই রসিকচিত্ত

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২০, সংখ্যা ৪—'অলডাস্ হাকস্‌লি' প্রবন্ধ।
২. শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ, 'মহাকবি দান্তে ও আধুনিক মন'—বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২২, সংখ্যা ৩।

সম্ভত উন্মুখ। এ দলের অনেকে বলেন উচ্চাঙ্গের গান বা ছবি বুঝতে হ'লে মনকে যেমন বিশেষভাবে তৈরি করতে হয়, এ ধরনের কবিতার মর্ম বুঝতে হলেও তাই করতে হবে। এঁরা আরও বলেন বীজ-রূপে এসব কবিতার মধ্যে নাকি অনেক সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, বিশ্লেষণী-শক্তি-সম্পন্ন সুধীই কেবল তার অবগুণ্ঠন মোচন করতে পারবেন। অশিক্ষিত লোকও উচ্চাঙ্গের গান শুনে বা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়, হয়ত সে তার সম্পূর্ণ রস পায় না, কিন্তু চমৎকৃত যে হয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। তাজমহল, ইফেল টাওয়ার বা পিরামিডের সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার জন্য স্থাপত্য-বিদ্যা-পারঙ্গম হওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না। উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি মাত্রেরই এমন একটা সহজবেদ্য স্বতঃস্ফূর্ত রূপ আছে যা সকলের চিত্তকে স্পর্শ করে। রসিকের চিত্তকে তো নিশ্চয়ই করে। তা কোনও শিক্ষা বা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। বিশ্লেষণ করলে উষর মরুতে বা ধূসর পাংশুস্তূপেও জলকণা পাওয়া সম্ভব, কিন্তু ওই জলকণাটুকুতেই রসিকের আনন্দ হয় না, যেমন হয় নির্ঝরিণীর ছন্দ-মুখর নৃত্যে, তরঙ্গিণীর উর্মিলীলায়, সমুদ্রের বিরাট আন্দোলনে বা ফুলের উপর কম্পমান শিশিরবিন্দুতে। কবিতার যদি সহজবেদ্য সাবলীলতা না থাকে তাহলে তার কিছুই রইল না। সন্দেশ বলে যা মুখে দিলাম তা যদি বিস্বাদ হয় এবং নানা রকম ব্যখ্যার সাহায্যে যদি বুঝতে হয় যে আমার রসনার সাক্ষ্য মিথ্যা, ওর মধ্যে প্রচ্ছন্ন মিষ্টত্বের যে উপাদান প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেটাই বড় সত্য—তাহলে সে ব্যাখ্যায় আর যেই সন্তুষ্ট হোন রসিকরা হবেন না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা ছোট ছোট বড়ির মধ্যে সমস্ত ভিটামিন এবং শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় আরও নানা রকম রাসায়নিক পদার্থের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তা সেবন করে রোগীর হয়তো উপকার হয়, কিন্তু খাদ্য-রসিকের তাতে আনন্দ নেই। তার আনন্দ টাটকা সুস্বাদু খাবারে। কবিতা নাম-ধারী এই দুর্বোধ্য হেঁয়ালিগুলি রসিকের মনের জন্যে সে খাবার সরবরাহ করতে পারে না। এদের প্রধান দোষই এদের দুর্বোধ্যতা। সন্দেহ হয়, যেন ইচ্ছে করে দুর্বোধ্য করা হয়েছে। এইসব দোমড়ানো মোচড়ানো অর্থহীন ছন্দোহীন কিম্ভূতকিমাকার অসম্বদ্ধ

বাক্যাবলীর অন্তরালে একটা চেষ্টাকৃত প্রয়াস আছে বলে সন্দেহ হয়। স্বীকার করতেই হবে এরা অনন্য, কিন্তু সে অনন্যতা রসোত্তীর্ণ হয়নি।

এসব কবিতা লেখা খুব সোজা। যেখানে ছন্দ মিল এমন কি অর্থেরও দায়িত্ব নেই সেখানে পর পর কতকগুলো শব্দ সাজিয়ে গেলেই আধুনিক কবিতা বলে যা সাধারণত ছাপা হয় তার অনুরূপ কিছু একটা খাড়া করা মোটেই শক্ত নয়। অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশাই বেঁচে ছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন খুব। একবার তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়ে গেল। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার কোনও একটা বিশেষ সংখ্যা (পূজা সংখ্যা বা দোল সংখ্যা ঠিক মনে পড়ছে না এখন) শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তাঁরা আমার কাছে আগেই লেখা চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি লিখে উঠতে পারিনি। সুরেশবাবু আমাকে বললেন:

"আমাদের লেখা পাঠাও নি কেন?"

"সময় পাই নি। আমাকে ডাক্তারিও তো করতে হয়।"

"ঐসব কিছু শুনব না। একটা লেখা চাই-ই। আমি বলছি, আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি তোমাকে, একটা লেখা লিখে দাও।"

"বললাম, অত কম সময়ে, 'আধুনিক কবিতা' ছাড়া তো আর কিছু লেখা যাবে না।"

"বেশ, তাই লিখে দাও।"

আমি যে কবিতাটি লিখেছিলাম তা লিখতে আমার আধঘণ্টাও লাগেনি। আনন্দবাজার পত্রিকায় সেটি প্রকাশিতও হয়েছিল, এর জন্যে গোটা পঁচিশেক টাকা দক্ষিণা পেয়েছিলাম এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এ কবিতার প্রশংসা করে দু'চার জন পাঠক আমাকে চিঠিও লিখেছিলেন। কবিতাটি এই—নাম 'জেমস্ জইস্'—

নীল টুকরো জানলার জাফরি খানায়
কাশ্মীরী শাল, বাতাবি, চাবির রিং
ফিকে হাসি। মেস জানে, সে জানত না

আদা কবীর আর কাদা কাদা ঘি
চলাতে হবে
জাবালি ছিল এসে—এবং—উপরন্তু কমা
নতুন ছি-ছি-অ্যানাটমি সেমিকোলনের
কবে কবে বলছি নাকচ তাবৎ দুর্ধর্ষ
শ্যাম্পেন চুণকাম ফিরিস্তি বালুশাই
যাচ্ছে যাচ্ছে
নবীন বাদামী পুরু কবুলতি-কশাই
রিকসা, গণিকা নিরন্তর অস্থি-লোপ
চব্বিশ ঘণ্টা, ঘণ্টা চব্বিশ ওলটানো
ফাঁকি কিনারা ইশারা পঁচিশ শিলিঙ্
চলেছে সে।

এ ধরনের অনেক আধুনিক কবিতাই সাময়িক পত্রের পাতায় আপনারা দেখতে পাবেন। সাহিত্যের মেলায় এরা যেন 'কিউরিও', অথচ সে 'কিউরিও' রসোত্তীর্ণ আর্ট নয়।

স্বনামধন্যা বিদেশিনী লেখিকা ভার্জিনিয়া উলফ তাঁর 'লীনিং টাওয়ার' প্রবন্ধে এই জাতীয় লেখকদের উদ্ভবের কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা সাহিত্য-স্রষ্টা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পিতৃধনে শিক্ষালাভ করে পিতৃবিত্তে নির্ভরশীল হ'য়ে আভিজাত্যের উচ্চমিনারে আরোহণ করেছিলেন। সেই উচ্চমীনার থেকে তাঁদের দৃষ্টি ও কল্পনা জীবনের ও সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল তাই ছিল তাঁদের সাহিত্যের প্রধান মূলধন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্যন্ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু যুদ্ধ বাধতেই সেই মীনারের ভিত্তিতে আঘাত লাগল। মীনারটি আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ক্রমশ হেলে পড়তে লাগল। এই হেলে-পড়া মীনার-চূড়ায় যে-সব লেখক লেখিকা বসে' আছেন তাঁরা সেখান থেকে নামতেও পারছেন না, সেখানে

বসে' স্বস্তিও পাচ্ছেন না। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশ বক্র হয়ে যাচ্ছে, সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাঁরা আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এই অস্বস্তির কারণ তাঁরাও সেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ফল—এই ভেবে আত্মধিক্কারেও তাঁদের চিত্ত পরিপূর্ণ, আত্মবিশ্বাসও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং সত্য-শিব-সুন্দর প্রেম-ক্ষমা-ত্যাগ কোনও কিছুতেই তাঁরা আর আস্থা রাখতে পারছেন না। সবই তাঁদের বিচারে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাঁদের বিকৃত বিপর্যস্ত মনের বক্রী পরিচয় তাই তাঁদের রচনাতেও বর্তমান। তাঁদের লেখা কবিতাতে তাই ছন্দ মিলের বালাই নেই, অর্থও নেই।

যুদ্ধোত্তর বিদেশী লেখকদের এই বিভ্রান্তি আমাদের দেশের লেখকদের মনেও সঞ্চারিত হয়েছে। তার ফলে নাস্তিক্যবাদ, অর্থহীন গদ্যকবিতা, মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস, মহৎকে বৃহৎকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা, নিছক পশুত্বকে নগ্নরূপে প্রকাশ ক'রে সেটাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমর্যাদা দেবার আগ্রহ, এইসব লেখকদের রচনায় দেখা দিয়েছে। তাঁদের এই অনুকরণে বিস্মিত হবার কিছু নেই। উনবিংশ শতাব্দীর দিক্‌পাল বাঙালী সাহিত্যিকরাও এ কাজ করেছেন। মিলটন, হোমার, টাসো মাইকেল মধুসূদনকে, স্কট বঙ্কিমকে এবং বায়রন নবীনচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। কেউ কেউ বললেন শেলী কীটসের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরও নাকি পড়েছিল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, নাট্যকার অমৃতলাল এবং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের উপরও শেক্সপীয়র, মলেয়ার প্রভৃতির প্রভাব অনেকে লক্ষ্য করেছেন। বিদেশের দ্বারে এ দেশের অনেক লেখক এখনও নূতন প্রেরণার জন্য ধরনা দিয়ে থাকেন। এই অতি আধুনিক বিদেশী কবিদের প্রেরণা যদি মিলটন, হোমার, টাসো, স্কট, বায়রন, শেলী, কীটস, শেক্সপীয়র মলেয়ারের প্রেরণার মতো সবল সুস্থ উজ্জ্বল হ'ত তাহলে আমাদের সাহিত্যে একটা নূতন সুর বাজত, কিন্তু এখন যা বাজছে তা নিতান্তই বেসুরো, কারণ যাদের অনুকরণ করা হচ্ছে তারাই যে সুরহীন। আর একটা কথা, অন্ধ অনুকরণ দ্বারা কখনও মহৎ সাহিত্য

সৃষ্টি হ'তে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর যেসব সাহিত্যিক দিক্‌পালদের কথা বললাম তাঁদের উপর বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু সে প্রভাব অনুকরণ নয়, সে প্রভাব তাঁদের প্রতিভাকে তাঁদের স্বকীয়তাকে প্রস্ফুটিত করেছিল—আলোর প্রভাব যেমন ফুলকে বিকশিত করে অনেকটা তেমনি।

তথাকথিত আধুনিক কবিতায় এই যে সুরহীনতা, ছন্দ-মিলের দায়িত্বকে অস্বীকার করে এই যে বিদ্রোহ, শাশ্বতকে ব্যঙ্গ করবার এই যে উদ্ধত হাস্যকর প্রয়াস, অর্থহীনতার মধ্যেই একটা অর্থ আরোপ করবার এই যে ব্যর্থ চেষ্টা—এইটেই অনেক আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য। একে একধরনের পাগলামিই মনে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে সব আধুনিক কবিরাই 'আধুনিক কবিতা' লেখেন না। অনেকে আছেন যাঁরা সত্যিকার কবিতা লেখেন। আধুনিক বিশেষণ লাগিয়ে তাঁরা একটা স্বাতন্ত্র্যের মহিমা দাবি করতে চান না। রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের পাগলামি-আধুনিকতাকে কিন্তু আধুনিক বলতে চাননি। আধুনিকতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

> আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

তারপর তিনি তথাকথিত আধুনিক কবিদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন ঃ

> বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এ-ও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্ত-বিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ী তালঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না ইনফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ. বাহ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

রবীন্দ্রনাথ এও বলেছেন যে আধুনিকতা কোনও বিশেষ কালের বিশেষ সম্পত্তি নয়। 'নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ'— এ কোনও বিশেষ কালের নয়। আধুনিকতার উদাহরণস্বরূপ তিনি উদ্ধৃত করেছেন হাজার বছরের প্রাচীন চীনের কবি লি-পো'র কবিতা।

অনেকে মনে করেন আধুনিক কবিতার এই কুশ্রী প্রলাপে আধুনিক ছন্নছাড়া যুগের উচ্ছৃঙ্খলতাই কাব্যরূপ লাভ করেছে। নিরুপায় আবদ্ধ পশুকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করলে তার বুক ফেটে যে বিকট আর্তনাদ উত্থিত হয়, আধুনিক কবিতা যেন সেই আর্তনাদ—তাই তাতে ছন্দের শিঞ্জন নেই। অলঙ্কারের মঞ্জুশ্রী নেই, তাই তাতে শোভনতা ও সৌষ্ঠবের অভাব—তা শুধু ছন্দ অর্থ বর্জিত নিষ্পিষ্ট নির্যাতিত মনের হাহাকার মাত্র। কিন্তু কবির হাহাকার আর পশুর হাহাকারে কি কোনও তফাত থাকবে না? কবিমন যখন নিষ্পিষ্ট নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয় তখন তার কবি-সত্তা বিদ্রোহ করে। তার বিদ্রোহ-বাণী রসিকচিত্তে সাড়া তোলে. তা অর্থহীন বাক্যের হেঁয়ালি-জাল বুনে ভুয়ো অভিনবত্বের ভেলকি দেখাবার চেষ্টায় নিজেকে হাস্যকর করে তোলে না। এইসব আধুনিক কবিতা মনকে নাড়া দেয় না, মনের উপর দাগ রাখে না। ইতিহাসের সাক্ষ্য মানলে স্বীকার করতে হয় যে মানব-সমাজ ইতিপূর্বেও বহুবার দুর্দশার কবলে পড়েছে—রাজার অত্যাচার, ধর্মের অত্যাচার, সমাজের অত্যাচার অনেকবার মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত পদদলিত করেছে—কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে এমন ছন্দ-মিল-অর্থহীন প্রলাপের সাক্ষাৎ তো পাই না। কবি মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নিজের আত্মকাহিনী লিখেছেন--সে আত্মকাহিনীতে অরাজকতার বিশদ এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই। অত্যাচারের ফলে তাঁকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল, তিনিও একদিন রিফিউজি হয়েছিলেন, এসবের বর্ণনা তাঁর কাব্যে আছে—কিন্তু আজকালকার আধুনিক কবিতার মতো অদ্ভুত

জিনিস তো সেখানে দেখি না। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্টে মিশর থেকে বিতাড়িত 'জু'দের অনেক মর্মন্তুদ কাহিনীর বর্ণনা আছে, কিন্তু তা আধুনিক কবিতার কিম্ভূতকিমাকার প্রকাশ নয়। তা সুস্থ সবল রসোত্তীর্ণ প্রকাশ—যার অর্থ বোঝবার জন্যে অঙ্ক কষতে হয় না। বাইরের জগৎ কবির অন্তরে প্রবেশ ক'রে কাব্যে রূপান্তরিত হয় এ কথা সত্য, সে জগৎ যদি কুৎসিত হতশ্রী হয় তাহলেও কবি তাকে কাব্যে রূপ দেন কিন্তু যিনি প্রকৃত কবি তাঁর অন্তরের মধ্যে এমন একটা কিছু দিব্য শক্তি আছে যার প্রভাবে কুৎসিতও সুন্দর হ'য়ে ওঠে, যা মর্মন্তুদ দুঃখকেও মর্মস্পর্শী কাব্যে রূপায়িত করতে পারে। মানুষ-কবির অন্তরে যে চিরন্তন স্রষ্টা বাস করেন, দুঃখ-অভিভূত মানবমনের মধ্যে বাস করেও যিনি নির্বিকার, যিনি সত্য-শিব-আনন্দময় তিনিই কবি। তাঁর রচিত কাব্যে ছন্দ-পতন নেই, বিশৃঙ্খলা নেই, অর্থহীনতা নেই। তাঁর রচিত ট্র্যাজেডিও রসিক-চিত্তে আনন্দলোক সৃষ্টি করে। শেলী বলেছেন ঃ

Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds.

শেলীর বাস্তবজীবন happy ছিল না। অনেক দুঃখকষ্ট দুর্ভাগ্যের ঝঞ্ঝায় তাঁর জীবন বারবার আন্দোলিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রথমশ্রেণীর কবি, কারণ তাঁর মধ্যে যিনি কবি ছিলেন তিনি ছিলেন নির্বিকার, happiest and best ঃ দুঃখের যন্ত্রণাও তাঁর কাব্যে তাই আনন্দশতদল হয়ে ফুটেছে। বাংলা সাহিত্য থেকেও এর উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন আমাদের মনে স্বাধীনতার চেতনা জেগেছিল, যখন আমরা বুঝতে পারছিলাম আমাদের আত্মসম্মান বিদেশী শাসকের পদতলে অহরহ নিষ্পিষ্ট হচ্ছে—তখন কিন্তু আমাদের নেতারা ভেবেছিলেন যে আবেদন-নিবেদন করেই বুঝি আমরা স্বাধীনতা পাব। রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা কিন্তু তখন এ কথা মেনে নেয় নি। আবেদন-নিবেদনের পিটিশন আর মীটিংয়ের হাস্যকর প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করে অনেক লেখা লিখেছেন তিনি সেকালে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা তাঁর 'দুরন্ত আশা' 'দেশের উন্নতি' 'বঙ্গবীর' প্রভৃতি কবিতা পড়লে বিক্ষুব্ধ

কবি-আত্মার আর্তনাদই শোনা যাবে—কিন্তু সে আর্তনাদ বোবা পশুর হাহাকার নয়। 'হুরন্ত আশা' থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি ঃ

ভদ্র মোরা শান্ত বড়ো পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান
দেখা হলেই মিষ্ট অতি—মুখের ভাব শিষ্ট অতি
অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি—গৃহের প্রতি টান।
তৈল ঢালা স্নিগ্ধ তনু—নিদ্রারসে ভরা
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালি সন্তান।

ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন
ছুটছে ঘোড়া, উড়ছে বালি জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন
বর্শা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন
... ...
নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন-উচ্ছ্বাসে
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন ছায়ে
সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে গুপ্ত গৃহবাসে।

তাঁর এ কবিতাই পরবর্তিযুগে সার্থক রূপ-পরিগ্রহ করেছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে। আধুনিক কবিতার প্রভাবে এরকম নেতাজীর আবির্ভাব হবে কি? ওসব দুর্বোধ্য হেঁয়ালী তো কারো মনে সাড়াই জাগায় না।

অত্যাচারের বিভীষিকার ভয় যে কত অলীক তা তিনি লিখে গেছেন তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতাটিতে। অত্যাচারের মধ্যেও অভয়বাণী শুনিয়ে

গেছেন দেশকে—তা হেঁয়ালী নয়। স্বচ্ছ, স্পষ্ট, কবিসত্তার উদাত্ত উদ্ঘোষণা :

দূর হ'তে ভেবেছিনু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।

পাঁজর উঠিল কেঁপে
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, "আরো কিছু আছে না কি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত ?"
নামিল আঘাত।
এই মাত্র ? আর কিছু নয় ?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে' নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোট হয়ে গেছে আজ
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও
তুমি তো মৃত্যুর মতো বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড় এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে'।

এই হ'ল সত্যিকার আধুনিক কবিতা—যা দুঃখের আবর্জনাস্তূপে নুয়ে বা নেতিয়ে পড়েনি—সহস্রদল সূর্যমুখীর মতো, জ্যোতির্মণ্ডিত পতাকার মতো, আকাশে মাথা তুলেছে—একদিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য।

রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে এবং রবীন্দ্রোত্তর অনেক কবির কাব্য থেকে এরকম অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায় যার থেকে আমরা বুঝতে পারি দুঃখ-হতাশা-অবিচার-অত্যাচারে কবির প্রতিভা নির্জীব হেঁয়ালীতে আত্মপ্রকাশ করেনি। করেছে উদ্দীপ্ত মহিমায়। কাজি নজরুলের ঃ

বল বীর,
চির উন্নত মম শির
শির নেহারি' আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।
মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ছেদিয়া
খোদার আসন আরশ ভেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর
মম ললাটে রুদ্র ভগবান-জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
বল বীর
চির উন্নত মম শির।

কিংবা কবি সত্যেন্দ্রনাথের ঃ

বুঝ-সমঝের বইছে হাওয়া গোলাম-সমঝ যাচ্ছে টুটে
সাবালকীর করছে দাবী সব দুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে
মুরুব্বিদের করছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চাবি
মানুষ বলেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি করছে দাবী।
তাবৎ জীবে শিব যে আছেন রুদ্র তিনি অবজ্ঞাতে
নিখিল ল'য়ে রন্ নারায়ণ পুণ্য পাঞ্চজন্য হাতে।
তাঁর সাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে
বিশ্বে নিকাশ-আখেরি আজ নূতন যুগে যুগের শেষে ;
চিনি বলে' চুন যে খাওয়ায় চলবে না তার সওদাগরী
নিখুঁত হিসাব তৈরী করো—রেখো না ভুল খাতায় ভরি'।

এসব কবিতা আধুনিক কবিতা—কিন্তু তা কুহেলিকাচ্ছন্ন ধাঁধা নয়—তা আত্মসম্মান-দীপ্ত কবি-মানসের নির্ভীক প্রকাশ।

অবশ্য একটা কথা আমি আগেও বলেছি আবার বলছি, সব আধুনিক কবিতাই হেঁয়ালী-ধর্মী নয়। অনেক আধুনিক কবিতার মানে বোঝা যায়, নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। এরকম কবিতাও অনেক লেখা হচ্ছে আজকাল। তাঁরা স্বয়ম্প্রভ—'আধুনিক' বিশেষণ লাগিয়ে তাঁদের মাহাত্ম্য বাড়াবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

আধুনিক কবিতার উদ্ভবের দু' একটা যে কারণ আমার মনে হয়েছে—তা এইবার আমি নিবেদন করছি। প্রথম কারণ মনে হয় অনেক কবিরা সচেষ্ট হয়েছেন রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রভাবকে অতিক্রম করতে। রবীন্দ্রনাথ দু' পায়ে হাঁটতেন, তাঁর নকল করব না এই পণ করে যদি কেউ একটা পা মুড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শুরু করেন অথবা রবীন্দ্রনাথ মুখ দিয়ে খেতেন, মুখ দিয়ে খেলে রবীন্দ্রনাথের নকল করা হবে—এই ভেবে কেউ যদি নাক দিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা যেমন হাস্যকর হয়—এ-ও অনেকটা তেমনি হয়েছে। অ-রবীন্দ্রনাথ হওয়ার চেষ্টায় তাই হয়তো কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়েছেন অনেকে। যাঁরা সত্যিকার প্রতিভাবান তাঁরা কিন্তু এরকম করেন না। তাঁরা অন্যান্য কবিদের প্রভাব স্বীকার ক'রে, এমন কি তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েও নিজের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার উপরই অনেক কবির প্রভাব পড়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হ'তে পেরেছেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িক এবং রবীন্দ্রোত্তর অনেক কবির উপর রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রচুর প্রভাব পড়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজ নিজ মহিমায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছেন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিতার দরবারে। দু-একটা নমুনা দিচ্ছি। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ডায়মন-কাটা মল' ঃ

ঝমর ঝমাৎ ঝম্, ঝমর ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল
উঠিছে পড়িছে কি রে নামিছে উঠিছে কি রে
রূপ-হর্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে কোকিল কি ঝঙ্কারিছে
নিশুতির শান্ত গৃহে খুলিয়ে অর্গল

সুন্দরীর উচ্চ হাসি পেয়ে প্রাণ অবিনাশী
অবিরল ছুটে কি রে আনন্দচঞ্চল ?
ঝমর ঝমাৎ ঝম্ ঝমর ঝমাৎ ঝম্
কেন আজ প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল ?

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'দূরের পাল্লা' ঃ

ছিপ্‌খান তিন দাঁড় তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন ভোর ছ্যায় দূর পাল্লা
... ...
চুপ চুপ ওই ডুব ছ্যায় পানকৌটি
ছ্যায় ডুব টুপ টুপ ঘোমটার বউটি
ঝকঝক কলসীর বক বক শোন গো
ঘোমটায় ফাঁক রয় মন উন্মন্ গো।

কিংবা তাঁর 'বর্ষা' কবিতাটি ঃ

ওই দেখ গো আজকে আবার পাগলি জেগেছে
ছাইমাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই।
মাঠের পারে দাঁড়িয়ে ছিল ঈশান কোণেতে
বিশাল-শাখা পাতায় ঢাকা শালের বনেতে
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ওই পায়রাগুলোকে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মানুষ' ঃ

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুকু
জুটে নাই হেন বাস
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে রক্তমুখ
তুলিছে মাটির রাশ
যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্মের নির্ঝর

সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষ পরে
লক্ষ দুঃখ ঝড়
মাঝপথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি
থাক বা না থাক শ্রী
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের, কর গো নতি
তারা মানুষের স্ত্রী—

কাজি নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার' ঃ

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'বৃন্দাবন অন্ধকার' ঃ

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার
চলে না চল-মন্দানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ   ফুটে না বনে কুন্দ-নীপ
ছুটে না কলকণ্ঠ সুধা পাপিয়া পিক চন্দনার
বৃন্দাবন অন্ধকার ॥

কবি করুণানিধানের 'হারা' ঃ

তারই চুলের গোলাপ ফুলের শুষ্ক ধূসর পাপড়ি এই—
এই উপাধান শয়ন শিথান শূন্য আধেক সে আজ নেই।
চক্ষে আমার বক্ষে আমার মুখখানি সেই লুকিয়ে রাখা
এই বালিশের ঝালরগুলি তারই কালো অলক ঢাকা
যেখানটাতে রাখত মাথা চাইলে পরে পরান ফাটে
আধেকখানি শূন্য আজি, দীর্ঘ নিশীথ একলা কাটে।

এঁরা ছাড়াও অক্ষয়কুমার বড়াল, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং অনেকে ভালো স্বকীয়তাসমৃদ্ধ কবিতা লিখেছেন। এজন্য

তাঁদের কোন চেষ্টাকৃত প্রয়াস করতে হয়নি। তথাকথিত আধুনিক কবিতার লেখকরা যদি এই দুরূহ প্রয়াস ক'রে রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করতে চেয়ে থাকেন তাহলে এই কথাই বলব যে তাঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব-বর্জিত কবিতা হয়তো লিখেছেন, কিন্তু অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা সে সবের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন নি। অনেকের হাসিও পেয়েছে।

এই ব্যপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায় অবশ্য। তাঁদের এই উদ্ভট প্রয়াসের মধ্যে আমি অন্তত সেই জিনিসটা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি। এঁরা ছন্দ-মিলের বন্ধনকে ছিন্ন করে, অর্থের দাসত্বকে অস্বীকার করে হয়তো এমন কিছু করতে চাইছেন সব প্রতিভাবান লেখকরাই যা সর্বযুগে করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা তাই করতে চেয়েছেন যা নূতন, যা অভিনব, যা অনন্য। যে প্রেরণার বশবর্তী হয়ে আমরা আমাদের পোশাকে পরিচ্ছদে, আহারে বিহারে, নীতিতে নিয়মে নিত্য নূতনত্বের পক্ষপাতী, যে প্রেরণার আবেগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মিত্রাক্ষর ছন্দের শৃঙ্খল ছিন্ন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদাত্ত মন্ত্রে বঙ্গবাসীর মন্দিরকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করেছিলেন, যে আবেগ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'আলালের ঘরে দুলাল'-এর আঙ্গিক, বিষয়বস্তু অতিক্রম করতে বাধ্য করেছিল, যে প্রেরণায় রবীন্দ্র-প্রতিভা বারংবার পথ পরিবর্তন করে নিত্য নূতন রূপে বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃত করেছে—সেই প্রেরণাই হয়তো আধুনিক কবিতারও জননী। অনন্য, অপূর্ব কিছু করতে হবে এই হ'ল সৃষ্টি-ধর্মী মানব-প্রতিভার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। চিরাচরিত প্রথা তাঁরা মানতে চান না, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা—এই নীতিকে লঙ্ঘন করেই তাঁদের প্রতিভা যেন তৃপ্তি পায়। এই ধরনের একটা তৃপ্তির লোভেই তাঁরা হয়তো উদ্ভট বা অদ্ভুত হয়েছেন। তাঁদের সপক্ষে আর-একটা কথাও বলতে পারি। আষাঢ়ের আকাশে যখন নব মেঘোদয় হয়, যখন পেখম বিস্তার ক'রে ময়ূর নাচে, যখন পাপিয়ার সুরঝঙ্কারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে, যখন প্রকৃতির পত্র-পল্লবে, সমুদ্রে, নদীতে আকাশে সৌন্দর্যের বান ডাকে তখন আমরা কি ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্যে তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করি? তাদের রূপ উপভোগ করবার জন্য কি কোনও

অধ্যাপকের সাহায্য প্রয়োজন? অর্থ, ছন্দ, মিল প্রভৃতি কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে কি তাদের অপরিমিত শোভার পরিমাপ করা সম্ভব? বস্তুত আমরা আমাদের চারিদিকে যা দেখে সদাসর্বদা মুগ্ধ হই, তা স্বতঃই সুন্দর; তার জন্যে কোন টীকার প্রয়োজন নেই। শব্দ-বিন্যাসের নিপুণতায় তেমনি একটা অর্থাতীত সৌন্দর্য কেন সৃষ্টি করা যাবে না যা ব্যাকরণের ছন্দে নয়, নিজের মহিমাতেই সমৃদ্ধ? এই স্বপ্নাতুর অনন্যতা-কামী কবি হয়তো তাই এমন একটা লোকে উত্তীর্ণ হতে চান যেখানে কাব্যলক্ষ্মী উর্ণনাভের রূপ ধরে সোনালি জরি দিয়ে যে অপরূপ জাল বুনে চলেছেন। আর সে জালে ধরা পড়বার জন্যে সাধনা করছে মখমল কোমল অপরাজিতা গীটার বাজিয়ে ধূলিধূসরিত মাটির স্বর্গে—যে স্বর্গে শিমুল গাছ লাল শিমুল ফুলগুলোর পাশে বসে আছে শকুনির দল। অপরাজিতার গীটার বাজছেই, বাজছেই—হঠাৎ সে পতঙ্গ হ'য়ে গেল, উড়ে গেল সেই সোনালি জালের উদ্দেশ্যে। জানি না, এটা ঠিক আধুনিক কবিতা হ'ল কি না। হয়তো এমনি একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে আধুনিক কবিদের। কিন্তু এ কথাও বলব সে উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নি। এখনও আমরা তাদের কাব্য পাঠ করে সেই অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করি নি যা আমরা লাভ করি প্রকৃতির অবর্ণনীয় লীলালাস্যে। তাছাড়া অকৃত্রিম প্রকৃতির শোভা আমরা যে ভাবে উপভোগ করি সাহিত্যের শোভা আমরা ঠিক সে ভাবে উপভোগ করি না। সাহিত্য মানব-মনীষার কৃত্রিম সৃষ্টি, তাকে উপভোগ করবার আয়োজনও তাই কৃত্রিম। ভাষা অলঙ্কার ছন্দ মিল সবই কৃত্রিম—কিন্তু ওদের সহায়তা ছাড়া আমরা সাহিত্যের সৃষ্টিও করতে পারি না। সাহিত্য উপভোগও করতে পারি না। আধুনিক কবিতার ভাষা দুর্বোধ্য—এইটাই অনেক পাঠক-পাঠিকার কাছে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি আশা করে আছি। আমি জানি দুর্গম দুরূহ পথে সবুজের অভিযান চিরকাল চলবে, দুঃসহ দুর্গতির মধ্যেও সে চিরকাল স্বপ্ন দেখবে। যে অমৃতে তার ক্ষুধিত অন্তরের ক্ষুধা মিটবে তার সন্ধান

সে সর্বদা করছে, চিরকাল করবে। রাজনীতির হয়তো মৃত্যু হবে, কিন্তু কবির মৃত্যু নেই। ভবিষ্যতের অতিদূর চক্রবাল-রেখায় সে চিরকাল নব সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখবে। সেই আধুনিক, সেই অনন্ত। হয়তো সে একক, হয়তো সে আজ অজ্ঞাত, দরিদ্র, বিপন্ন, উপহসিত, তবু সেই অগ্রণী তার কণ্ঠেই সেই চিরন্তন সংগীত আবার নবীন সুরে বাজবে যে সংগীত চিরকাল রসিককে আনন্দ দিয়েছে, মানবসমাজে আশ্বাস দিয়েছে—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, অন্ধকার দেখে ভয় পেয়ো না। আমি জানি, অন্ধকারের পরপারেই আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ময় দেবতা আছেন। তাঁর ভাষা একদিন আমাদের বিস্মিত, রোমাঞ্চিত করবে—যেমন বিস্মিত করে অন্ধকারে আকাশ-ভরা নক্ষত্রপুঞ্জ। যেমন রোমাঞ্চিত করে বজ্রগর্ভ কৃষ্ণমেঘমালা।

বর্তমান যুগের আধুনিক কবিদের মধ্যেই হয়তো আত্মগোপন করে আছেন মহাপ্রতিভাবান সেই যুগন্ধর কবি—তাঁকে আজ নমস্কার করি। আমি জানি তিনি যে সরস্বতীর উপাসক তিনি বহুরূপিণী, মানে একটি প্রতিমাতেই তাঁর রূপ নিবদ্ধ নয়। যা আজ আমাদের কল্পনার বাইরে তা-ও হয়তো একদা তাঁর দিব্য প্রকাশে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করবে। যিনি অবাঙ্‌মানসগোচর তাঁকেই বাক্যে প্রকাশ করবার দুরূহ প্রচেষ্টায় কবিরা যুগে যুগে নিত্য নূতন আঙ্গিক উদ্ভাবন করেছেন। আমাদের আধুনিক কবিরাও সেই দুরূহ তপস্যায় ব্রতী—তাঁরা কেবলমাত্র তুচ্ছ ফ্যাশনের দাস নন—এই কথা ভেবে আমি আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করছি এবং এই কথা বলেই আজ আমার বক্তব্য সমাপন করলাম।

আমাদের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে

দেশ ভাগ ক'রে আমাদের স্বাধীনতার শুরু হয়েছিল। অসংখ্য অসহায় নিপীড়িত ধর্ষিত, লুণ্ঠিত উদ্বাস্তুদের আর্ত হাহাকারের পটভূমিকায় আমাদের স্বাধীনতার আগমনী সঙ্গীত গেয়েছিলাম আমরা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাহাত্মা গান্ধীকেও হারালাম। তারপর আমরা

বুঝলাম যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা ভদ্রলোকের স্বাধীনতা নয় তা গুণ্ডা মস্তান মতলববাজদের স্বাধীনতা। যাঁরা তোষামোদ পটু, যাঁরা তদ্বির করতে দক্ষ, যাঁরা ভোট-আহরণে ওস্তাদ, তাঁরাই এ স্বাধীনতার আনন্দ ষোল আনা ভোগ করতে লাগলেন। গদির লোভে অনেক রাজনৈতিক দল গজিয়ে পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগল, কপট দেশ-সেবার বক্তৃতার গর্জনে প্রকম্পিত হতে লাগল ভারতের আকাশ বাতাস। খুনোখুনিও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল শেষে। বিপন্ন হলেন ভদ্রলোকেরা, কারণ ভদ্রতা ছাড়া তাঁদের আর কোনও সম্বল নেই। দেখা গেল এ সম্বল নিয়ে এ বাজারে কিছুই করা যায় না। জঙ্গলের ভিতর আলো জ্বালালে যেমন নানারকম ছোটবড় পোকা এসে আলোটাকে ঘিরে ধরে, আমাদের দেশে তেমনি স্বাধীনতার আলোকে ঘিরে নানারকম পোকার ভীড় হল। সে ভীড়ে ভদ্রলোকেরা টিকতে পারলেন না। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ এত বেড়ে গেল, বাড়ির ভাড়া এমন আকাশ-ছোঁয়া হল যে সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই দুষ্কর হল মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পক্ষে। শিক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা পরীক্ষার সময় অবাধ টোকাটুকি করতে চাইছেন, সরকার সেটা রোধ করতে পারছেন না। ছাত্রছাত্রীদের হাতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নির্যাতিত হচ্ছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে যে সব খবর শুনতে পাই তাও খুব হতাশাজনক। তাঁরাও নাকি আর শিক্ষক নেই, রাজনীতির দালাল হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মেও প্রচুর গাফিলতি প্রকট হয়ে পড়েছে।

আমাদের স্বাধীনতার আমলে চীন আমাদের আক্রমণ করেছিল। তাতে আমাদের শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল। ভয় হয়েছিল চীনই বুঝি আবার আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে। কিন্তু তারা তা করেনি, ফিরে গিয়েছিল। তারপর আমাদের সামরিক শক্তি যে প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে তার প্রমাণ অবশ্য আমরা পেয়েছি পাকিস্তান যখন আমাদের আক্রমণ করেছিল সেই সময়। আমাদের জোয়ানরা আমাদের মানরক্ষা করেছিল, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছিল।

ইয়াহিয়া খাঁর অত্যাচারে পূর্ব-পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করল শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে। ইয়াহিয়া খাঁর বর্বর সেনারা যে অকথ্য পাশবিক অত্যাচার চালাল তার তুলনা ইতিহাসে মেলে না। অবশেষে আমাদের জোয়ানরা গিয়ে যোগ দিল ওদের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে, কারণ পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল। এ যুদ্ধে আমাদের জোয়ানরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আমাদের ইতিহাসে। আর স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আমাদের মাতৃস্বরূপিণী-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বুদ্ধিমত্তা, উদারতা এবং দূরদর্শিতার কথা। তিনিই এখন আমাদের আশা ভরসা। যদিও একথা সত্য যে এখনও এখানে অনেকেই সুখে জীবন যাপন করতে পারছেন না, তথাপি একথা মানতেই হবে যে সুদীর্ঘ পরাধীনতা আমাদের শোচনীয় চরিত্র-বিনষ্টি ঘটিয়েছে। তার সংশোধন এত সহজে এবং এত অল্প-সময়ে হওয়া সম্ভব নয়। বোকাদের পাকা রং এখনও অনেকেরই চরিত্রকে মলিন ক'রে রেখেছে। তাই এত কষ্ট।

এ সব সত্ত্বেও কিন্তু একটি সুখ আছে এখনও। এখনও আমরা স্বাধীন আছি, আর আশাকরি চিরকাল থাকব। স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্ররূপে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এটাও পরম আনন্দের কথা। স্বাধীন ভারতে সভ্য নাগরিকের মতো আমরা বাঁচতে চাইছি এইটেই পরম আশ্বাসের কথা। জানি মিথ্যার কুহেলীতে এখনও অনেকে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, জানি পক্ষপাতিত্বের কবলে এখনও অনেকে আমরা লাঞ্ছিত, জানি কল-কাঠি নেড়ে এখনও অনেক অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করছেন, জানি চোরাবাজারীদের কৌশলে আমাদের দেশের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিকল, জানি আমাদের বেকার-সমস্যা ভয়াবহ। আসুন আমরা শপথ করি সে এ সব আমরা দূর করবই। 'সত্যমেব জয়তে' এ মহাবাণী মিথ্যা হবে না। স্বাধীন ভারতবাসী একদিন জগতের গৌরব হবে। কবে যে শুভদিন আসবে জানি না, কিন্তু আসবেই। এই বিশ্বাস নিয়ে আসুন আমরা অগ্রসর হই। আমাদের বিশ্বাস যদি নিখাদ হয় সিদ্ধি আসবেই।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে প্রথমেই শরৎচন্দ্রকে আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক আরও অনেক প্রতিভাবান গল্প-লেখক ও কবি বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্মশতবার্ষিকী আমরা পালন করি না। আধুনিক কালে আমরা সাধারণতঃ উৎসব করি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুলকে লইয়া। মাইকেল মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা বৎসরান্তে একবার স্মরণ করি বটে, কিন্তু সে উৎসবে তেমন জৌলুষ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুল বাঙালীর চিত্ত হরণ করিয়াছেন, তাঁহারা অত্যন্ত জনপ্রিয় তাই তাঁহাদের লইয়া উৎসব করিতে বাঙালীর বড় আগ্রহ। এই জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সেই আগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল এত জনপ্রিয় মুখ্যত তাঁহাদের গানের জন্য। হৃদয়াবেগের এবং প্রেমের গানে বাঙালী যে সহজে মাতোয়ারা হয় ইহার প্রমাণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই মিলিবে। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি আমরা বাঙালী মনের প্রবণতা যদি বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে বাঙালী হৃদয় প্রেম-প্রবণ। প্রাচীন সহজিয়া গানে, বৈষ্ণব সাহিত্যে, গীতগোবিন্দে বাঙালী যেন এই প্রবণতার ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছিল। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এবং নজরুল-সঙ্গীতে একটু আধুনিক ঢঙে বাঙালী তাহাই আবার যেন আবিষ্কার করিয়াছে। তাই তাঁহারা এত জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে বিরাট সৃষ্টি করিয়াছে—সে সম্বন্ধে আমরা তত সচেতন নই। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার মূলেও ওই একই কারণ। নানারকম প্রেমের গল্পে শরৎ-সাহিত্য ভরপুর। শুধু যুবক-যুবতীর রোমান্টিক প্রেম নয়—বাৎসল্য এবং দাস্যভাবে যে প্রেম সুখস্পর্শী সে প্রেমের অমর ছবিও তাঁহার সাহিত্যে আছে। শুধু মানব-প্রেম নয়, স্বদেশ-প্রেমেও তাঁহার সাহিত্য সমুজ্জ্বল। জীবের প্রতি প্রেমও তাঁহার

দুইটি গল্পকে মহিমান্বিত করিয়াছে। একটি মহেশ এবং আর একটি রাস্তার একটা নেড়ি কুকুরের গল্প। তাঁহার ভেলি কুকুরও তো বাংলা সাহিত্যে অমর। বস্তুত প্রেমই যেন শরৎ-সাহিত্যের মেরুদণ্ড। তিনি তাঁহার দেশকে, তাঁহার পল্লীকে, তাঁহার আত্মীয় প্রতিবেশীদের যে বিরাট প্রেমে মনে মনে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিচ্ছবি তাঁহার সাহিত্যে ফুটিয়াছে। তাঁহার সেই বিশাল প্রেমকে যে বা যাহারা, যে শাস্ত্র বা যে আইন ক্ষুদ্র করিতে চাহিয়াছে তাহাদেরই উপর তিনি খড়্গহস্ত, তাহাদেরই তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাবুকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বপ্রেম বলিতে যাহা বুঝায়—যে প্রেমের প্রেমিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র ঠিক সে প্রেমের মহিমা কীর্তন বড় একটা করেন নাই। তাঁহার প্রেম নিবদ্ধ তাঁহার স্বদেশ, বিশেষ করিয়া পল্লী-অঞ্চলে। যাহার সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় ছিল সেই পল্লীর মানুষগুলিই তাহার রচনায় জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। ইংরেজি লেখক হার্ডির অমর সৃষ্টিগুলির পটভূমিকা যেমন ওয়েসেক্স্ অঞ্চল, শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টিগুলির পটভূমিকাও তেমনি হাওড়া-হুগলী অঞ্চল। পল্লীগ্রামের মানুষদের লইয়াও যে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা সম্ভব ইহা সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই তাঁহার ছোট গল্পগুলিতে অপূর্ব রসব্যঞ্জনায় মূর্ত করিয়াছিলেন। ইহার পরই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি আরও বিস্তৃত পটভূমিকায় পল্লীচিত্র আঁকিয়া আমাদের চিত্ত জয় করিলেন। তাঁহার গল্পের দর্পণে বাঙালী যেন নিজের স্বরূপ দেখিতে পাইল। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। শরৎচন্দ্র প্রথম জীবনে ভবঘুরে ছিলেন। তাঁহার এই ভবঘুরে জীবনের ছবি তাঁহার কোন কোনও রচনায়—বিশেষ করিয়া শ্রীকান্ত উপন্যাসে পাওয়া যায়। সে ছবিও মনোরম। শরৎচন্দ্রের স্টাইল স্বচ্ছ এবং হৃদয়গ্রাহী—লেখার মধ্যে হিউমারের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত। তাঁহার স্টাইল অর্থাৎ প্রসাদগুণের জন্যও তিনি এত জনপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার লেখা পড়িলে সহজেই বোঝা যায় এবং লেখার বিষয় আমাদেরই জীবনকথা বলিয়া সহজেই অন্তরকে স্পর্শ করে। বর্তমান যুগে তাই শরৎচন্দ্র বাঙালীর অতি-প্রিয়

সাহিত্যিক। কিন্তু এক বা দুই শতাব্দী পরে শরৎচন্দ্রের এই জনপ্রিয়তা কি অক্ষুণ্ণ থাকিবে? এ বিষয়ে কোনও সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে এইটুকু বলা যায়, যে জীবনধারার উপর নির্ভর করিয়া যে সামাজিক পরিবেশের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হইয়া সাহিত্য সাধারণতঃ সৃষ্ট হয় সেই জীবনধারা এবং সেই সামাজিক আবহাওয়া লুপ্ত হইয়া গেলে সে সাহিত্যও ক্রমশঃ মরিয়া গিয়া ইতিহাসের মিউজিয়মে গিয়া হাজির হয়। গবেষকদের গবেষণার উপকরণ সরবরাহ করে, কিন্তু জীবন্ত সাহিত্যরূপে তাহা আর সজীব থাকে না। ময়নামতীর গান, মঙ্গলকাব্যগুলি, এই সেদিনকার 'স্বর্ণলতা,' 'নীলদর্পণ,' আমাদের স্মৃতি হইতে অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, আরব্য উপন্যাস—এখনও প্রবলভাবে আমাদের মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ কি? কারণ এগুলির প্রাণ-সম্পদ কোন বিশেষ সমাজের রীতিনীতির উপর নির্ভরশীল নয়, এমন কতকগুলি শাশ্বত চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা মানব-মনকে চিরকাল উদ্দীপ্ত করে। ইহা ছাড়া এসব কাব্যের চরিত্রগুলি অনন্য সৃষ্টি, কোনও সামাজিক চরিত্রের নকল নয়। ইহারা অবাস্তব বিস্ময়কর অপরূপ সৃষ্টি এবং সেই জন্যই ইহারা চিরকাল আমাদের মনকে নন্দিত করে। দশমুণ্ড রাবণ, সোনার হরিণ, রামের ধনুর্বাণ লইয়া সমুদ্র-শাসন, হনুমানের গন্ধ-মাদন আনয়ন, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, মহাভারতে দুঃশাসন-রক্তপায়ী ভীম, যজ্ঞশিখা-সমুদ্ভূতা দ্রৌপদী, শতপুত্রের জননী গান্ধারী, ঘটোদ্ভূত দ্রোণ, চিরকুমার গঙ্গাতনয় ভীষ্ম—ইহারা সবই অবাস্তব এবং সেই জন্য চিরন্তন। ইহাদের কেন্দ্র করিয়া কবি-কল্পনা যে সত্য, যে মাধুর্য বিকিরণ করিয়াছে তাহাও শাশ্বত, তাহাও অবিনশ্বর। বাস্তবের পরমায়ু ক্ষণিক, দৈনিক পত্রিকার মতো। আজ যাহা বাস্তব, আগামী যুগে তাহাই হয়তো হাস্যকর অবাস্তব। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কবিরা যাহা সৃষ্টি করেন তাহার ভিতর এমন একটা মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা থাকে যাহা চিরনূতন, চিরআনন্দদায়ী।

শরৎসাহিত্যের মধ্যেও এরূপ কয়েকটি রচনা আছে বলিয়া মনে করি—তাঁহার বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, অভাগীর স্বর্গ, মহেশ, শ্রীকান্ত প্রথম ভাগ, পথ-নির্দেশ এইরূপ কালজয়ী রচনা। মনে হয় সাহিত্যের অক্ষয় মণিকোঠায় এগুলির দীপ্তি অনির্বাণ থাকিবে।

যাই হোক ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা লইয়া ভাবনা বৃথা। এইটুকু শুধু নিঃসংশয়ে বলিতে পারি বর্তমান যুগে শরৎচন্দ্র আমাদের যাহা দিয়াছেন তাহা মধুর এবং প্রচুর।

সেজন্য আবার তাঁহাকে প্রণাম জানাই।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ দিয়েছেন বলে এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা অর্ঘ্য নিবেদন করব বলে এখানে সমবেত হয়েছি, তিনি সুবিখ্যাত, সু-পূজিত এবং সু-আলোকিত। তাঁর অনেক জীবন-চরিত, তাঁর নাম অনেক প্রতিষ্ঠানে। তাঁর অনেক শিষ্য, অনেক ভক্ত। তাঁর সম্বন্ধে নূতন কিছু বলতে পারব এ স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু আমার মনে যে আক্ষেপ, যে ক্ষোভ, বহুকাল থেকে ঘনীভূত হয়ে আছে তারই সম্বন্ধে কিছু বলব আজ। আমার ক্ষোভ যে দেশে বিবেকানন্দের মতো পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে দেশের আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপাত করে গেছেন, যাঁর আদর্শ রাজসিক, তামসিক আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডেও দিব্যজ্ঞানের শাশ্বত সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকপাত করেছে—সেই দেশে, সেই বিরাট জ্যোতিষ্কের জন্মভূমিতে এখনও এত অন্ধকার কেন? এখনও আমরা দীন

কেন, হীন কেন, মিথ্যাবাদী কেন, গুণ্ডা কেন, চোর কেন, মূর্খ কেন, ভণ্ড কেন, ভীরু কেন? এর উত্তর আমরা বিবেকানন্দ থেকে এখনও অনেক দূরে আছি। আত্ম-আস্ফালন করবার জন্য তোতাপাখীর মতো আমরা বিবেকানন্দের নাম বারবার উচ্চারণ করছি, তাঁর উপদেশাবলীর দীর্ঘ তালিকা আউড়েছি, তাঁর ছবিতে মালাচন্দন দিয়েছি। তাঁকে নিয়ে সগর্বে বক্তৃতা করেছি, কবিতা লিখেছি, তাঁর ছবি নিয়ে মিছিল করেছি—নানারকম করেছি কিন্তু আসল কাজটি করি নি—নিজে বিবেকানন্দ হই নি। আমরা হুজুগে, আমরা সুবিধাবাদী, কর্তাভজার দলে নাম লিখিয়ে মুখস্থ বুলির বাজনা বাজিয়ে বাজার সরগরম করেছি। যে বিরাট মনুষ্যত্ব-ঐশ্বর্যে, যে দ্যুতিমান প্রেরণা-উদ্দীপনায়, যে বিস্ময়কর কর্ম-কল্পনায় ভাস্বর সমন্বয়ে তিনি সমুজ্জ্বল ছিলেন তা আমাদের নেই। যে শক্তি তাঁর জীবনে কৈবল্য ও বন্ধন উভয়কেই অলঙ্কারে পরিণত করেছিল সে শক্তিও আমাদের নেই। আমার এই উক্তি থেকে আপনারা মনে করবেন না আমি কাউকে নকল বিবেকানন্দ হ'তে বলছি। তা হওয়া সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনে অনেক মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, পওহারী বাবা, সাধু নাগমহাশয় ছাড়াও আরও অনেক সাধু তপস্বীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লাভ করেছিলেন তিনি। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যধারায় অবগাহন করে বহুমনীষীর বহু চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য তাঁদের প্রতিভা-দীপ্তিতে আলোকিত করেছেন বিবেকানন্দের জীবন, বিদেশের যীশুখৃষ্ট, জরথ্রুস্থ, মহম্মদ, ওল্ড্ টেস্টামেন্টের এবং নিউ টেস্টামেন্টের সাধকগণ, বিদেশী দর্শনের অগ্রগামী সুধীবৃন্দ সকলেরই নিকট নিত্যসত্যের সন্ধানে তিনি ফিরেছেন বহুদিন—কিন্তু তবু তিনি কারও 'কার্বন কপি' হন নি। হয়েছেন বিবেকানন্দ। নিজের স্বকীয়তায় প্রদীপ্ত নির্ভীক আদর্শবাদী এই বীর সন্ন্যাসীর অনন্যতার মহিমা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। সেই অনন্যতার মূলে শুধু তাঁর প্রতিভাই ছিল না, ছিল তাঁর সত্য-সন্ধানের একাগ্রতা, ছিল তাঁর সংযম-বিশুদ্ধ নির্মল নিষ্ঠা। আমরা যদি বিবেকানন্দের পথ অনুকরণ করতে চাই তাহলে আমাদের বিবেককে জাগাতে হবে,

অবগাহন করতে হবে নিখিল জ্ঞানের মহাসমুদ্রে সত্যরত্নের সন্ধানে। দূর করতে হবে ভয়, তুচ্ছ করতে হবে ক্লান্তি। পরিহার করতে হবে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থের কল্যাণে। এ পথে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমরা হয়তো নকল বিবেকানন্দ হব না, হব স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল প্রাণবন্ত মানুষ, যে মানুষ প্রেমিক, যে মানুষ সত্যদ্রষ্টা, যে মানুষ নির্ভীক, যে মানুষ নির্লোভ, নিরহঙ্কার, যে মানুষ পবিত্র, যে মানুষ বিদগ্ধ। বিবেকানন্দ আমাদের এই মানুষ হবার নির্দেশই দিয়ে গেছেন বারবার। কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি তাঁর সে নির্দেশ আমরা পালন করেছি? করি নি—করি নি—করি নি। তাই আমাদের এই দুর্দশা। নমস্কার।

শ্রীরামপুর কবি-সম্মেলন উৎসবে

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি, খুব ভালো লাগছে আমার। আপনাদের পাঠাগার সহস্রায়ু হোক এই কামনা করি। পাঠাগার পুণ্যস্থান। তীর্থে যাওয়ার পুণ্য হয় পাঠাগারে এলে। বহু মনীষীর মনের মাধুরী, বিস্তর ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে এখানে। প্রণাম জানাই আপনাদের পাঠাগারকে। আপনারা যে কবিতাগুলি শোনালেন তার মধ্যে অনেকগুলিই ভালো লাগল। সব সাহিত্যেরই—বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের—আদি যুগে সাহিত্য মানেই ছিল কবিতা। লোকে তা মুখস্থ করে। এই কবিতার মাধ্যমেই আমরা বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত পুরাণকে রক্ষা করতে পেরেছি। অনেক ছড়া, অনেক প্রবাদ এখনও কবিতার আকারে মুখে মুখে চলছে। প্রত্যেক সাহিত্যিক—অন্তত-

পক্ষে অধিকাংশ সাহিত্যিকই—তাঁদের সাহিত্য জীবন শুরু করেছেন কবিতা দিয়ে। এরকম কেন হয় তা গবেষণা-সাপেক্ষ। তবে প্রায় প্রত্যেকেরই যেমন একবার হাম জ্বর হয় তেমন প্রত্যেক সাহিত্যিকই একবার কিছুদিনের জন্য কাব্য জ্বরে আক্রান্ত হন।

আমিও হয়েছিলাম। এবং তারই প্রকোপে পড়ে অনেক কবিতা লিখেছি। আপনাদের অনেকের হয়তো নজরে পড়েছে। আলঙ্কারিকরা বলেছেন রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রস কি? যা রসিকচিত্তকে আনন্দিত করে। রসিক কে? এর উত্তর দেওয়া শক্ত। কারণ আমরা সবাই নিজেদের রসিক মনে করি। কবিকে চিহ্নিত করা বরং সহজ কিন্তু রসিককে চিহ্নিত করা বেশ শক্ত। যে সব কবিরা প্রকৃত রসিকের অপক্ষপাত নির্দেশ পান তাঁরা ভাগ্যবান। কারণ তাঁরাই প্রকৃত জহুরি যাঁরা বলে দিতে পারেন যে কবিতা-রত্নটি আপনি সৃষ্টি করলেন সেটি আসল রত্ন না ঝুটো পাথর।

অনেকে কবিতার নানারকম শ্রেণীবিভাগ করেন কালানুসারে। প্রাচীন কবিতা, মধ্যযুগীয় কবিতা, আধুনিক কবিতা ইত্যাদি। রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগের কথাও শুনছি আজকাল—ক্যাপিটালিস্ট কবি, বুর্জোয়া কবি, শ্রমিক কবি ইত্যাদি।

কবিতার শ্রেণীবিভাগ যতরকমই হোক একটি স্পষ্টত গুণ কিন্তু তার থাকা চাই সেটি রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি হবে। তা যদি হয় তাহলে তা যে শ্রেণীতেই পড়ুক না কেন রসিক সমাজে চিরকাল আদৃত হবে এবং প্রাচীনযুগের হলেও তা আধুনিক কবি সমাজে বেমানান হবে না। নমস্কার।

অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুর সম্বর্ধনা

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসব সভায় আমি আপনাদের সাদর সম্বর্ধনা জানাইতেছি।

আজিকার উৎসবে যাঁহাকে আমরা সভাপতিরূপে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি সেই সোমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যদি সিনেমা-স্টার, চটুল-গল্পলেখক বা সাময়িক সংবাদপত্রবিহারী রম্য-রচনাকার হইতেন তাহা হইলে তাঁহার নাম নিশ্চয়ই আপনাদের অবিদিত থাকিত না। জনপ্রিয়তার সস্তা জরির পোশাক পরিয়া তিনি বহুপূর্বেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। হয়তো তাঁহার সেরূপ ক্ষমতাও আছে। কিন্তু তিনি সে পথে বিচরণ করেন নাই। তিনি যে পথে গিয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন সে পথ জনবিরল, তাহা পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার পথ। গবেষকরা সাধারণত বিশেষজ্ঞ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের গবেষণার বিষয় সাধারণত একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথের মনীষাও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র চরিত্রের বহুমুখী বিস্ময়কে উদঘাটিত করিয়া তিনি বিদগ্ধ সমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশের সাধারণ পাঠক-পাঠিকার দল সম্ভবত সোমেন্দ্রনাথকে চেনেন না। যেখানে মেকি চাকচিক্যময় নকল হীরার বেশী প্রচলন সেখানে আসল হীরারা সাধারণত অগোচরে পড়িয়া থাকে। কিন্তু তবু জহুরীও একেবারে দুর্লভ নহে—আসল হীরার মূল্য অবশেষে নির্ধারিত হয়ই। সোমেন্দ্রনাথকে চিনিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িতে হইবে। তাঁহার রবীন্দ্র-অভিধান, তাঁহার সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ পুস্তক দুইটি তাঁহার বিপুল অধ্যবসায়, তাঁহার সূক্ষ্ম রস-বোধ, তাঁহার নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি এবং নির্ভীক মতবাদের অক্ষয় কীর্তি। রবীন্দ্রনাথকে তিনি নূতন আঙ্গিকে নূতন

আলোকে, নূতন রূপে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যাঁহারা রবীন্দ্রভক্ত তাঁহারা এই দুইটি গ্রন্থ পাঠ করিলে চমৎকৃত হইবেন। তাঁহার আর একটি গ্রন্থ আছে—কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লেখা বহু সাহিত্যিকের সন্দর্ভ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার হইতে শুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। বহু লেখকের মনে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-চিত্র যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহারই সংগ্রহ এই গ্রন্থখানি। সোমেন্দ্রনাথ গ্রন্থটির সম্পাদক। চমৎকার বই। সোমেন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—"বিদেশী ভারত সাধক"। এ গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ

"ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যজগতের বিবিধ বিষয় নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া শুরু করলেন এবং সমস্ত জগতের দৃষ্টি ঐদিকে আকর্ষণ করলেন তাঁরা সকলেই বিদেশী। তাঁদেরই পরিশ্রমে যত্নে, ঐকান্তিক সাধনায় ভারতীয় মহাকাব্য, নাটক, জ্যোতিষ, আইন প্রভৃতির চর্চা নতুন করে শুরু হলো।

ভগবদ্গীতা, বেদ, কোরান কোন কিছুই তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। তাঁরা আশ্চর্য হলেন, চমৎকৃত হলেন সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য দেখে। কেউ কেউ স্পষ্ট বললেন যে, গ্রীক ল্যাটিনের চেয়েও এ ভাষা অনেক উন্নত, অনেক সমৃদ্ধ"

এই গ্রন্থে—উইলিয়াম জোন্স, চার্লস উইলকিন্স, উইলিয়ম্ কেরী, কোলব্রুক, আলেকজাণ্ডার সোমা কেলিক্স কেরী, জেম্স প্রিন্সেপ, জোসুয়া মার্সম্যান, মনিয়ার উইলিয়াম্স জীবনকাহিনী সংকলিত হইয়াছে।

স্বার্থপরতার প্ররোচনায় আজ যাঁহারা সংস্কৃতকে অবজ্ঞা করিতেছেন এবং ঝুটা স্বদেশীয়ানা জাহির করিবার মোহে 'অংরেজি হটাও' এই আওয়াজ তুলিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থ হয়তো আদৃত হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই গ্রন্থখানি মূল্যবান। বর্তমানে বিদেশীদের দ্বারেই আমরা উদরান্নের জন্য ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করিয়াছি। অতীতে বিদেশীরাই আমাদের মনের খোরাক যোগাইয়াছে।

এ সভায় আরও যে সব বক্তা ও গুণী উপস্থিত আছেন তাঁহারা

আপনাদের নিকট সুপরিচিত। তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমান রামাশিসকে ইনজিনিয়ার হিসাবেই সকলে চেনেন। আমি তাঁহাকে সাহিত্যের আসরে টানিয়া আনিয়াছি—তাঁহার মুখ হইতে ইনজিনিয়ারিং বিষয়েই কিছু শুনিব বলিয়া।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী শারদা বেদালঙ্কার আমাদের উৎসবে প্রতি বৎসরই উপস্থিত থাকেন। তাঁহাকে মৌখিক ধন্যবাদ দিব না, কারণ ছোটবোনকে ধন্যবাদ দিবার রীতি নাই।

আপনাদের সকলকে পুনরায় সশ্রদ্ধ স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া আমি এইবার ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু নিবেদন করিব।

যে সাহিত্য-প্রেরণা সর্বদেশে সর্বকালে বাঙালী চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সেই সাহিত্য-প্রেরণাই একদা ভাগলপুর বাঙালীসমাজেও রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছিল 'সাহিত্য-সভা' নামে। এই সাহিত্য-সভার সহিত তাঁহারাই সংযুক্ত ছিলেন যাঁহাদের নাম উত্তরকালে স্ব স্ব মহিমায় সাহিত্য আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এই সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী আজ বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত নাম। ইঁহারা ছাড়াও ছিলেন অতুলচন্দ্র সোম, যোগেশচন্দ্র মজুমদার এবং আরও অনেক সাহিত্যামোদী বাঙালীগণ। এই 'সাহিত্য সভা'ই বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অঙ্কুর। যতদূর জানা যায় ১৩১২ বঙ্গাব্দে এই পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছিল। সাহিত্য সভার সভ্যগণের এবং অতুল সোম, মণি গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রেমসুন্দর বসুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইহা মূল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সর্বপ্রথম শাখারূপে গণ্য হয়। নব-স্থাপিত যে পরিষদের সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজ পণ্ডিত-প্রবর স্বর্গীয় হরেন্দ্রলাল রায়। সম্পাদক ছিলেন মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন চণ্ডীচরণ ঘোষ। ভাগলপুর ইনস্টিটিউটের একটি ক্ষুদ্র ঘরে স্বল্প আয়োজনে এই পরিষদের সূত্রপাত হইয়াছিল ষাট বৎসর আগে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে—১৩১৬ বঙ্গাব্দে সারদাচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে যে তৃতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা পরিষদের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম ঘটনা। সে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দার্শনিক মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র এবং আরও প্রায় দেড়শত প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন—'ভাগলপুরের বাঙালীরাই সর্বপ্রথম আমাকে প্রকাশ্য সভায় কবি বলে সম্মানিত করেছিল।'

ইহার পর পরিষদের কয়েক বৎসরের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। নানারূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও পরিষৎ নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখিতে পারিয়াছিল—ইহাই তাহার একমাত্র কৃতিত্ব।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার সিংহের এবং তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির নির্মিত হইল।

এই মন্দির নির্মাণে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের পরিবারবর্গ এবং তদানীন্তন কমিশনার চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে বানেলীর জমিদার কুমার রামানন্দ সিংহ। এই বদান্যতার জন্য ভাগলপুরের বাঙালী সমাজ ইঁহাদের নিকট ঋণী।

ইহার পর পরিষদের স্বর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। তিনদিন ব্যাপী সেই উৎসব সমারোহকে অলংকৃত করিয়াছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রখ্যাতনামা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সুগায়ক পঙ্কজকুমার মল্লিক, সুগায়িকা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাউল পূর্ণচন্দ্র দাস, সুরশিল্পী নচিকেতা ঘোষ এবং আরও অনেকে। সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমাদের পরিষদের আর্থিক সঙ্গতি সামান্য, কিন্তু ইহার ঐতিহ্যের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত। যাঁহাদের পদার্পণে আমাদের পরিষদ ধন্য তাঁহাদের নামের তালিকা এই: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়কুমার মৈত্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র-চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, কবিশেখর কালিদাস রায়, কালিদাস নাগ, সজনীকান্ত দাস, ক্ষিতিমোহন সেন, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তরুণকান্তি ঘোষ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অবধূত, অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহা, শান্তিদেব ঘোষ, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, রামধারী সিং দিনকর, রবীন হালদার, সুশীল রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন। আশাপূর্ণা দেবী, অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য।

এই ঐতিহ্যকেই অবলম্বন করিয়া সঙ্কটময় দুরূহ পথে বিবিধ বাধা বিঘ্ন বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা এই পরিষদ মন্দিরে বাঙালীর শাশ্বত মনের সেই বিশ্বাস-শিখাটি জ্বালাইয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি যে শিখায় অমর জ্যোতি সত্যেন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত "আমরা" কবিতাটিকে আজও সমুজ্জ্বল মহিমায় প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছি—চিরকাল রাখিবে।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরই এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

এই সমন্বয়ের সাধনাই সংস্কৃতির সাধনা, ইহাই সাহিত্য। আমাদের এই সাধনায় আপনাদের শুভ ইচ্ছা ও আশীর্বাদ কামনা করি। ভাগলপুরের বাঙালীদের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন এই পরিষদকে আর একটু মমতার চক্ষে দেখেন। এ পরিষদ তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠান এবং যে সাহিত্য বর্তমান ভারতে বাঙালীদের একমাত্র সমুজ্জ্বল পরিচয় সেই সাহিত্যেরই সেবায় এই পরিষদ নিজেকে এতদিন ধরিয়া নিযুক্ত রাখিয়াছে। আপনারা সকলেই তাঁহার পথে আলোকপাত করুন এই অনুরোধ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

নমস্কার।

মুরলীধর কলেজ (মেয়েদের)
প্রধান অতিথির ভাষণ

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ। কল্যানীয়া ছাত্রীরা,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করে আপনারা যে আত্মীয়-সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমরা লেখকরা সকলের আত্মীয় হ'তে চাই। সব সময় হতে পারি না, অনেক সময় হবার সুযোগ পাই না। আপনারা আমাকে সে সুযোগ দিয়েছেন বলে ভারি আনন্দ হয়েছে আমার। সভায়—বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীদের সভায় অনেকেই দেখেছি উপদেশ বর্ষণ করেন। দেশের এই দুর্দিনে তোমরা হ্যান হও ত্যান হও ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি জানি দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট উপদেশ দিলে কারও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটানো যায় না। আমি নিজেও একদিন ছাত্র ছিলাম। এখনও আমার অনেক ছাত্রবন্ধু আছে। আমি জানি ছাত্ররা আবেগপ্রবণ, তারা আদর্শবাদী,

তারা প্রাণবন্ত, তাদের চেতনায় উন্মুখ প্রাণের সঞ্জীবতা। তারা হুজুকে, তারা অনেক সময় অন্যায় কাজও করে। কিন্তু তবু তাদের আমি ভালবাসি। তাই তাদের সভায় উপদেশ বর্ষণ করবার প্রবৃত্তি আমার হয় না। তবু সভায় কিছুতো বলতে হবে। তাই তোমাদের একটি ছোট গল্প পড়ে শোনাচ্ছি আজ। অনেকদিন আগে গল্পটি লিখেছিলাম। গল্পের নাম "মহীয়সী মহিলা"।

ট্রেনে বেশ ভীড় ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফিরছিলাম। থার্ড ক্লাশের টিকিট। আমি একটি কামরার এক কোণে অতি কষ্টে বসবার জায়গা ক'রে নিয়েছিলাম, কিন্তু আর বসবার জায়গা ছিল না। দাঁড়িয়েছিল অনেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একসঙ্গে জুটেছিলাম সেই কামরাটিতে। বাঙালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল, পাঞ্জাবী সরদার এবং আরও বহুপ্রকার ইতর অথবা ভদ্রচেহারার লোক, কেবলমাত্র দেখে যাদের জাতিনির্ণয় করা অসম্ভব। পরস্পরের মধ্যে অমিল ছিল অনেক, মিলও হয়তো ছিলো। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সর্বতোভাবে একমত হয়েছিলাম। কামরায় আর যেন কেউ উঠতে না পারে। ওঠবার সম্ভাবনাও অবশ্য কম ছিল, কারণ, কামরার ডানদিকের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন একজন ভোজপুরী সিপাহী। তার মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, হাতে বিরাট লাঠি। চোখ মুখের দৃষ্টিও কমনীয় নয়। আর বাঁ দিকের দরজায় ছিলেন সরদারজি। ঘন ভ্রূ, ঘন চাপাদাড়ি, গোঁফও মানানসই রকম ঘন—মনুষ্যবেশী সিংহ একটি। প্রায় কোন স্টেশনেই কেউ উঠতে সাহস করছিল না। বড় বড় দুটো জংশন পেরিয়ে গেল, সিপাহীজি এবং সরদারজিকে দরজার কাছ থেকে একচুল নড়াতে পারলে না কেউ। সিপাহীজি এবং সরদারজির উপর সমস্ত কামরাটির ভার দিয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ দ্বারে অবশেষে শত্রু হানা দিল। স্টেশনটি খুব ছোট। সিপাহীজি ভাবতেই পারেন নি যে, এই স্টেশনে এমন একটা পল্টন এসে হাজির হতে পারে। তিনি তাই খৈনি প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ বাম করতলের উপর কিছু তামাক পাতা এবং চুন রেখে দক্ষিণ

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে মর্দন করছিলেন সেগুলি। তাঁর দুটি হাত এবং মন—কোনটাই দ্বাররক্ষায় ব্যাপৃত ছিল না।

হঠাৎ বামাকণ্ঠে ভুল হিন্দীতে শোনা গেল—"রাস্তা ছোড়িয়ে না। কেবাড়িকা পাশ সংকা মাফিক খাড়া হ্যা কাহে—। হটিয়ে হটিয়ে—"

দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল একটি বলিষ্ঠা মহিলা গাড়ির হাতল ধ'রে ঝুলছেন। প্রকাণ্ড গোল মুখ, গোল গোল চোখ, চিবুকের তলায় দু'থাক চর্বি, নাকে নথ, নথে টানা। মাথার কাপড় খুলে পড়েছে, আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়েছে পিঠের উপর। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।

"হটিয়ে হটিয়ে। ট্রেন বেশী নেই থামে গা, গার্ড সাহেব ঝণ্ডি দেখাতা হ্যায়। হটিয়ে না—"

সিপাহীজি এ মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন একটু। কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং মুখভাবে একটু কোমলতার আমেজ পাওয়া গেল।

"কুছভি জঘা নেই হ্যায় মাইজি—"

"আপ খোলিয়ে না, হটিয়ে না, হামলোক খাড়া হোকে যাঙ্গে। ই ট্রেন ফেল করনে সে বাবুজিকা নোকরি চলা যাগা, কাল জয়েনিং তারিখ হ্যায়—হটিয়ে—"

"মগর—"

মহিলা আর অধিক বাক্যব্যয় না ক'রে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়লেন। সিপাহীজি আর তাঁকে বাধা দিতে সাহস করলেন না। তাঁর ঈষৎ অনুকম্পাও হয়েছিল বোধ হয়। কারণ পরে জানা গেল তিনিও ছুটির শেষে কাজে জয়েন করতে যাচ্ছেন। ছুটির শেষে কাজে জয়েন না করলে যে কি মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে তা তাঁর জানা ছিল।

কপাটটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে ভোজপুরী পুরুষপ্রবরকে স্থানচ্যুত ক'রে ভদ্রমহিলা সমস্ত দরজাটি দখল ক'রে হাঁক দিলেন—"ওরে তোরা আয়, মণ্টু তুই আগে ওঠ, জিনিসপত্তরগুলো গোছাতে হবে, ঘণ্টু কোথা গেলি; শণ্টু মিণ্টু কানটু বানটু—আয় না তাড়াতাড়ি সব ওঠ, হাবলি ওদিকে হাঁ ক'রে দেখছিস কি, উঠে পড় না টপ্ ক'রে—"

পিল পিল ক'রে নানা বয়সের একদল ছেলেমেয়ে উঠে পড়লো।

সরদারজি একটু এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন—"ইয়ে তো জুলুম কি বাত হ্যায় মাতাজি,—"

"আপ চুপ রহিয়ে"

ভদ্রমহিলার ধমকে সরদারজি থতমত খেয়ে স'রে দাঁড়ালেন।

"এই কুলি, ইধার ইধার—"

তোরঙ্গ, সুটকেস, হোলড্-অল, নানা আকারের পুঁটলি, ঝুড়ি গোটা দুই, প্রকাণ্ড একটা টিফিন কেরিয়ার, গোটা চারেক হাঁড়ি, গোটা তিনেক প্রকাণ্ড তরমুজ, একটা বঁটি, তা ছাড়া একটা মুখ বাঁধা বস্তা···! প্রকাণ্ড কুঁজো!

ভদ্রমহিলা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, কুলিরা এইসব তুলতে লাগল।

"আওর দো কুলি উপর চলা আও, চীজ বাস্ সরিয়াকে রাখ্খো। ওই উধারকা বাঙ্ক মে সব এলোমেলো হোকে হ্যায়, পহলে সব ঠিক কর দেও।···"

যে সব যাত্রীর জিনিস উক্ত বাঙ্কে ছিল তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুসলমান মৌলভীটি তাঁর ফেজ আর বদনাটি নামিয়ে নিজের কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করলেন। ফেজটি শিরে ধারণ করলেন, বদনাটি অঙ্কে। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও তাঁর ছোট ট্রাঙ্কটি কোথায় রাখবেন ভেবে বিব্রত বোধ করছিলেন, ভদ্রমহিলা আশ্বস্ত করলেন সবাইকে।

"সব ঠিক করকে গুছায়কে রাখ দেঙ্গে, আপলোক ঘাবড়াইয়ে নেই—"

সত্যিই দেখা গেল বাঙ্কের জিনিসপত্রগুলো আগোছাল হয়েই ছিল। গুছিয়ে রাখাতে অনেকখানি জায়গা বেরোল। আমাকে সম্বোধন ক'রে ভদ্রমহিলা বললেন, "খোকা, তুমি বাবা পা-টা গুটিয়ে বোস তো, হ্যাঁ,—ওইখানে হোল্ড্-অল আর বোরাটা থাক, বেঞ্চি দুটোর ফাঁকে। ওগুলোর উপরেই তুমি পা রাখ। তুমি বাবা পা দুটো একটুখানি সরিয়ে নাও,—হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে"—

তারপর তিনি কামরাটার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

"এই কুলি ট্রাঙ্কঠো ওই উধারকা কোণা মে লে চলো। দোনো বেঞ্চকা বিচ মে দে দেও। আপলোক মেহেরবানি করকে পয়ের মোড়কে বৈঠিয়ে—। শণ্টু মণ্টু ট্রাঙ্কের উপর গিয়ে ব'স তোরা।"

শৌখীন পাঞ্জাবী-গায়ে নীল চশমা পরা একটি ছোকরা কোণে বসে' বসে' পা দুলিয়ে দুলিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। সে একটু ঝেঁজে ব'লে উঠল—"আপনি এমন ভাবে হুকুম করছেন যেন আমরা আপনার চাকর—"

"চাকর কেন হতে যাবে বাবা। তোমরা সব ছেলে। পা-টা গুটিয়ে বস লক্ষ্মীটি। হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেল। সবাইকে তো যেতে হবে। সব গুছিয়ে দিচ্ছি দেখ না, কারও কোন কষ্ট হবে না—। হ্যাঁ, ওই কুঁজোটা থাক।"

তারপর একটু হেঁট হয়ে দেখলেন বেঞ্চির তলাগুলো সব খালি আছে কি না।

"মেণ্টু, পুঁটুলিগুলো আর তরমুজ তিনটে এই বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে দে। আর ঘণ্টুকে কোলে ক'রে তুই ওই কোণটায় চলে যা। ও বাবা পাগড়ি, মেয়েটাকে একটু দাঁড়াতে জায়গা দাও বাবা—"

একটি ক্রিশ্চান দম্পতি একটু বেশী জায়গা নিয়ে একধারে বসেছিলেন ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের সাহেবী পোষাক দেখে তাঁকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করে নি। ভদ্রমহিলা করলেন। তিনি কানটু আর বানটুকে চালান করে দিলেন সেদিকে।

"তোরা ওই দিকে গিয়ে মেম-মাসীমার কাছে বস গিয়ে। হাবলিও যা—"

ক্রিশ্চান দম্পতি আপত্তি করলেন না। ভ্যানিটি ব্যাগ, অ্যাটাশে কেস প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিসগুলি সরিয়ে নিয়ে জায়গা ক'রে দিলেন শিশুগুলির। ক্রিশ্চান ভদ্রমহিলা তো বানটুকে কোলেই বসিয়ে নিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকেরও শিভ্যলরি উদ্বুদ্ধ হ'ল সহসা। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে' বললেন—"আপ ভি বৈঠ যাইয়ে। মায় খাড়া রহুঙ্গা।"

"না না, তুমি বাবা ব'স। আমার বসবার দরকার নেই। ওগো, তুমি কোথা গেলে, এইবার তুমি ওঠ না, ওঠ, ওঠ, ট্রেন আর কতক্ষণ দাঁড়াবে"

আড়ময়লা পাঞ্জাবীপরা ঝোলা-গোঁফ শীর্ণকান্তি একটি ভদ্রলোক উঠলেন।

"তুমি একটু জায়গা ক'রে নাও কোথাও—"

"ইউ কাম হিয়ার, দেয়ার ইজ্ এনাফ্ স্পেস—"

ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি।

আমি তখন ভদ্রমহিলাকে আহ্বান করলাম—"আপনি এসে এই হোল্ড্-অল্টার উপর বসুন। আমি পা গুটিয়েই বসছি—"

"তোমার কষ্ট হবে না তো বাবা"

"না, কিছুমাত্র না"

"আজকালকার ছেলেরা সোনার চাঁদ সব। হীরের টুকরো"

ভদ্রমহিলা এসে গদীয়ান হয়ে হোল্ড্-অল্টির উপর অধিষ্ঠিতা হলেন। সব যখন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে তখন ভদ্রমহিলার নজরে পড়ল মিণ্টু ঘণ্টুকে কোলে করে কোণঠাসা হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি—"মিণ্টু তুই এসে এখানে ব'স। আমি দাঁড়িয়ে থাকছি"

",আপনি দাঁড়াবেন কেন। ওদের জায়গাও ক'রে দিচ্ছি। শেঠজি আপ থোড়া সে হাটকে বৈঠিয়ে।"

শেঠজির মুখে একটু বিরক্তভাব ফুটে উঠল, কিন্তু তবু তিনি স'রে বসলেন একটু। এতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হ'ল না। ওইটুকু জায়গায় ঘণ্টুকে কোলে নিয়ে মিণ্টুর বসা অসম্ভব। শেঠজির পাশেই বসেছিল একটি সাঁওতাল যুবক। বলিষ্ঠ কালো চেহারা, চোখে মুখে নির্ভীক সরলতা, একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুল। তার দিকে চাইতেই সে উঠে পড়ল এবং দরজার ধারে গিয়ে সরদারজির পাশে দাঁড়াল। ঘণ্টুকে কোলে নিয়ে মিণ্টু বসল তার জায়গায়। সকলেরই স্থান সঙ্কুলান হয়ে গেল। আমি একটু বিস্মিত হচ্ছিলাম ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে। এত ছোট স্টেশনে দু'তিন মিনিটের বেশী দাঁড়াবার কথা নয়। কুলীরা পয়সা নিয়ে নেবে গেল। তবু ট্রেন ছাড়ে না। হঠাৎ দেখলাম স্টেশন-

মাস্টার মশাই পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখছেন।

"ও, আপনারা এইখানে উঠেছেন বুঝি। জিনিসপত্তর সব উঠে গেছে? বড্ড 'রাশ' আজকে। ট্রেন তাহলে ছাড়ি?"

একমুখ হেসে ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ, আমরা গুছিয়ে বসেছি। অনেক কষ্ট দিলুম বাবা আপনাকে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

"না, না কষ্ট আর কি।"

নেমে গেলেন স্টেশনমাস্টার!

তারপরই শোনা গেল—"অল্ রাইট, অল্ রাইট"

ট্রেন ছাড়ল।

ভদ্রমহিলার এই অতর্কিত আক্রমণে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন দু' একজন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সব ঠিক হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন—"ওই টিফিন কেরিয়ারটা বাক্স থেকে নামিয়ে দাও তো বাবা—।"

নামালাম।

বিরাট টিফিন কেরিয়ার। বেশ ভারী।

টিফিন কেরিয়ারটি খুলে ফেললেন তিনি। দেখলাম, প্রচুর লুচি, তরকারি আর রসগোল্লা রয়েছে। ভদ্রমহিলা দু'খানি ক'রে লুচি, একটু ক'রে তরকারি এবং একটি ক'রে রসগোল্লা প্রত্যেককে বিতরণ করতে শুরু করলেন। দু' একজন নিতে আপত্তি করলে, কিন্তু কিছুতেই তিনি শুনলেন না।

"হাম আপকো মা-ই হ্যায়, লিজিয়ে, লজ্জা কি বেটা—" সকলকেই নিতে হল। সেই নীল চশমা-পরা ছোকরাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—"তোমাকে একটু বেশী ক'রে দিচ্ছি। ছেলেমানুষ তুমি, দু'খানিতে তোমার কি হবে—"

ট্রেন চলছে। মুখও চলছে প্রত্যেকের। সমস্ত কুয়াশা কেটে গেল। ঘণ্টাখানের মধ্যেই আমরা সবাই আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে উঠলাম তাঁর এবং

তিনিও অসঙ্কোচে হুকুম করতে লাগলেন সকলকে। কোনও স্টেশনে আমরা তাঁর পান কিনে দিলাম, একটা জংসনে সকলকে চা খাওয়ালেন তিনি। সিপাহীজি আর একটা স্টেশনে রসগোল্লা কিনে আনলেন আবার। সর্দারজি কুঁজো হাতে ছুটলেন জল ভরতে। চানাচুরওয়ালার কাছ থেকে চানাচুর কিনে আবার বিতরণ করতে লাগলেন তিনি সকলকে। সেই গরমে, সেই ভীড়ে, থার্ডক্লাস গাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল।

এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিকী উৎসবে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। একশ' বছর আগে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে প্রাপ্ত জমির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম, জড়িয়ে আছে মহাত্মা কালীকৃষ্ণ এবং প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতি। এটি বাঙালী সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র সে হিসেবে।

এই তীর্থক্ষেত্রে এসে একটি কথা কিন্তু আজ মনে হচ্ছে। বাঙালী সংস্কৃতি বললে যে ভদ্র সুমার্জিত নানা শিল্পসমৃদ্ধ সাহিত্য-সমুজ্জ্বল সংস্কৃতির কথা মনে জাগে সে সংস্কৃতি এখনও কি বেঁচে আছে? পোশাক-পরিচ্ছদ যদি সংস্কৃতির একটা অঙ্গ হয় তাহলে বলতে হয় বাঙালী পোশাক আমরা আজকাল বড় একটা পরি না। সাহিত্য ও শিল্প যদি সংস্কৃতির দর্পণ হয় তাহলে বলব সে দর্পণটিও ক্রমশ মলিন হয়ে আসছে। আমরা অনেক জিনিস কিনি। কিন্তু ভাল বই কিনি না, ভাল ছবি কিনি না। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা অসাধু প্রকাশকদের কবলে পড়ে

নিপীড়িত হচ্ছেন, বাঙালী জনসাধারণ তাঁদের বাঁচাবার কোন চেষ্টা করেন না। প্রকাশকরা বলেন ভালো বইয়ের নাকি বিক্রি নেই। চানাচুর মার্কা চটুল সাহিত্য, সিনেমাগন্ধী লালসা-উদ্দীপক বই, অথবা সাময়িক রাজনীতি নিয়ে নানাধরনের উত্তেজক রচনারই নাকি বাজার আছে এদেশে। ভালো কাব্যগ্রন্থের, ভালো জীবনচরিতের, ভালো উপন্যাসের, ভালো প্রবন্ধের একেবারেই চাহিদা নেই নাকি। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমরা বাঙালী সংস্কৃতি নিয়ে কতদিন আর গর্ব করতে পারব? আর একটা দুর্লক্ষণ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে কিছুদিন আগে থেকে। আমরা পরের মুখে ঝাল খেতে শিখেছি। পাশ্চাত্ত্য দেশ যদি আমাদের কোনও গুণীকে সম্মান দেয় তাহলেই আমরা তাঁকে মাথায় করে নাচি। তার আগে নয়। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ তা বিচারের ভার অন্য দেশের উপর অর্পণ করে আমরা যে দাস মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি সেটা আমাদের পক্ষে গৌরবজনক নয়। আমাদের দেশের যে সব গুণী-জ্ঞানী-শিল্পী সাহিত্যিক বিদেশে গিয়ে সম্মানলাভ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান। কিন্তু তাঁদের সে প্রতিভার স্বীকৃতি আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আগে তেমন দিই নি, বিদেশের দরবার থেকে ছাপ মারা হবার পর দিয়েছি। এটা কি উঁচু দরের সংস্কৃতির লক্ষণ? তাছাড়া যে সব উপাদানগুলি সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে, যেমন সৎচরিত্র, শোভন ব্যবহার, নিঃস্বার্থপরতা, তা কি আমাদের মধ্যে আছে? স্বদেশপ্রেম আজকাল Party Politics-এ রূপান্তরিত হয়েছে, বোমা বন্দুক নিয়ে বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করাই হয়েছে আজকাল বীরত্ব। আমরা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভীড় করেছি, রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান দিয়ে বেড়াচ্ছি, স্কুল কলেজ ভাঙছি, বিব্রত করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে। যে বাঙালী সংস্কৃতি কৃষি-সভ্যতায় শ্রীমন্ত হয়েছিল, যন্ত্র-সভ্যতার কবলে পড়ে তার যে রূপ বেরিয়েছে তা সংস্কৃতির রূপ নয়। যন্ত্রসভ্যতা আমাদের চাকরি-লোলুপ ভিখারীর দলে পরিণত করেছে। যন্ত্রসভ্যতা সৃষ্টি করেছে নূতন ধরনের ক্রীতদাস। আমরা এখনও এ সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি নি। যন্ত্রসভ্যতাকে আমরা

উড়িয়ে দিতে পারব না। যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নূতন সংস্কৃতির পত্তন করতে হয় আবার। সে সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচনা করবে আমাদের সৎচরিত্র, আত্মসম্মানবোধ, সৌন্দর্যবোধ, বিদ্যাবত্তা আর এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেত হবে ঘরে ঘরে, আর সে কাজের ভার নিতে হবে প্রধানত পিতামাতাদের এবং পরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এ খুব সোজা কাজ নয়। এ একরকম তপস্যা। মাৎস্যন্যায়ের যুগে বাঙালী এ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিল, সিদ্ধিলাভ করেছিল চরিত্রভ্রষ্ট মুসলমানী শাসনের অন্তিম যুগে। সিদ্ধিলাভ করেছিল মদগর্বিত ইংরেজদের অত্যাচারের নাগপাশ ছিন্ন করবার সময়। সে তপস্যা আবার শুরু করতে হবে। তবেই আমরা উদ্ধার পাব। পূর্ণ মনুষ্যত্বই সংস্কৃতির ধারক, নির্মল চরিত্রের অনন্যতাই সংস্কৃতির দ্যুতি একথা উপলব্ধি করতে হবে, আর উপলব্ধি করতে হবে যে সংস্কৃতি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, সংস্কৃতি অর্জন করতে হয়। তা সাধনা-সাপেক্ষ তা পরের নকল বাহ্যাড়ম্বর নয়। তা স্বয়ম্প্রভ মাণিক্যের দীপ্তি। এ মাণিক্য আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু অনেক ধুলোয়, অনেক কাদায়, অনেক পঙ্কে মলিন হয়েছে বলে তার উজ্জ্বলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই মালিন্য দূর করতে হবে এবং আশা করি আমরা তা পারব। নমস্কার।

প্রকৃত শোক নীরব। যে শোক আর্তনাদ করে তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমাদের স্বার্থপরতা, আমাদের অহংবোধ এবং অনেক সময় লৌকিকতা। কিন্তু আমরা দুর্বল। প্রিয়জন বিরহে আমরা চিরকাল কেঁদেছি। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না। তারাশঙ্কর আমার বন্ধু, তার অনেক সুখদুঃখের অংশ আমি নিয়েছি, তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না একথা যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তার সঙ্গ আবার পেতে চেষ্টা করব তার লেখার মধ্যে। সব সার্থক গ্রন্থকারের মতো তারাশঙ্করও তার সত্য পরিচয় রেখে গেছে তার রচনার মধ্যে। সে নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করে গেছে। সেই জগতেই তাকে আবার নূতন করে পেতে হবে। বঙ্গবাণীর মন্দির প্রাঙ্গণেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকেই সে হঠাৎ চলে গেল। তাকে আবার নূতন করে পেতে হবে তার লেখার মধ্যে, তার স্মৃতির মধ্যে। সেই পাওয়াটাই সত্য পাওয়া হবে। প্রথম জী^নে অনেক কষ্ট পেয়েছিল সে। শেষ জীবনে ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছিল তার উপর। অনেক খ্যাতির মালা.তার গলায় দুলেছিল। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় ওই মালাগুলোই হয়তো অনেককে আকৃষ্ট করেছিল তার দিকে এবং আড়াল করেছিল স্রষ্টা তারাশঙ্করকে, কবি তারাশঙ্করকে। কিন্তু মহাকালের দরবারে এই অরসিকদের ভীড় থাকবে না এবং রসিকসমাজের কষ্টিপাথরে লেখা তারাশঙ্করের সুবর্ণদ্যুতি বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ী মহিমায় বিরাজ করবে—আমরা, বন্ধুরা সেই আশাই করব।

দুর্গাবাড়ি ভাগলপুরে শ্রীঅনুকূল ঠাকুরের সভায় আর্য ধর্মপ্রচারিণী সঙ্ঘে সভাপতির ভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের এই সভায় বক্তৃতা করবার কোনও যোগ্যতা সম্ভবত আমার নেই। আমার বয়স যদিও আটষট্টি চলছে তবু কোনও গুরুর কাছে এখনও আমি মন্ত্র নিই নি, কোনও ধর্ম-সংঘের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবার প্রেরণাও পাই নি। প্রায় সারাজীবনই আমি সাহিত্য সেবা করেছি। যে আনন্দ, সান্ত্বনা, প্রেরণা আমরা ধর্মের কাছে প্রত্যাশা করি সাহিত্যে তা আমি প্রচুর পেয়েছি। সাহিত্যের মাধ্যমেই ধর্ম-সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি তাই সংক্ষেপে এখন আপনাদের বলছি। আপনাদের সকলের ভালো লাগবে কিনা জানি না। যা আমাদের ধরে রাখে বা যাকে ধরে আমরা বেঁচে থাকি তাই যদি ধর্ম হয় তাহলে সে ধর্ম খুবই সহজ। কারণ মোটামুটি আমরা প্রত্যেকেই একটা নীতি-নির্দিষ্ট পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত। সামাজিক ধর্ম বা যুগধর্ম অবলম্বন করে আমরা বেঁচে আছি। এই বেঁচে থাকাটাই অধিকাংশ লোকের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা বন্যপশু ছিলেন, তাঁরাও বেঁচে থাকবার জন্যে নখদন্ত প্রস্তরলগুড়ের সহায়তায় যে যুদ্ধ করতেন আমাদের অত্যাধুনিক সভ্য যুগেও সে যুদ্ধ আমরা করেছি, যদিও অস্ত্রের চেহারাগুলো বদলেছে, তাদের সংহারশক্তিও বহুগুণ বেড়েছে। এদের আবৃত করে একটা নীতি-সুগন্ধী ধর্মের আবহাওয়াও আমরা সৃষ্টি করেছি—অহিংসা এবং শান্তির বাণী, Peaceful co-existence প্রভৃতির অমৃতময় আশ্বাস খবরের কাগজে, রেডিওতে, নেতাদের বক্তৃতায়, নানারকম সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনে নানাসুরে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষরা ওসব ধাপ্পায় ভুলি না। মুখে যাই বলি মনে মনে একটি ধর্মকেই আমরা আঁকড়ে আছি—সেটি

জীব-ধর্ম, বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে, যেমন করে হোক বাঁচতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরাও তাতে সায় দিয়ে বলেছেন—আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে বেদ আমাদের হিন্দুধর্মের মূল বলে কীর্তিত 'বেদোঽখিলং ধর্মমূলম্'—সেই বেদের অগ্নিদেবতার মাধ্যমে আহ্বনীয় বেদিতে ইন্দ্র-বরুণ-অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বহুদেবতাকে আহ্বান করে যে প্রার্থনা আমরা জানিয়েছি—সে প্রার্থনার সারবস্তু আমাদের বাঁচাও। আমাদের শতায়ু কর, অমিতবীর্য কর। পর্জন্য বৃষ্টিধারা বর্ষণ করুক, আমাদের বসুন্ধরা ধনেধান্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, আমরা শতশরৎ বাঁচব আমরা শত্রুকে পরাজিত করবো, সোমরসের অমৃত ধারায় আমরা সঞ্জীবিত হয়ে উঠব। ভালভাবে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাকেই সেই অনাদি-কাল থেকে অধিকাংশ মানুষ ধর্মরূপে অবলম্বন করে আছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে আমরা যে প্রার্থনা প্রত্যহ নানা স্বরে নানা মন্ত্রে জানাই তার মর্ম—আমরা বড় অসহায়, আমরা দুঃখপীড়িত, শোকার্ত, ক্ষুধার্ত, হে শক্তিমান দেবতা তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমাদের অন্ন দাও, শক্তি দাও, রূপ দাও, পুত্রকলত্র দাও। এই দেহি দেহি রবই অধিকাংশ লৌকিক ধর্মের ভিত্তি। বিশ্ববিশ্রুত ধর্মাচার্যগণ আর একটা উপদেশও আমাদের দিয়েছেন। বিশেষ করে বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্যের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনব্যাপী সাধনার যে বাণীমূর্তি আজ আমাদের কাছে দেদীপ্যমান বা অতি সরল তার শোভা অতিশয় সহজবেদ্য। তা অত্যন্ত মনোহারী। ওঁরা বলে গেছেন তোমরা সংসার জ্বালায় জর্জরিত তা ঠিক, কিন্তু তবু তোমাদের অনুরোধ করছি তোমরা একটু ভদ্র হও। মিথ্যা কথা বোলো না. চুরি কোরো না, পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরো না, পরশ্রীকাতর হোয়ো না। যতটা পার পরের উপকার কর। প্রতিবেশীকে ভালবাস। ভালবাসাই একমাত্র চাবি যা দিয়ে সকলের হৃদয়দ্বার খোলা যায়। সে চাবি তোমার মনের মধ্যেই আছে—সেই চাবিটি সন্ধান কর। ভদ্র হও। কিছু ত্যাগ না করলে ভদ্র হওয়া যায় না। যতটা পার পরের জন্য ত্যাগ কর—তোমরা সংসারী লোক তোমরা যদি ভদ্র হতে পার তাহলেই

তোমাদের সংসার সুখের হবে, তোমাদের ধর্মাচরণ সুষ্ঠু হবে, জীবন সার্থক হবে। এই সহজ সরল আটপছুরে ধর্মকেও আমরা যদিও মনে মনে মান্য করি, কিন্তু ষড়ঋপুর প্রলোভনে অনেক সময় তা জীবনে রূপায়িত করতে পারি না। কারণ আমাদের মধ্যে কামনার যে রং লেগে আছে—এ রং মনে কে লাগিয়ে দিয়েছে জানি না—সে রংটা খুব পাকা। বহু বহু শতাব্দীর ধোলাই সত্ত্বেও এ রং ওঠেনি। মানবসভ্যতার বাইরের প্রসাধনটাই একটু চাকচিক্যময় হয়েছে ভিতরে আমরা অধিকাংশ লোকই ষড়ঋপু-প্রলুব্ধ পশুই আছি। সাধারণ পশুরা পশুত্বের প্রয়োজন-অনুসারে সহজ-বুদ্ধি চালিত যে জীবন যাপন করে তা মানব-পশুর জীবনের মতো অতটা ভয়ঙ্কর নয়। বুদ্ধি আর বিজ্ঞানের সহায়তায় তথাকথিত আধুনিক মানবসভ্যতা পিশাচ-সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। রাবণরা এখনও সীতাহরণ করছে, কুরুসভায় এখনও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করবার প্রচেষ্টা চলছে, ভিন্ন নামে, ভিন্ন মুখোশের তলায় এখনও দুর্যোধনরা ষড়যন্ত্র করছে যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে। ধর্মের প্রসঙ্গেই যদি ইতিহাসের কথা স্মরণ করি তাহলে দেখব ধর্মের নামে যত পাশবিকতা, যত নরহত্যা, যত নারীধর্ষণ হয়েছে, যত লুণ্ঠন, যত অগ্নিকাণ্ড হয়েছে তা আতঙ্কজনক। আমাদের দেশেই বুদ্ধধর্মের নক্কারজনক পরিণতি হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ধর্ম জঘন্য ব্যভিচারের আবিলতা সৃষ্টি করেছিল, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদকে অবলম্বন করে মুখোশ-পরা ঘোর সংসারী তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটেছিল—এখনও আমাদের যুগেও রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে যে সব দল গড়ে উঠেছে, নানা মিশনে, নানা ধর্মসংঘে এখনও স্বচ্ছ-দৃষ্টি লোকেরা তাতে যে জিনিস দেখতে পায় তা ওই কামনার পাকা রং, তা ওই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বহুবিধ প্রসাধন, তা ওই ষড়ঋপুর সংস্কৃতি নামধেয় ষড়যন্ত্র। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ভদ্র ধার্মিক বিবেকী মানুষ যে একেবারে বিরল তা নয় তারা সহজ সরল সংসারী জীবন যাপন করে। তারাই সমাজের দায়-দায়িত্ব বহন করে। মানীকে শ্রদ্ধা করে, পূজ্যকে প্রণাম জানায়। পূজাপার্বণে দলে দলে রাস্তায় তারাই বার হয়,

গঙ্গার ঘাটে স্নান করে, মন্দিরে মন্দিরে পূজার ডালি সাজায়। ভগবান কি এ দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর তারা হয়তো কেউ পাবে না, কিন্তু তাদের চোখেমুখে যে সরলতা দেখেছি—মনে হচ্ছে তাই ভগবানের প্রকাশ। আমাদের সাধারণ জীবনের ধর্মের এইটেই সাধারণ চেহারা। কিন্তু এ ছাড়াও ধর্মের আর একটা জিনিস আছে যা সাধারণ নয়, যা অসাধারণ। অসংখ্য মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা মানুষের মধ্যে প্রবল আকুলতা জাগে। আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথা যাব? সত্য কি? ব্রহ্মই কি সত্য? সে সত্য জানবার পথ কি? উপায় কি? এইরকম অসংখ্য প্রশ্ন তাঁকে পাগল করে তোলে। শুধু ধর্মজগতে নয়, সাহিত্য জগতে, শিল্প-জগতে, বিজ্ঞান-জগতেও এদের আবির্ভাব ঘটে। এই পাগলদেরই নাম সাধক। এরাই সন্ন্যাসী, এরাই সংসারের বাধা-বন্ধন ছিন্ন করে সত্যের সন্ধানে অজানা পথে সহসা একদিন যাত্রা করেন। এঁরা সাধারণ আইনকানুন মানেন না। এঁরাই বিদ্রোহী! মনের জোর, একাগ্রতা, সমস্ত মনোবৃত্তিকে একীভূত করবার ক্ষমতা—যাকে বলে 'যোগ'—এই সবই এঁদের সম্বল, ধন, সম্পদ, ব্যাকিং নয়। এঁরাই মানবসমাজে সত্যদ্রষ্টা, এঁরাই মানবজাতিব পথপ্রদর্শক। এঁরা অসাধারণ। এঁদের রূপও একরকম নয়। কেউ খাপে ঢাকা ইস্পাতের তলোয়ার, কেউ বিষধর সাপের মাথার উপর জ্বলন্ত মানিক, কেউ গভীর সাগরজলের তরঙ্গবিলাসী মুক্তা-গর্ভ-শুক্তি, কেউ প্রস্ফুটিত শতদল, কেউ প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, কেউ আকাশচুম্বী পর্বত, কেউ নিবিড় অরণ্য, কেউ শান্ত ধীর স্থির, কেউ উন্মাদ, কেউ সুন্দর, কেউ ভয়ঙ্কর। দুটি সত্যদ্রষ্টা একরকম নয়। বাইরের দেহটায় সবাই মানুষ, কিন্তু তাদের মনের ভিতরে প্রবেশ করুন—দেখবেন তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন লোক। সাধারণ লোকেরা ওঁদের নকল করতে গিয়ে ভণ্ডে পরিণত হয়। কারণ কারও নকল করে সত্যকে জানা যায় না। নিজের জানা দিয়ে, নিজের উপলব্ধি দিয়ে, নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে সত্যকে জানতে হবে, সে 'জানা' নিজের নিঃসংশয় অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া চাই—এ ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলে না। এই সত্যকে জানবার তিনটি পথ আছে।

হয়তো অনেক পথ আছে, শাস্ত্রকারেরা তিনটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন— তাদের কথাই সংক্ষেপে বলছি। জ্ঞানের পথ, ভক্তির পথ আর কর্মের পথ। বিপুল অধ্যয়ন, বিশাল প্রতিভা, বিবিধ গবেষণা, কঠিন অধ্যবসায়ের পর জ্ঞানী সত্যের দেখা পান। কিন্তু যখন পান তখন তাঁর সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত গবেষণা, সমস্ত অধ্যবসায়, সমস্ত আড়ম্বর আয়োজন, তুচ্ছ হয়ে যায়—ছাদে ওঠবার পর তুচ্ছ হয়ে যায় যেমন সিঁড়ি, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার পর তুচ্ছ হয়ে যায় যেমন যানবাহন। মায়ের কোলে ওঠবার পর তুচ্ছ হয়ে যায় যেমন সন্তানের বসনভূষণ। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে জ্ঞানের পথ সুগম নয়। ভক্তির পথও সকলের জন্য নয়। কারণ ভগবানের বিশেষ দয়া না থাকলে আমাদের মনে ভক্তি জাগে না। আমি কবি হব বললেই যেমন কবি হওয়া যায় না, আমি ভক্ত হব বললেই তেমনি ভক্ত হওয়া যায় না। ভগবান যেমন বিশেষ বিশেষ মানুষকে রূপ দেন প্রতিভা দেন, শৌর্য-বীর্য মহিমা দেন, তেমনি বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে ভক্তির বিপুল বিশ্বাসও তিনিই সঞ্চারিত করেন। সাধারণ লোকের মনে ভক্তির সুকুমার চারা গজাতে পারে না, অবিশ্বাসের প্রদাহে অহংকারের খরায় তা জ্বলে-পুড়ে যায়। ভক্ত তার ভক্তি নিয়ে ঘরেই বসে থাকে, তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আমার কাছে, আমার এই মাটির ঘরেই আমার এই খোড়ো চালের বারান্দায় তিনি আসবেন। আসবেনই, তাঁকে আসতেই হবে। কারণ আমাকে নইলে তাঁর চলবে না। আমারও তাঁকে প্রয়োজন, তাঁরও আমাকে প্রয়োজন। ভক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নির্মল হয়ে তাই সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকে, অপেক্ষা করে। এ যোগাযোগ ঘটবেই। ঘটেও। ভগবান সেই পরমসত্য সিংহাসনের আসন থেকে সত্যিই নেমে এসে ভক্তের দুয়ারে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান। বহু ভক্তের জীবনে এ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই ঘটনা—এক পরমাশ্চর্য অলৌকিক অবিশ্বাস্য ব্যাপার—আমার আপনার জীবনে ঘটবে এ প্রত্যাশা করতে পারি কি? আমরা যুক্তিতর্কপটু অগভীর জলবিহারী শফরীর দল। ভক্তি আমাদের sophisticated মনে কোন সাড়া তুলতে পারে না। তাই সাধারণ লোকের পক্ষে কর্মের

পথই শ্রেষ্ঠ পথ। গীতা বলছেন কর্মটি কিন্তু নিষ্কাম হওয়া চাই। কর্মের জন্যই কর্ম করতে হবে। ফল যাই হোক তার দিকে লক্ষ্য থাকবে না। কর্ম নিরাসক্ত হওয়া চাই। গীতার এই উপদেশ পালন করা খুব সহজ নয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ। নিষ্কামভাবে কাজ করতে করতে মনের কামনা ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়, সর্বভূতে সর্বকর্মে জীবনের সর্বস্তরে নিজেকে নিরাসক্তচিত্তে নিযুক্ত রাখতে রাখতে ক্রমশ সেই বিরাট সত্যের আভাস পাওয়া যায় যিনি সর্বত্র স্বয়ম্ভ্রম—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং —নিরাসক্ত অনুভূমির নিষ্কাম প্রচেষ্টার নিরন্তর প্রয়াস তাঁকে যোগীর মনশ্চক্ষে প্রতিভাত করে।

যিনি—নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম—বহু অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি শাশ্বত, সচেতনদের মধ্যে যিনি চৈতন্য স্বরূপ, যিনি অক্ষত, অমলিন, নিত্য শুদ্ধ নিরঞ্জন স্বরূপ সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে নিজের পথে, নিজের মতে, আকুল হৃদয়ে, উন্মুখ অন্তরে সদা-সর্বদা সেই দিকে সমনস্ক জাগরূক থাকতে হবে তবেই হয়তো তাকে পাওয়া যাবে। সত্যের সন্ধান সত্যের উপলব্ধি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

পথ অনেক মত অনেক,—হিন্দু দার্শনিক বলছেন, যে কোনও পথে যে কোনও মতে চললেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে—হিন্দুধর্ম বহুর মধ্যে একেকে পাওয়ার সাধনাই করেছে—নাস্তিক্যবাদও এদেশে মুক্তিলাভের পথ বলে স্বীকৃত হয়েছে—যে কোনও মতেই চলুন আপত্তি নেই, কিন্তু ভণ্ডামি চলবে না। হিন্দুধর্মে অসত্যের স্থান নেই, ভয়ের স্থান নেই, সংশয়ের স্থান নেই। সত্যের সন্ধানের জন্য সংশয়হীন সত্য আকুতি চাই। ভাগ্যবলে সাধনা-পারঙ্গম বহুদর্শী গুরুর যদি সাক্ষাৎ পান তিনি হয়তো জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে আপনার জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলীত করে দেবেন, আপনার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনি হয়তো আপনাকে চালিত করতে পারবেন, আপনার প্রাণের প্রদীপটি হয়তো তাঁর প্রদীপের শিখা স্পর্শে আলোকিত হয়ে উঠবে। বস্তুত সদগুরু পেয়ে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। অনেক সমস্যাই তিনি সমাধান করে দেবেন কিন্তু সে গুরু দৈবাৎ পাওয়া যায়। না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই।

একনিষ্ঠ সাধনায় আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারি, এই আত্মজ্ঞানই গুরুরূপে পথ-প্রদর্শন করে। ব্রহ্মজ্ঞানলোকের অমৃত-সন্ধানে আমাদের নিয়ে যেতে পারে। আত্মনা বিন্দতে বীর্যং, বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্। প্রকৃত সাধক মানব সমাজে বিরল, প্রকৃত গুরু আরও বিরল। কিন্তু তবু থেমে থাকলে চলবে না, খুঁজতে হবে, চলতে হবে, পথই পথের সন্ধান দেবে। বহুকাল আগে পথ চলা সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলাম— সেইটির খানিকটা অংশ পাঠ করে, আমার বক্তব্য সমাপন করি—

কল্পনা-বিলাসী মোরা, স্বপ্ন আর সুরই সম্বল
ছবি আঁকি গান গাই হয়তো কবিতা গল্প বলি
হয়তো করি না কিছু, চেয়ে থাকি বিস্মিত বিহ্বল
অবাস্তব লোক হ'তে মায়াবী ও মায়াবিনী দল
নেমে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরণীর ধূলিরে উজ্জ্বলি।
পথ চলে আমরাও চলি।

অনাদি অনন্ত পথ স্বার্থব্যস্ত জনতা সদাই
মোদের মর্মের বাণী কে বুঝিবে কাহাকেই বলি
মনের মানুষ খুঁজি যে মানুষ ত্রিভুবনে নাই
তবু খুঁজি বারম্বার যদি তাকে একবারও পাই
আসে যায় নানা মূর্তি নানা বেশে যায় শুধু ছলি'।
পথ চলে আমরাও চলি।

বুঝিয়াছি অবশেষে ভাবগ্রাহী পথই ভগবান
পথের কাহিনী তাই পথকেই শতবার বলি
পথকেই লক্ষ্য করি' গেয়ে যাই পথিকের গান
আঁকিয়া পথের ছবি পথকেই করি তাহা দান
পথের ধুলায় রাখি অন্তরের সঞ্চিত অঞ্জলি
পথ চলে আমরাও চলি।

নমস্কার।

ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবে সভাপতির স্বাগত ভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ এই উৎসব সভায় আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আজ এই সভা-মণ্ডপে একাধিক গুণীজনের সমাবেশ ঘটিয়াছে। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে একজন বিশ্রুত-কীর্তি লেখিকা। বাঙালী সমাজের—বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ পল্লী সমাজের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সংস্কৃতি-অসংস্কৃতির যে আলেখ্য তিনি নিপুণ শিল্প কুশলতায় নানাবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, সরোজ কুমার সকলেই পশ্চিমবঙ্গের পল্লীসমাজচিত্র আঁকিয়াই বঙ্গবাণীর মন্দির অলঙ্কৃত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আশাপূর্ণার চিত্রে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার চিত্রে একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের—বিশেষ করিয়া সে পরিবারের নারীদের যে রূপ ফুটিয়াছে তাহার রূঢ় বাস্তবতা অনবদ্য ও বিস্ময়কর। কি দুঃখ, কি বেদনা, কি লাঞ্ছনা, কি হতাশা, কি লজ্জা যে ওই চরিত্রগুলিতে মূর্ত হইয়াছে, সংস্কৃতির ঢক্কা-নিনাদ সত্ত্বেও আমাদের নারী-সমাজ এখনও কি দীনতা-নীচতা মূর্খতার আবর্তে আবর্তিত হইতেছে, সেই কুম্ভী-পাকের মধ্যেও কি করিয়া বৃহৎ জগতের আহ্বান কাহারও কাহারও চিত্তকে উতলা করিয়া তুলিতেছে—এই সবের রসোত্তীর্ণ সার্থক রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে আশাপূর্ণার সাহিত্য-সৃষ্টিতে। তিনি নিজে অন্তঃপুরিকা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী অন্তঃপুরের নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন তিনি। ভাষায়, ভাবে, গালাগালিতে, প্রশংসায়, উৎসবে, ব্যসনে, বদান্যতায়, নীচতায় পশ্চিমবঙ্গের পারিবারিক কাব্যের যে বিশিষ্ট সাহিত্য তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাতে শুধু ব্যঙ্গ বা শুধু সমালোচনাই নাই,

তাহাতে গভীর সহমর্মিতাও আছে, আর আছে আদর্শ-আকুলতা। প্রথম প্রতিশ্রুতির রামকালী, সত্যবতী ও সত্থ তাহার মহৎ সৃষ্টি। এলোকেশী ভয়ঙ্করী—কিন্তু তাহাও রসোত্তীর্ণ।

আমাদের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক, আগ্রহশীল সাহিত্য-রসিক এবং অনলস সাহিত্য-সেবক। শুধু বাংলা নয় একাধিক ভাষার মন্দিরে ইহার স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। ইনি ইংরেজি, ফরাসী, সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া, উর্দু, ফারসী, মারাঠী ভাষা জানেন। শুধু জানেন নয় সে সব ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য-আলোচনাও করেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও একাধিক ভারতীয় ভাষায় ইহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর অনুবাদকও। বাংলা সাহিত্যে ইহার বিখ্যাত পুস্তক—'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান', 'অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ', 'কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' প্রত্যেকটি গ্রন্থই তাঁহার অনুসন্ধিৎসার, সাহিত্যজ্ঞানের ও মনীষার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য নামে আর একটি গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছেন, তাহা সম্ভবত এখন যন্ত্রস্থ। আমার অভিজ্ঞতা বহুভাষাবিৎ সাহিত্য সমালোচকগণ সাধারণত বড় বেশী গম্ভীর এবং অনেক সময় একটু রুক্ষ প্রকৃতির হইয়া থাকেন। মাঝে মাঝে আমার এ সন্দেহও হইয়াছে যে তাঁহারা হয়তো বিদ্যার ঢোল বাজাইয়াই অনেক সময় আসর জমাইয়া রাখেন, সাহিত্যের সূক্ষ্মরসবোধ অনেকেরই নাই। সাহিত্যের পদ্মবনে মত্ত মাতঙ্গের মতো প্রবেশ করিয়া তাঁহার বিদ্যার নিকষে ঘসিয়া ঘসিয়া কমলফুলের রূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হন। সুধাকর সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা চলে না। তিনি সাহিত্য-রসিক, তিনি বিনয়ী, তিনি অমায়িক, তিনি শ্রদ্ধাশীল। প্রসঙ্গত আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্ক আছে। বিদ্যাসাগর সুধাকরের পিতামহীর পিতা। এই বিরাট উত্তরাধিকারের মর্যাদা তিনি সগৌরবে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তিনি সার্থকনামা অধ্যাপক, কৃতী সাহিত্যরসিক।

শ্রীরামেশ্বর ঝা এম. এ. সাহিত্যালঙ্কার, হিন্দী সাহিত্য সংসারে কবি দ্বিজেন্দ্র নামে সুপরিচিত। হিন্দী, ইংরেজি, সংস্কৃত এবং বঙ্গসাহিত্যে ইহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। হিন্দী কাব্যে ইহার প্রতিভার দ্যুতি, হিন্দী বিদগ্ধ সমাজে ইহার সুপ্রতিষ্ঠিত আসন হিন্দী সাহিত্য জগতে সসম্মানে স্বীকৃত। ইহার গুণীজনসুলভ বিনম্র ব্যবহার, ইহার প্রাদেশিকতা-বর্জিত উদার মনোভাব, ইহার ব্রাহ্মণোচিত চরিত্র-দীপ্তি ইহাকে যে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা গৌরব-সমুজ্জ্বল। ইনি শিক্ষক, বহু ভক্ত ও একটি কবি-গোষ্ঠী পরিবৃত হইয়া ইনি এ অঞ্চলে হিন্দী সাহিত্যের আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহার রচিত গ্রন্থাবলী শূল-ফুল, কিরাত কন্যা এবং জাগরণ। ইনি এখন মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' অনুবাদে নিযুক্ত আছেন।

ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু সাহিত্যের অধ্যাপক ডাক্তার সৈয়দ আহমদ হাসানও একজন সুকবি, সুপণ্ডিত, সুরসিক সাহিত্য-প্রাণ ব্যক্তি। ইহার গবেষণামূলক রচনা—Conception of Love in Sufi Poetry—বিদ্বৎসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে।

মনে পড়ল

লাল চীন আমাদের দেশকে আক্রমণ করে আমাদের দেশের অনেকখানি জমি দখল করে বসে আছে এবং হুমকি দিচ্ছে, 'আমার প্রস্তাবে যদি রাজি না হও তাহলে আবার আক্রমণ করব।'

এতে সারা দেশ জুড়ে একটা সাড়া পড়ে গেছে। দেশের শাসক-মণ্ডলী দেশের আত্মসম্মানকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বক্তৃতা দিচ্ছেন, দেশের জনসাধারণ প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদান করছেন, দেশের কবি ও শিল্পীরা চারণের ভূমিকায় নেমেছেন, পুরাতন স্বদেশী সঙ্গীত আবার নূতন করে

শোনা যাচ্ছে, বঙ্গ-ভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের যে সব গান রচিত হয়েছিল, যে সব গান আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, সেই সব গান বিস্মৃতির কবর খুঁড়ে বার করা হচ্ছে আবার। ভারতের সেই নবজাগরণের যুগে আরও যে সব কবি সার্থক জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে দেশকে জাগিয়েছিলেন তাঁদেরও আবার স্মরণ করছি আমরা। মনে হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের তূর্যনিনাদ আমাদের বধির কর্ণ ভেদ করে মর্মে প্রবেশ করছে আবার।

সাড়া জেগেছে সন্দেহ নেই। এতদিন আমরা যেন খানিকটা অসাড় ছিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটা ডাক্তারি কথা মনে পড়ল। শরীরে কোন দীর্ঘস্থায়ী অসুখ, বিশেষ করে ব্যথা, যখন সেরেও সারতে চায় না তখন আমরা আমাদের শরীরের জোয়ানদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করি। ডাক্তারি ভাষায় এই জোয়ানদের নাম লিউকোসাইট্‌স্ (Leucocytes) এরাই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে। এরা দলে দলে রক্তস্রোতে এসে পড়লে পুরাতন মেয়াদী অসুখটাকেও অনেক সময় সারিয়ে তোলে। শরীরে কোনরকম প্রদাহ সৃষ্টি করলেই শরীরের এই জোয়ানরা সাড়া দেয় সাধারণত।

এই প্রদাহ সৃষ্টি করবার নানারকম উপায় আছে। অনেক আদিম জাতি লোহা গরম করে ব্যথার জায়গাটায় ছ্যাঁকা দেয়। আমি একজন সাঁওতালকে কোদাল গরম করে পিঠে ছ্যাঁকা দিতে দেখেছি। গুল দেওয়ার প্রথা তো অনেকদিন থেকে প্রচলিত। জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে শরীরের কোন জায়গা পুড়িয়ে দেওয়া হত। সাধারণত এটা দেওয়া হত বড় প্লীহার উপর। ছুঁচ বা নরুন দিয়ে ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি করার প্রথাও অনেক প্রাচীন। প্রদাহজনক বহুবিধ ওষুধও আছে। আইয়োডিন, মাস্টার্ড, ক্যান্থারইডিন প্রভৃতি ওষুধ ডাক্তাররা খুবই ব্যবহার করতেন। আধুনিক যুগে এসেছে ইনজেকশন। দুধ, ওমনাডিন, এবং আরও নানারকম প্রোটিন-জাতীয় জিনিস ব্যবহৃত হয় এজন্য। সকলেরই লক্ষ্য এক। শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে শরীরের লিউকোসাইট্‌স্‌দের (শ্বেত রক্তকণিকাদের) ডাক দেওয়া। শরীরবাসী এই জোয়ানরা যদি

ভালভাবে সাড়া দেয় তাহলে আমরা আশা করি শরীরের দীর্ঘস্থায়ী গ্লানিটা কেটে যাবে।

চীনের আক্রমণও আমাদের দেশে অনেকটা ওই ভাবেই কাজ করেছে। আক্রমণের প্রদাহে আমাদের দেশের জোয়ানরা জেগে উঠেছে। দেশের সর্বস্তরে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।

এর কিন্তু আর একটা দিক আছে সেটাও মনে রাখা কর্তব্য। শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে মনোমত ফল হয় না। রক্তে যে পরিমাণ শ্বেত রক্তকণিকা বৃদ্ধি আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি। এরকম হলে ডাক্তাররা বলেন যে রোগীর জীবনীশক্তি (ভাইটালিটি) কমে গেছে। তখন তাঁরা চেষ্টা করেন এই জীবনীশক্তি বাড়াবার। চেষ্টা সাধারণত নিবদ্ধ থাকে রোগীকে সুপাচ্য আমিষ জাতীয় (প্রোটিন) খাদ্য, ভিটামিন এবং পুষ্টিকর নানারকম রাসায়নিক উপকরণ, (minerals) সরবরাহ করায়। এ সব জিনিসের অভাব হলে শরীরের যে সব ফ্যাকটারি থেকে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হয় সে সব ফ্যাকটারি দুর্বল হয়ে পড়ে, তার থেকে আর শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হয় না।

শরীরের ক্ষেত্রে যা সত্য সমাজ বা জাতির পক্ষেও তা সত্য। সমাজ বা জাতি অপ্রত্যাশিতভাবে যখন কোনও বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সেই বিপদের প্রহারে সে উত্তেজিত হয়, উদ্দীপ্ত হয়, জোয়ানের দল তখন হৈহৈ রৈরৈ করে এগিয়ে আসে বটে, কিন্তু সমাজের বা জাতির জীবনীশক্তি দুর্বল হ'লে সে উত্তেজনা, সে উদ্দীপনা বেশীদিন টেকে না। তা সাময়িক হুজুকে পর্যবসিত হয়।

জাতির জীবনীশক্তি বাড়াবার উপায় কি? প্রথম এবং প্রধান উপায় অবশ্য ভালোভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা। ক্ষুধার্ত বা শীতার্ত সৈনিক বেশীক্ষণ লড়তে পারে না। দ্বিতীয় উপায়, তাদের মনের জন্যও সুখাদ্য পরিবেশন করা। তাদের সামনে বড় একটা আদর্শ অহরহ তুলে রাখতে হবে। দেশের শাসকমণ্ডলীর আচরণে এমন কোনও পক্ষপাতিত্ব যেন না দেখা দেয় যাতে জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগে। তাঁরা যে একটা বিশেষ দলের, বিশেষ প্রদেশের বা বিশেষ ভাষার

পৃষ্ঠপোষক এ রকম ধারণা জাগলে আমাদের একতায় ফাটল দেখা দেবে। দেশের সবাই সমান সুযোগ ও সুবিধা পাবে গণতন্ত্রের এই নীতি নিষ্ঠাভরে পালন করতে হবে। এই আদর্শ স্থাপনের ব্যাপারে দেশের সাহিত্য এবং শিল্পের দায়িত্বও কম নয়। যে সাহিত্য বা শিল্প মানুষকে পশুত্বের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে সে রকম সাহিত্য বা শিল্প এখন বর্জনীয়। গত যুদ্ধের সময় জার্মানদের কাছে ফ্রান্সের পরাজয়ের একটা প্রধান কারণ অনেকে অনুমান করেছেন—ফ্রান্সের নৈতিক মেরুদণ্ডহীনতা।

চীনের আক্রমণে আমাদের দেশে যে সাড়া জেগেছে, যে আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি আশা করি তার সুর নেমে যাবে না, আমরা সগৌরবে আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা সমুড্ডীন রাখতে পারব।

কাশীর এক সাহিত্য সভায়

শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রকাশজী, সভানায়িকা শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় মহাশয়া, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। কয়েক বছর আগে আমি আর একবার এইরূপ একটি সম্মেলনে আপনাদের সাহচর্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। সে আনন্দময় স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমি সাহিত্য-সেবক। স্বভাবতই আপনারা আমার কাছে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান। কিন্তু এ ধরনের সভায় সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ব্রাহ্মণ-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সাহিত্যিকরা একদা মহিমাময় তেজোদীপ্ত প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের বাণীমন্দিরকে উজ্জ্বল করে রাখতেন, নিজেদের সৃষ্টির গরিমায় যাঁদের ললাট আকাশচুম্বী ছিল, বিরাট

সম্রাটের মতো অজস্র দানে যাঁরা সংস্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন, প্রকৃত স্রষ্টার সিংহাসনে উপবেশন করে যাঁরা সৃষ্টির আনন্দে মশগুল হয়ে যেতেন সেই ব্রাহ্মণ-প্রকৃতির সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ সাহিত্যিকই আজকাল বণিকবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, তাঁরা আর ব্রাহ্মণ নেই। কাঙালের দলে গিয়ে ভীড় বাড়িয়েছেন ধনের কাঙাল, মানের কাঙাল, জনপ্রিয়তার কাঙাল, পুরস্কারের কাঙাল, পিঠ চাপড়ানির কাঙাল। সে আভিজাত্য আর নেই। ধনের আভিজাত্য নয়, মানের আভিজাত্য। শুধু সাহিত্য সমাজে নয়, কোথাও নেই। অনেকদিন পরে বারাণসীধামে এলাম। এসে দেখলাম বারাণসীও আর সে বারাণসী নেই। এখানে রাস্তায় বড় বড় ষাঁড় আগে একটা অপূর্ব দৃশ্য ছিল। এবার একটাও বড় ষাঁড় দেখতে পেলাম না। দেখলাম উট প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে এসেই উত্তরা সম্পাদক প্রধান সাহিত্য-সেবক শ্রীমান সুরেশের সঙ্গে দেখা হল। শুনলাম সে এখনও পূজাসংখ্যা 'উত্তরা' বার করতে পারে নি। এখানে এসেই খুব ছোট গল্পের একটা রূপক কাহিনী মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। ঠিক করলাম উত্তরা পূজাসংখ্যায় সেইটে লিখে দেব। গল্পটা আপনাদের শোনাচ্ছি। খুব ছোট গল্প। সেজন্য ভয় হচ্ছে হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে না। আজকাল অতিকায় উপন্যাসই নাকি লোকেদের ভালো লাগে। তাই লেখক-লেখিকারা যেটা এক কথায় বলা যায় সেটা হাজার কথায় বলেন নানারকম বাগাড়ম্বর করে। বক্তব্য ছোট কিন্তু বাক্য অনেক বেশী। তাঁরা ভুলে যান যে ফেনা সমুদ্রেই মানায়। কিন্তু ঠোঁটের কোণে তা বিশ্রী। আনা তোঁল ফ্রাঁস বলেছিলেন—লেখকদের বন্ধু কলম নয় রবার, eraser। কিন্তু সেসব কথা আজকাল কেউ শুনতে চায় না। যাক্, আমার ছোট গল্পটি শুনুন।

"কি হ'ল?"

মহারাজ জ্বলজ্যোতি সিংহ তাঁর নব-নিযুক্ত গাইডটির দিকে সোৎসুকে চেয়ে রইলেন। তিনি তাঁর রাজ্য থেকে গোপনে চলে

এসেছিলেন কাশীতে। বহুকাল পূর্বেকার সেই দিনগুলিকে আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে। রাজ্যের ঝঞ্ঝাটে অস্থির অশান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। তিনি শিব-ভক্ত লোক। আশা করেছিলেন কাশীতে এসে কিছু শান্তি পাবেন।

সঙ্গে লোকজন ছিল না, স্টেশনে নেবেই তিনি এই লোকটিকে নিযুক্ত করেছিলেন; করেছিলেন তার চেহারার জন্য। ধপধপে ফরসা রং, গম্ভীর মুখভাব। গম্ভীর কিন্তু প্রসন্ন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এগিয়ে এসেছিল লোকটা। বলেছিল—"চলুন মহারাজ—"

বিস্মিত হয়েছিলেন জ্বলজ্যোতি।

"আমাকে চেন না কি—"

"হ্যাঁ, অনেকদিন আগে একবার এসেছিলেন তো? তখন থেকেই চিনি আপনাকে।"

"কোথায় থাক?"

"এখন একটা হোটেলে চাকরি করি। সেইখানেই চলুন। কোনও কষ্ট হবে না আপনার।"

হোটেলে এসে একটা ভাল ঘরে তাঁকে তুলে দিয়ে সে বলেছিল, "মহারাজ, আপনার কি কি চাই আমাকে আদেশ করুন।"

মহারাজ বলেছিলেন—ভাল জরদা চাই, আর কিছু শাড়ি। আর সেকালে জহর বাইজির সঙ্গে আলাপ ছিল, খুব ভালো গান গাইত। সে যদি থাকে তার কাছে নিয়ে যেও আমাকে। আর বাবা বিশ্বনাথ তো আছেনই তাঁর কাছে তো নিশ্চয়ই যেতে হবে—"

লোকটি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "মহারাজ, আজ আপনি যা-যা চাইছেন তার কিছুই তো নেই। সে জর্দা নেই, সে শাড়ি নেই। জহর বাইজি অনেকদিন আগে মারা গেছেন। তাঁর মেয়ে এখন সিনেমায়।"

"তাই না কি! কাশীর জিলিপি?"

"তা-ও নেই।"

"মালাই?"

"তা-ও নেই"—তারপর একটু হেসে বললে "মহারাজ, আগের কিছুই নেই। আপনার রাজ্যই কি আছে?"

"এখানে নবীন মিত্তির ভালো পাখোয়াজ বাজাতেন—"

"তিনি অনেকদিন আগে অন্ধ হ'য়ে গেছেন। তাঁর ছেলেরা এখন তাঁকে খেতে দেয় না।"

"তাহলে বাবা বিশ্বনাথকে দেখে আসি তারপর চলে যাব!"

"বিশ্বনাথও নেই মহারাজ। পাথরটা আছে—"

"সে কি! কোথায় গেলেন তিনি?"

"এখানেই আছেন। কখনও রাজনৈতিক দলের ক্যানভাসার, কখনও দালাল, কখনও রিকসাওলা নানাভাবে দিন কাটাতে হয় তাঁকে। এখন তিনি হোটেলে চাকরি করেন।"

বলেই লোকটি বেরিয়ে গেল মুচকি হেসে।

"ওহে, শোন, শোন—কি করি তাহলে এখন—"

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

মহারাজও বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

আর একটি চাকর এসে দাঁড়াল।

"কাকে খুঁজছেন?"

"যে লোকটি আমাকে নিয়ে এল এখানে—"

"ও, মহাদেব—"

মহাদেব মহাদেব বলে ডাকতে লাগল চাকরটি। মহাদেবের সাড়া কিন্তু পাওয়া গেল না।

সে তখন বলল, "ও লোকটা পাগলা গোছের হুজুর। কোথাও টিকে থাকতে পারে না। সরে' পড়ল বোধ হয়।"

"মহাদেব ওর নাম?"

হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মহারাজ।

এই হল গল্প।

কিন্তু এখন—এই মুহূর্তে—যে চিন্তাটা আমাদের সকলের মনে দাউ দাউ করে আগুনের মতো জ্বলছে তা সাহিত্য-চিন্তা নয়, তা যুদ্ধের

চিন্তা। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ধূর্ত ইংরেজ গদির লোভ দেখিয়ে আমাদের দেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করে যে বিষ-বৃক্ষের বীজ বপন করেছিল সে বিষ-বৃক্ষ বড় হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে এখন। তার বিষ-বাষ্পে আমাদের আত্মসম্মান বিপন্ন, আমাদের আদর্শ আচ্ছন্ন, আমাদের সুখ-শান্তি সহায়-সম্পদ, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সমস্তই যেন এক ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অগ্নি-পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হ'তেই হবে। ওই বিষ-বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করবই আমরা যেমন করে হোক। আমাদের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য যদি আমরা মানুষের মতো একত্রিত করতে পারি তাহলে তা একটুও অসম্ভব হবে না। আমাদের নির্ভর করতে হবে আমাদের নিজেদেরই শক্তির উপর ইংরেজ-আমেরিকার স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে। ভণ্ড প্রতিষ্ঠান ইউ. এন.-এর মুখোশও খুলে পড়ছে বারবার। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে হবে আমাদের, সে শক্তি অমিত, সে শক্তি প্রচণ্ড। সে শক্তি অসাধ্যসাধন করবে যদি তাকে আমরা সংহত করতে পারি। আজ দেশবাসীকে তাই ডাক দিয়ে বলছি— ।

তারাশঙ্কর সম্বন্ধে আমার স্মৃতি

তারাশঙ্কর এখন স্মৃতি হয়ে গেছে! কিছুদিন আগেই সে চলা-ফেরা করত, এখন সে ছবিতে পরিণত হয়েছে। আমাকে আপনারা অনুরোধ করেছেন তার সম্বন্ধে কিছু স্মৃতি-চারণা করতে। আমি একটু মুশকিলে পড়েছি। তার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় এ কথা যেমন সত্য তেমনি সত্য যে অনেক স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। আর একটা কথাও সত্য, সব কথা অকপটে প্রকাশ করা যায় না। এই সব গোপনীয় কথার গোপনীয়তাই মধুর। সে মাধুর্য নষ্ট করা অশিল্পী-জনোচিত, তা আমি করব না। আর একটা কথা আমি ভাগলপুরে বসেই সাহিত্য-সেবা করেছি। কলকাতায় মাঝে মাঝে আসতাম।

এই ক্বচিৎ কখনও আসার সময়েই আমি তারাশঙ্করের সংস্পর্শে আসি। প্রথম আলাপ হয় সজনীর 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। সেখানে তখন বেশ একটা আড্ডা বসত। আমি ভাগলপুর থেকে এসে মাঝে মাঝে সজনীর বাড়িতেই আতিথ্যগ্রহণ করতাম। আমাদের দলের মধ্যে সজনীকান্তই ছিল সবচেয়ে বেশী প্রাণবন্ত পুরুষ। প্রতিভাবান লেখক-লেখিকাদের সে শুধু যে সমাদর করত তা নয়, তাদের সকলের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করত, তাদের আপদে বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করত, তাদের বাড়ি যেত, ধৈর্যভরে তাদের লেখা শুনত, কোথাও খটকা লাগলে অকপটে তা বলত। আমরা সুযোগ পেলেই তাকে আমাদের লেখা শোনাতাম। শুনেছি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি'তে অনেক অংশ সে বাদ দিয়েছিল। বিভূতি যখন 'পথের পাঁচালি'র কোন প্রকাশক পাচ্ছিল না তখন সজনীই সেটা প্রথম প্রকাশ করে। তারাশঙ্করের অনেক লেখাও সজনী শুনত এবং সেগুলো 'শনিবারের চিঠি'তে (পরে 'বঙ্গশ্রী' কাগজেও) প্রকাশ করত। তারাশঙ্করকে সজনীকান্তই সে যুগের বৃহত্তর রসিক সমাজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। অর্থ, সামর্থ্য, সব দিক দিয়েই সে সাহায্য করত তাকে এ কথা তারাশঙ্কর বার বার স্বীকার করে গেছে। তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার নিরবচ্ছিন্ন যোগ ছিল না,—যখন কলকাতায় আসতাম দেখা হত। প্রথম আলাপের দিনটি আমার ভাল মনে আছে।

আড়ময়লা খদ্দরের জামা কাপড় গায়ে। ছিপছিপে রোগা লোকটি এককোণে চেয়ারে বসেছিল। সজনী পরিচয় করিয়ে দিল—একে চেন? তারাশঙ্কর। এ এখন আমাদের একটা গল্প পড়ে শোনাবে। তুমিও শোন। বসে পড়লাম। তারাশঙ্কর পড়তে লাগল। তার কণ্ঠস্বরে একটা চাপা উত্তেজনা আর চোখের স্বতঃস্ফূর্ত দীপ্তি মানুষ তারাশঙ্করকেও যেন মূর্ত করে তুলল আমার কাছে। গল্প পড়া শেষ হলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললাম—চমৎকার হয়েছে' খুব ভালো। তারাশঙ্কর চকিতে একবার আমার দিকে চেয়ে দেখল। তারপরই আমাকে উঠে পড়তে হল। অন্যত্র যাওয়ার কথা ছিল। আমি

উঠতেই তারাশঙ্কর এগিয়ে এসে আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে বলল—ভারি আনন্দ হল আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। আমার গল্পটা সত্যি ভালো লাগল? বললাম—সত্যি, ভালো লেগেছে। সেদিন তারাশঙ্করের চোখে-মুখে যে আনন্দের আলো দেখেছিলাম তা আজও আমার মনে আছে। স্রষ্টা সৃষ্টি করে' একবার আনন্দ পান, আর একবার আনন্দ পান প্রকৃত রসিকের মুখে সে সৃষ্টির গুণগান শুনে। আজকালকার লেখক-লেখিকারা প্রাণ খুলে কারো প্রশংসা করতে পারেন না। প্রাণ খুলে কারও লেখার দোষও দেখাতে পারেন না। এ বিষয়ে তারা বেশী বাক্‌সংযমী। আমাদের সময় আমরা তা ছিলাম না। তারাশঙ্করের, সজনীর, শরদিন্দুর, পরিমলের, বিভূতি বাঁড়ুজ্যের, বিভূতি মুকুজ্যের, সরোজ রায়চৌধুরীর অনেক লেখার প্রশংসা আমি পত্রযোগে করেছি, নিন্দাও করেছি অনেক জায়গায়। কিন্তু তাতে আমাদের বন্ধুত্বে চিড় খায় নি। আমার লেখাও সমালোচনা ওরা করেছে। ওদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছি। কিন্তু সেটা কলহে বা মনান্তরে পরিণতি লাভ করেনি কখনও। আমরা অপরের সমালোচনাকে কখনও মান্য করেছি, কখনও করিনি। কিন্তু এ নিয়ে স্থায়ী তিক্ততার সৃষ্টি হয় নি আমাদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু এমন একটা নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক ছিল যে আমরা প্রত্যেকের পারিবারিক সুখ-দুঃখে সত্যিই বিচলিত হতাম। তারাশঙ্করের একটি মেয়ে যখন মারা যায়—তখন ভারী কষ্ট হয়েছিল আমার। তাকে চিঠি লিখেছিলাম। তার এক জন্মদিনে তার মায়ের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে লাভপুরে গিয়েছিলাম মনে পড়ছে। আর একটা ঘটনাও মনে পড়ছে এই সূত্রে। তারাশঙ্করের বাড়ির বারান্দায় বসেছিলাম। একটি লোক যাচ্ছিল সামনের রাস্তা দিয়ে। তারাশঙ্কর ডাকলো তাকে। আমায় বলল—তুমি ওকে জিগ্যেস কর শ্মশানে শব সাধনা করবার সময় ও কি দেখেছিল। অদ্ভুত জিনিস দেখেছিল একটা। তারপর থেকে পাগল হয়ে গেছে। লোকটি যখন কাছে এল তাকে প্রশ্ন করলাম—শুনলাম আপনি শ্মশানে গিয়ে শব-সাধনা করেছিলেন। কি দেখেছিলেন সেখানে? সে লোকটি

তারাশঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে বলল—এঁকে বলব। তারাশঙ্কর বললে—বলো না। এ আমার বন্ধু। সাহিত্যিক একজন। তখন সে বলল—কিছুই দেখিনি আমি। মড়ার উপর চোখ বুজে বসেছিলাম। খানিকক্ষণ পর চোখ খুলে দেখি মড়ার উপর দুটি পা ঝুলছে শূন্য থেকে। খালি পা আর কিছু না। মা কালীর পা। আর সে পায়ে যে গয়না ছিল তা শত শত সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের চেয়েও উজ্জ্বল রূপময়। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আমি কিছু দেখতে পেলাম না। পা-পা-পা—কেবল পা দুটি দেখলাম। পা-পা-পা—চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল লোকটা। তারাশঙ্কর বললে—লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

আমি তারাশঙ্করের বাড়িতে গিয়ে বলেছিলাম, আমাকে বীরভূমী রান্না খাওয়াও। কলায়ের ডাল, পোস্ত, আর কচিকচি মাছের টক। বাড়ির মেয়েরা চমৎকার রান্না করেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে ছিল এক বাটি মাংসও। কারণ এটা রটে গিয়েছিল যে আমি রোজ মাংস খাই। তারাশঙ্কর একাধিকবার ভাগলপুরে আমার বাড়ি গিয়েছিল এবং তাঁর বরাদ্দ মতো সুক্তো এবং আঝালা ঝোল রান্না করতে হয়েছিল আমার স্ত্রীকে তারাশঙ্কর কিছুই খেতে পারত না তখন। খেত কেবল ঘন ঘন চা আর সিগারেট। সে যুগের কথা ভাবতে গিয়ে একটা কথাই মনে পড়ছে, আমরা—সে যুগের উদীয়মান লেখকরা—এমন একটা প্রীতির সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ ছিলাম যে সেটা প্রায় পারিবারিক বন্ধনের মতোই হ'য়ে উঠেছিল। আমাদের পরিচিত মহলে তারাশঙ্কর ছিল বড়বাবু, আমি ছিলাম মেজবাবু, আর সজনী ছিল ছোটবাবু। আমরা বড়বাবু তারাশঙ্করকে বড়দার মর্যাদাই দিয়ে এসেছি বরাবর। দেখা হলে প্রণাম করেছি, অগ্রজকে যেমন করি। তারাশঙ্কর বয়সে আমার চেয়ে একবছর বড় ছিল। সজনী ছিল একবছর ছোট। বীরেন ভদ্র (বিখ্যাত বিরূপাক্ষ) আমাদের আর একজন বন্ধু ছিল। সে আমাকে এখনও মেজবাবু বলেই সম্বোধন করে। তারাশঙ্করও আমার প্রতি যে অনুজসুলভ ব্যবহার করেছে বরাবর তার স্মৃতি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভাগলপুরে ১৩৪৬ সালে ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আমার

জন্মদিনে আমাকে যে সম্বর্ধনা দিয়েছিল সে সম্বর্ধনা সভায় সজনীকান্ত দাস একটি অভিনন্দন পত্র নিয়ে গিয়েছিল। অভিনন্দন পত্রটি লিখেছিল তারাশঙ্কর। পাটনায় ১৩৬৪ সালে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনও আমাকে সম্বর্ধনা দিয়েছিল একবার। অসুস্থ ছিল বলে তারাশঙ্কর সেখানে যেতে পারে নি। কিন্তু লোক দিয়ে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছিল আমাকে। আর একটা কথাও মনে পড়ছে। ভাগলপুরে সেবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বর্ণজয়ন্তী হয়। কলকাতা থেকে অনেক সাহিত্যিক এবং গায়কেরা তখন এসেছিলেন আমার বাড়িতে। সভা হচ্ছে। সভায় ভাগলপুরের একজন ভদ্রলোক উঠে ভাগলপুরের অতীত গৌরব কীর্তন করে অবশেষে বললেন, এখন ভাগলপুরের আর কিছুই নেই। তবু আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মান্য করে দিন কাটাচ্ছি। 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত ইঙ্গিতে গেছে থামিয়া—ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।' ভদ্রলোক বসতে না বসতে তারাশঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বলল—যেখানে বনফুল এখনও মধ্যাহ্নদীপ্তিতে বর্তমান সেখানে উনি সন্ধ্যার অন্ধকার কি ক'রে দেখছেন তা আমার মাথায় আসছে না। পুরুলিয়ায় আর একটা সভায় আমরা দু'জনেই উপস্থিত। একজন ভদ্রলোক হঠাৎ তারাশঙ্করকে নমস্কার করে' বললেন—আপনার 'জঙ্গম' পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। বক্তৃতা করবার সময় তারাশঙ্কর বলল—সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে যখন আপনাদের সম্যক পরিচয় নেই তখন আপনারা সাহিত্যিকদের এ সভায় নিমন্ত্রণ করেছেন কেন বুঝলাম না। আপনাদের পয়সা আছে বাইজি এনে নাচ দেখলেই পারতেন। তারাশঙ্কর এই রকম স্পর্শকাতর ছিল। হঠাৎ হঠাৎ রেগে উঠত। আবার ঠাণ্ডাও হয়ে যেত পরক্ষণে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন লেখাটা আমার পেশা হয়ে ওঠেনি। ডাক্তারি করার ফাঁকে ফাঁকে লিখতাম মাঝে মাঝে টাকাও পেতাম। কিন্তু তারাশঙ্করের অন্য কোন পেশা ছিল না। নানা জায়গায় ছোটখাটো চাকরিও করেছে সে, আর লিখে কিছু পয়সা রোজগার করবার চেষ্টাও করেছে। সজনী এ বিষয়ে

তাকে অনেক সাহায্য করত। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় তার অনেক লেখা প্রকাশ করেছিল সে। জীবনের গোড়া থেকেই তারাশঙ্কর রাজনৈতিক আন্দোলনে মেতে ছিল। সে জাত সাহিত্যিক ছিল, সুতরাং রাজনীতির সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। তার এই দু' নৌকায় পা নিয়ে আমি অনেকবার তীব্র ব্যঙ্গ করে কবিতায় চিঠি লিখেছি তাকে, রেগে সে চিঠির উত্তর দেয় নি। যখন দেখা হয়েছে তখন তর্ক করেছি। কিন্তু তা কখনও মনান্তরে পরিণত হয় নি। আমার ব্যঙ্গ আমার তর্ক সাহিত্যের পরিবেশেই নিবদ্ধ ছিল, আমাদের অন্তরকে বিরক্ত করে নি। ভাগলপুরে বসে একবার শুনলাম—সন্দীপন পাঠশালায় অভিনয় নিয়ে মহা হৈ চৈ হয়েছে। তারাশঙ্করকে কতকগুলো গুণ্ডা নাকি মেরেছে। শুনে বড়ই কষ্ট হল। স্মারক নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখে পাঠালাম। কবিতাটি যতদূর মনে পড়ছে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার গোড়াটা হচ্ছে—

উলঙ্গের দেশে যথা রজকের নাহি প্রয়োজন,
পরশ্রীকাতর দেশে কোথা পাবে শ্রীমান শ্রীমতী
গোলদারি কারবারে মণ দরে যেথায় ওজন
হীরা বা নিক্তির কথা সেখানে যে অবান্তর অতি।

আর শুনেছি তারাশঙ্কর নাকি ওই সব গুণ্ডাদের ক্ষমা করে' তাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল আবার। এটাও তারাশঙ্করের অদ্ভুত চরিত্রের একটা লক্ষণ। কারো সঙ্গে ঝগড়া করে বেশীক্ষণ থাকতে পারত না। দু'চারদিন পরে আবার তার সঙ্গে ভাব করে ফেলেন।

অনেক সভা, সমিতি, সম্মিলন, সংঘ প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিল সে। বরাবরই তার এ সব বিষয়ে প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। এ সব করে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাদের দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের নেক-নজরেও পড়েছিল সে। সে এম. এল. এ. ছিল, পার্লামেণ্টের সদস্যও ছিল বোধহয়। সরকারের পয়সায় চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও ঘুরে এসেছিল সে। তার এই প্রবণতার সঙ্গে আমার মনের সায় ছিল না। কিন্তু এজন্য আমাদের বন্ধুত্বের ছন্দ-পতন হয় নি।

সে আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে খাতির করত, আমিও করতাম তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে। আমার সঙ্গে তার মতের এবং তার জীবনদর্শনের মিল না থাকা সত্ত্বেও যে তাকে ভালোবেসেছিলাম তার কারণ তার চরিত্রের ওই বিশিষ্টতা। তারাশঙ্করের সামাজিক সদ্ব্যবহারেরও অনেক পরিচয় পেয়েছি। আমি যখন ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে বাড়ি করলুম—তখন একদিন এসে সে বললে—তুমি ভাগলপুর ছেড়ে এসে ভুল করলে। কলকাতায় থাকতে পারবে কি? আমি বললাম, তোমরা যখন পারছ তখন আমিও পারব। সে বলল আমি ভাবছি লাভপুর গিয়ে থাকব। বললাম, তুমি যখন লাভপুর যাবে আমি তখন বিহার ফিরে যাব। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি আর লাভপুর গিয়ে থাকতে পারবে না। কলকাতা শত বন্ধনে বেঁধেছে তোমায়।

সত্যি আর সে লাভপুর ফিরতে পারে নি। কিন্তু সে বোধহয় একটু ভয়ে ভয়ে থাকত। যেখানে যেত—সঙ্গে একজন পাহারাদার নিয়ে যেত। শুনেছিলাম সে নাকি কোন রাজনৈতিক দল থেকে চিঠি পেয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি।

গত দু' তিনমাস থেকে পূজার লেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল দু'জনকেই। অনেকদিন দেখা হয় নি। শেষবার যখন দেখা হয় তখন একটা কৌতুকজনক ব্যাপার শুনলাম। সে নাকি রোজ ম্যাগ সাল্ফ খায় পেট পরিষ্কার করার জন্য। আমি বললাম—রোজ খেও না। কিন্তু রাজি হ'ল না সে।

জীবনের শেষের দিকে ধর্মের উপর সে খুব জোর দিয়েছিল। রোজ ঠাকুরঘরে ঢুকে পূজা করত। গলায় একটা মালাও থাকত সর্বদা। শুনেছিলাম—কোন এক সাধুর কাছে না কি মন্ত্র নিয়েছে। অনেকদিন আগে সজনীর কাছে শুনেছিলাম সে এক ফকিরের খোঁজে রাত্রে গড়ের মাঠে গিয়ে না কি গুণ্ডাদের হাতে পড়েছিল। এ খবর সত্যি কি মিথ্যে জানি না। শুধু এইটুকুই জানি খামখেয়ালী তারাশঙ্করের পক্ষে সবই সম্ভব।

ইদানীং নানারকম ওষুধ খেত সে। নানারকম পিল। তার ওষুধ খাওয়ার গল্প বীরেন ভদ্র লিখেছে। দু'ঘণ্টা অন্তর অন্তর কিছু না কিছু খেত একটা। আমাকে বলেছিল—আমার স্ত্রী ওষুধ খাওয়ার ঘোর বিরোধী। আমি ওকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাই।

আরও নানা কথা মনে পড়ছে। কিন্তু সব কথা তো লেখা যাবে না। সুতরাং এইখানেই থামলাম।

মহৎপূজা

মহৎপূজার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই সভায় কিছু আলোচনা হইবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সে আলোচনায় আমাকে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি হিমালয়ের মতো উত্তুঙ্গ, সাগরের মতো সুবিস্তীর্ণ, আলোকের মত সদা-স্বচ্ছ, সমীরণের মতো সদা-প্রবহমান মহৎ ব্যক্তিরা। তাঁহাদের পরিচয় পাইলে অনেক লোকই তাঁহাদের পূজা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠেন স্নানাহারের যেমন প্রয়োজন, মহৎপূজাও তেমনি তাঁহাদের নিকট প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে পিপাসিত চিত্তে শান্তি বহন করিয়া আনে। কিন্তু মহৎ ব্যক্তিকে আমরা সব সময়ে চিনিতে পারি না, কারণ তাঁহাদের অস্তিত্ব অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। তাঁহারা তাঁহাদের বিরাট ব্যক্তিত্ব অনেক সময় বিনয়ের আবরণে এমন লুকাইয়া রাখেন যে অনেকেই তাঁহাদের চিনিতে পারেন না। দুর্ভেদ্য আত্মগোপনতার অন্তরালে তাঁহাদের হিমালয়-ব্যক্তিত্ব, সমুদ্র-উদারতা আলোক-স্বচ্ছতা, সমীকরণ-প্রশান্তিও ঢাকা পড়িয়া যায়। নিজেদের মহিমা লইয়া তাঁহারা কোলাহল-হীন নীরব নিভৃততায় বাস করিতে ভালবাসেন। আত্মবিজ্ঞাপনে তাঁহাদের মোটেই রুচি নাই। ইঁহারা কখনও অকস্মাৎ কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হন। কিন্তু লেখক সমাজ

আত্মপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। যে সব মহাত্মারা আত্মপ্রকাশ করিয়া সমাজে বাস করেন, তাঁহাদের পূজা লোকে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া করেন। কিন্তু এই পূজা দ্বিবিধ। একদল ভক্ত তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন, আর একদল গালাগালি দেন। গালাগালিও একরকম পূজা। এরকম পূজা আমাদের দেশের বিবেকানন্দরা, বিদ্যাসাগরেরা অনেক পাইয়াছেন। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে বিরাটকায় হস্তী যখন রাজপথ দিয়া চলিয়া যায় তখন তাহার পিছনে যে কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করে তাহারাও হস্তীর অনিবার্য অস্তিত্বকে শ্বাপদ-সুলভ ভঙ্গীকে স্বীকার করে। এই স্বীকারও একরকম পূজা।

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে মহৎ ব্যক্তি মাত্রই তেমনি জন-সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। মহৎ ব্যক্তিরা পূজা পাইবার জন্য মোটেই আগ্রহশীল নন। কিন্তু তবু অনিবার্য ভাবে পূজারীর ভীড় তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়ায়। কারণ অসাধারণকে উপেক্ষা করা তাঁহাদের সাধ্যতীত। তাই—

হে মহৎ, তোমারে পূজিবারে তাই অনুক্ষণ,
তোমারি মাঝারে আছে জ্যোতির্ময় সত্য নারায়ণ।

পুলিশ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের উৎসবে আমাকে যে আপনারা স্মরণ করিয়াছেন এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দেশে পুলিশ একটা আতঙ্কজনক নাম। সাধারণ লোকে বাঘের মুখে পড়া আর পুলিশের কবলে পড়াকে একই শ্রেণীর দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করে। আপনারাও যে সাধারণ মানুষের মতো উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারেন, আপনারাও যে অবসর-বিনোদন

করিয়া নূতন শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত একথা অনেকেই হয় তো বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। তবু একথা সত্য। আপনারা লাঠি, বন্দুক, বোমা, কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করেন। কিন্তু আপনারা লাঠি, বন্দুক, বোমা বা কাঁদুনে গ্যাস নন—আপনারা মানুষ, আপনাদেরও মানবিক সাধ-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ আছে। আপনারাও আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আপনারাও আমাদের মতো সমাজের মঙ্গল চান। সমাজের মঙ্গল-বিধানের জন্যই আপনাদের অপ্রিয় বীভৎস এবং অনেক সময় ভয়ঙ্কর আচরণ করিতে হয়, সেজন্যই লোকেরা আপনাদের ভয় করে। আমি ডাক্তার। লোকের ব্যাধি সারাইবার জন্য অনেক তিক্ত ঔষধ, অনেক অস্ত্রশস্ত্রাদি, অনেক প্রচণ্ড আচরণ আমাদেরও করিতে হয়। তাই ডাক্তাররাও অনেক সময় জনসাধারণের কাছে ভীতিপ্রদ জীব। সে যাহাই হোক মানুষের মনের চিরন্তন দাবি অনিবার্য। সে দাবি কি? সে দাবি আনন্দের। সেই দাবির তাগিদেই আপনাদের এই উৎসব, সেই দাবির তাগিদেই আজ আপনাদের সমস্ত সভা আনন্দ-উৎসবমুখর হইতে চাহিতেছে। আনন্দ চাই, আনন্দ চাই, আনন্দই অমৃত, আনন্দই মনের ক্লান্তি দূর করে। আনন্দই মনুষ্যত্বকে উদ্বোধন করে। এ আনন্দ পশু-সুলভ আনন্দ নয়। পশু-সুলভ আনন্দ গ্লানিময়, তাহা অবসন্ন করে, উদ্বুদ্ধ করে না। সভ্য মানব—আনন্দের সন্ধান সর্বদাই করিয়া থাকেন। সে আনন্দ আমাদের অবচেতন মানসলোকে একটি বাণীই বার বার বলে যে বাণীর বার্তা আমরা উপনিষদে পাইয়াছি—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ নিবোধত

আপনাদের এই আনন্দ উৎসব সফল হউক এই কামনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। নমস্কার।

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

যাঁহার স্মৃতি-তর্পণ-মানসে আজ আমরা এখানে আসিয়াছি সেই মহাপুরুষ মহেন্দ্রনাথ দত্ত শুধু যে বিবেকানন্দের ভাই বলিয়াই সম্মানাস্পদ তাহা নহে, তাঁহার নিজের চরিত্র, তাঁহার নিজের কৃতিত্ব, তাঁহার নিজের তপস্যাই তাঁহাকে সম্মানের আসনে স্থাপিত করিয়াছে। মহেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। মানুষ হিসাবে তিনি বড়, গ্রন্থকার হিসাবে তিনি বিখ্যাত, সাধক হিসাবে তিনি পূজনীয়। তাঁহার কীর্তি-কলাপ সুবিদিত। উনবিংশ শতাব্দীতে যে জ্যোতির্বিদ্ বা জ্যোতিষ্কদের মিছিল বাংলার আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইহার উদ্দেশ্যে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করি। কিন্তু বর্তমানে যাহা প্রবলভাবে মনে জাগিতেছে তাহাও আজ এই সুযোগে নিবেদন করিব। প্রশ্ন করিব বাঙালীর সেই গৌরবময় উনবিংশ শতাব্দীর সমারোহ আর কি ফিরিয়া আসিবে না? স্বাধীনতা লাভের পর হইতে সমস্ত সমাজ, সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা, সমস্ত সংস্কৃতি-গৌরব অধঃপাতের নারকীয় কুণ্ডে কি করিয়া কেন কাহার দোষে এমন বীভৎসভাবে আবর্তিত হইতেছে। কেন একদা-পূজ্য একদা-সম্মানিত বাঙালী আজ সর্বত্র ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইতেছে, ইহার সদুত্তর কে দিবে? সেই উত্তর চিন্তা করিয়া আবিষ্কার করিতেই হইবে। আমার মনে হয় যে মহাত্মার স্মৃতি-তর্পণ করিবার জন্য আমরা আজ সমবেত হইয়াছি—সেই মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিলেই আমরা ইহার সদুত্তর পাইব। যে ধর্ম ভারতের বৈশিষ্ট্য, যে ধর্ম সমাজকে সংহত করে, যাহার বলে মানুষ দেবতা হয়, যে ধর্মের মূল মর্ম সাম্য, যে ধর্ম মানুষকে নির্ভীক করে, জ্ঞানী করে, যোগী করে, আবার আদর্শ যোদ্ধা ও আদর্শ রাজার মহিমাও দান করে সেই ধর্মের সাধক ছিলেন মহেন্দ্রনাথ। আমাদের দুর্ভাগ্য সে ধর্ম আমরা হারাইয়াছি। সেই ধর্ম যাহাতে সমাজ-জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের হিতৈষীরা সেই চেষ্টা করুন—এই অনুরোধ জানাইয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। নমস্কার।

সমাজ-গঠনে সৎ সাহিত্যের ভূমিকা

সমাজের উপর সৎ সাহিত্যের কি প্রভাব আছে এবং কতটা প্রভাব আছে এ নিয়ে সৎ সাহিত্য স্রষ্টারা কোনদিন মাথা ঘামায়নি। সৎ সাহিত্য বলতে আমি সেই সাহিত্যের কথা বলছি যা সৃষ্টি-ধর্মী এবং যা রসিকদের কাছে আদৃত হয়েছে। রসিক কে? এ প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যায় না। সকলেই নিজেকে রসিক মনে করেন। কিন্তু আমার ধারণা প্রকৃত রসিকের সংখ্যা খুব বেশী নেই। প্রকৃত কবির সংখ্যাও কম। কবি এবং রসিকদের যদি একটা সম্প্রদায় বলে' মনে করি তাহলে তাঁদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে হবে। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমাজের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, আপাত-দৃষ্টিতে এই কথাই মনে হয়। যাঁরা প্রকৃত কবি তাঁরা এ নিয়ে মাথাও ঘামায় না। সৃষ্টির প্রেরণা যখন তাঁদের মনে জাগে তখন সেই প্রেরণার তাগিদেই তাঁরা সৃষ্টি করেন, সে সৃষ্টি কারও উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে কি না এ চিন্তা প্রায়ই তাঁদের মনে থাকে না। তাঁরা অবশ্য খুশি হন রসিকদের দেখা পেলে। আরও খুশি হন কোনও প্রকাশক তাঁর লেখা যদি প্রকাশ করেন। সমাজের উপর তাঁদের লেখা কোনও প্রভাব বিস্তার করছে কি না এর হিসাব-নিকাশ করবার কোন প্রয়োজনই তাঁরা অনুভব করেন না। তাঁরা প্রায়ই আত্মকেন্দ্রিক এবং প্রচার-বিমুখ। এইটেই তাঁদের স্বধর্ম। হাটের হট্টগোল তাঁরা পছন্দ করেন না। অনেক প্রতিভাবান কবি ষড়রিপুর প্ররোচনায় অনেক সময় স্বধর্মচ্যুত হন এমন উদাহরণ সাহিত্য জগতে অবশ্য বিরল নয়। অনেকেই মানবিক দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে আত্ম-প্রচারে লেগে পড়েন নিজের ঢাক নিজেই বাজিয়ে বেড়ান চতুর্দিকে। কিন্তু স্বধর্ম-চ্যুত হন বলে' স্রষ্টার আসনে বেশী দিন সমাসীন থাকতে পারেন না এঁরা।

রাজনৈতিক নেতারা যে পদ্ধতিতে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন, যে কৌশলে সমাজের ভাগ্যবিধাতা হবার সুযোগ তাঁদের হয়—প্রকৃত

কবিরা সে পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করেন না, করতে পারেন না, কারণ যাঁরা স্রষ্টা তাঁরা নিভৃত-বিলাসী, তাঁরা সত্যাশ্রয়ী, তাঁরা মিথ্যার মুখোশ পরে থাকতে পারেন না একেবারেই।

তবু কি সমাজের উপর তাঁদের কোন প্রভাব নেই একেবারেই। আছে বই কি। কিন্তু সে প্রভাব খুব স্পষ্ট নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন সে সাহিত্য কি সমাজের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করেছে? সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলি খুললে মনে হয় যাদের খবর কাগজে ছাপা হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের জীবন বঙ্কিম-রবীন্দ্রের সাহিত্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সমাজের চারিদিকে চেয়েও এই একই কথা মনে হয়। তাহলে কি বলতে হবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি সমাজ জীবনে সত্য-শিব-সুন্দরের বার্তা বহন করে আনতে পারেনি?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পারেনি। কিন্তু আপাতদৃষ্টি দিয়ে আমরা সব দেখতে পাই না। আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বনস্পতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সাহিত্য-স্রষ্টারা যে বীজ সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দেন চারিদিকে তার কিছু কিছু অবশ্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কিছু বেঁচেও থাকে, অঙ্কুরিত হয় এবং বনস্পতিকে মূর্ত করে। এই বনস্পতিদের সংস্কৃতির এই বাহক ও ধারকদের সংখ্যা হয়তো খুব বেশী নয় সমাজে, কিন্তু এঁরা আছেন এবং ক্রমশ সংখ্যায় বাড়ছেন এইটেই আশার কথা।

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় যে সমাজের চিত্র আমরা পাই সে সমাজ কি এখন আছে? সে সমাজকে বদলে দিল কে? আমার মনে হয় সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাব।

সাহিত্য তাড়াহুড়া করে না, ভোট সংগ্রহ করে নিজের দলে লোক টানবার চেষ্টা করে না, কেবল সত্য-শিব-সুন্দরের আলোকে জ্যোতির্ময় হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

তাতেই সমাজ প্রভাবিত হয়। ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু হয়।

সাহিত্য কথা

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আমাকে কেন্দ্র করিয়া আজ আপনারা সে সংবর্ধনা-উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন তাহা আপনাদের সহৃদয়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মনে হইতেছে আমি হয়তো এত সম্মানের উপযুক্ত নই। তথাপি আপনাদের এই সৌজন্যের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন আমাদের দেশের একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর ভারতের নানা স্থানে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিকদের মিলন ঘটাইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি সাহিত্যের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে মূর্ত করিয়া রাখিয়াছেন। একের সহিত অপরকে যুক্ত করাই সাহিত্যের সার্থকতা। এই সুযোগে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যসংসারের দাদামশাই স্বর্গীয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

এ সভা বস্তুত সাহিত্য-সভা। তাই সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাল্যকাল হইতেই আমি সাহিত্য-সেবায় ব্রতী। প্রথমে তেমন উপলব্ধি করি নাই, কিন্তু পরে বুঝিয়াছি এ সেবায় প্রধান উপকরণ আনন্দ, এ পথের প্রধান পাথেয় আনন্দ এবং শেষ লক্ষ্যও আনন্দ। ইহার অধিক কিছু কামনা করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়। সাময়িক স্তুতি-নিন্দার দোলায় লেখকমাত্রেই আন্দোলিত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে সব স্তুতি বা নিন্দা অনেক সময় মূল্যহীন। যিনি প্রকৃত কবি তিনি তাঁহার সাধনার পুরস্কার নিজের অন্তর্যামীর নিকট হইতেই পান, সেজন্য বাহিরের কোন সমালোচকের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয় না।

আজকাল সাহিত্যের নানারকম জাতি-বিচার হইয়াছে। কোনও সাহিত্য বাস্তব, কোনটা বা রাজনৈতিক। আধুনিক, ছায়াবাদী, এই

সব লেবেলও অনেক সাহিত্যের গায়ে আঁটা রহিয়াছে। বর্তমান বণিক-বৃত্তির যুগে, যন্ত্রতাড়িত, রাজনীতি-লাঞ্ছিত পরিবেশে অনেকে মনে করিতেছেন যে সাহিত্য যদি যুগোপযোগী না হয় তাহা হইলে সে সাহিত্য টিকিবে না। বুশ-সার্ট এবং আধুনিক মার্কিন সাঁটা প্যান্টালুনের মতো সাহিত্যকেও আধুনিকতার দাবি মানিতে হইবে।

বিখ্যাত ইংরেজী লেখক Lowes Dickinson তাঁহার এক পুস্তকে তাঁহার সৃষ্ট এক জার্নালিস্টের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন — What is not accelerated will be extinguished and if we cannot answer the ultimate questions...a few centuries hence there will be nobody left to answer them. আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞ সমালোচকরাও সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা উচ্চারণ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন সাহিত্যিকেরা বর্তমান যুগের দ্রুতগতির সহিত যদি তাল রাখিয়া না চলিতে পারেন, তাঁহারা জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান করিতে যদি অক্ষম হন, রাজনীতির জটিল সংঘর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে যদি তাঁহাদের আপত্তি থাকে তাহা হইলে, উক্ত জার্নালিস্টের মতে, a few centuries hence তাঁহাদের সাহিত্যের আর অস্তিত্ব থাকবে না। যাঁহারা প্রকৃত কবি, যাঁহারা কেবল সাহিত্য ব্যবসায়ী নহেন, তাঁহারা এসব ধমকে বা হুমকিতে বিচলিত হন না। তাঁহারা জানেন আকাশ, বাতাস, আলো, জলের মতো তাঁহাদের সৃষ্টিও চিরন্তন। জুঁই ফুলের বয়স কত সেঞ্চুরি? সে কোনও ultimate questions-এর জবাব দেয় নাই, তবু সে তো আজও সগৌরবে বাঁচিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ 'মেসিন গান' এর যুগে নির্ভয়ে জুঁই ফুলের গান গাহিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত কবিরা চিরকালই নির্ভীক। তাঁহারা জানেন জীবন পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রকাশ সীমাহীন, তাহা যুগে যুগে বিচিত্র, তাহার বহিরঙ্গের প্রসাধন নিত্য নবীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর আজ নাই, কিন্তু প্রজাপতি আছে। তাহাই বা কি কম সুন্দর। আর একটা কথাও কবিরা জানেন। তাঁহারা জানেন এই চিরপ্রবহমান

নিত্যপরিবর্তনশীল জীবনধারার মধ্যেও এমন একটা কিছু আছে যাহা শাশ্বত, যাহা চিরসত্য, যাহার সৌন্দর্য এবং শিবত্ব চির-অম্লান। মানুষের মনও এই শাশ্বত সুধার জন্যই ব্যাকুল। সে বিজ্ঞাপনের মোহে মুগ্ধ হইয়া 'A cat on a hot tin roof'-এর পাতা উলটাইতে পারে, কিন্তু তাহার মন তাহাতে তৃপ্ত হইবে না, তাহাকে শেষ পর্যন্ত অমর কাব্যলোকে গিয়াই অমৃতের সন্ধান করিতে হইবে। এই অমর কাব্য-লোকের যাঁহারা স্রষ্টা তাঁহারা এই শাশ্বতকে সুন্দর রূপে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বাণীর নির্মল নির্মাল্য তাঁহাদের মস্তকে যুগে যুগে শোভমান। তাঁহারাই চিরকালের আধুনিক। সাহিত্যের জগতে আধুনিকতা সময়ের মানদণ্ডে নির্ণীত হয় না। চিরন্তন সত্যের, অবিনশ্বর সৌন্দর্যের এবং শাশ্বত শিবত্বের হিসাবই সাহিত্য জগতের একমাত্র হিসাব। সে হিসাবে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সকলেই আধুনিক, পৃথিবীর সাহিত্যে যাঁহারা সগৌরবে classics-এর পর্যায়ে উঠিয়াছেন তাঁহারাও আধুনিক। তাঁহারা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা চিরকালের জিনিস, তাহা রসোত্তীর্ণ তাই কালোত্তীর্ণ। তাই শেক্‌স্‌পীয়র, টলস্টয় প্রভৃতি বিরাট প্রতিভাবানদের সংস্পর্শে আসিলে আমরা আজও আনন্দ পাই, চিরকাল পাইব। ১৩৭১ সালে যিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন, তিনিই যে কেবল আধুনিকতার দাবি করিতে পারেন এ নিয়ম সাহিত্য জগতে অচল। শাশ্বতের চারণরাই কেবল আধুনিক।

অনেকে আবার কবির এই পরিচয়েই সন্তুষ্ট নন। কবির জীবনের নানা খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সন্ধান করিতে চান। কবি নিজে কিন্তু তাঁহার কোন স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করিতে পারেন না। তাঁহার সৃষ্টি বহুলোকের মানসদর্পণে বহুভাবে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে বহুরূপী করিয়া তোলে। কেহ তাঁহাকে পূজা করে, কেহ তাঁহাকে ঘৃণা করে, কেহ বা তাঁহাকে উপেক্ষা করে, কেহ হিংসা-বিষে জর্জরিত হয়, কেহ বা আবার অনুরাগে রঞ্জিত হয়। কেন এমন হয় তাহা নির্ণয় করা কবির পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি অস্পষ্টভাবে কেবল

অনুভব করেন সকলের নিকট তাঁহার মূল্য সমান নহে, তাঁহার পাঠক-পাঠিকাগণ প্রত্যেকেই তাঁহাকে নিজের মতো করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষ কোন একটা স্বাতন্ত্র্যের ছাঁচ বা ছাপ সম্ভবত তাঁহার নাই। তিনি সকলের এবং সকলেই তাঁহার এই পরম সত্যের স্রোতে গা ভাসাইয়া অবশেষে তিনি সেই ঘাটে গিয়া উত্তীর্ণ হন যেখানে সবই এক এবং একই সব।

বহুকালপূর্বে ইহা লইয়া আমি ছোট একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলাম, সেইটিই পাঠ করিয়া আমি আমার ভাষণ শেষ করিব।

জানি না তো আছে কিনা আমার স্বতন্ত্র পরিচয়
অসংখ্যের পরিচয়ে আমার আমিরে দেখি আজ
সকলের দুঃখ সুখ স্নেহ দ্বেষ আনন্দ বিস্ময়
কভু মোরে করে ভিক্ষু, কখনও সাজায় মহারাজ।

সীমাহীন বেলাতটে উচ্ছ্বসিত সমুদ্র বিশাল
বুকে যার কোটি জীব মুখে যার আকাশের ছায়া
তাহারও স্বাতন্ত্র্য কভু স্বীকার করে না মহাকাল
শুষ্ক মরুভূমি হ'য়ে সেও রচে মরীচিকা-মায়া।

চলমান এ জীবনে বলবান প্রবাহ কেবল
রূপের স্বাতন্ত্র্য বন্ধু অবলুপ্ত হয় রূপান্তরে
অন্ধকার গৃহকোণে চক্ষে যার অশ্রু টলমল
সেই পুন সন্ন্যাসী যে আলোকিত উদার প্রান্তরে।

স্বাতন্ত্র্য চাহি না, বন্ধু, করিয়াছি আত্মসমর্পণ
ছবি আসে ছবি যায় নির্বিকার মানসদর্পণ।*

*পাটনায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে অভিভাষণ। ১৯শে জুলাই, ১৯৬৭

শ্রদ্ধাস্পদ সতীনাথ ভাদুড়ী

বাংলা সাহিত্যের যশস্বী লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর তিরোধান ঘটল। আমাকে তার স্মৃতিকথা লিখতে হবে তা কখনও ভাবি নি। সতীনাথ আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিল। অনুজের শ্রাদ্ধসভায় অগ্রজকে আসতে হল এটা পরিতাপের বিষয়। কিন্তু কি করা যাবে, আমাদের চোখে - যা অশোভন মহাকালের চোখে তা নয়। মহাকাল 'ডিক্‌টেটার'। তাঁর বিচার মানতে হবে।

সতীনাথের কথা কি বলব? একটি সলজ্জ, মিতবাক, বিনয়ী, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ মনে পড়ছে। ঘনিষ্ঠতা বলতে সাধারণত যা বোঝায় সতীনাথের সঙ্গে সেরকম ঘনিষ্ঠতা আমার ছিল না। সামাজিক ঘনিষ্ঠতা করবার প্রবণতাই ছিল না তার। দূরে দূরে একা একা থাকতেই সে ভালবাসত। কিন্তু তবু বলব তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। আকাশের মেঘের সঙ্গে, চাঁদের সঙ্গে, তারার সঙ্গে আমার যে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা সতীনাথের সঙ্গেও আমার সেই রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার প্রতিভার প্রদীপ্ত পরিচয় মুগ্ধ করেছিল আমাকে। আমি পূর্ণিয়া জেলার লোক, সে-ও পূর্ণিয়াবাসী, এই আকস্মিক যোগাযোগে গর্ব অনুভব করেছি। যে কল্পলোকের কোনও ভৌগোলিক সীমানা নেই, সেই কল্পলোকের অলি-গলিতে, হাটে-বাটে-ঘাটে, কখনও বর্ষণমুখর বর্ষায়, কখনও জ্যোস্নাবিহসিত নির্ঝরিণীর ধারে, কখনও বা ঘন অন্ধকারে আবছাভাবে—নানা রূপে তার যে ছবি দেখেছি সে ছবির ফোটোগ্রাফ কোন অ্যালবামে নেই, কিন্তু সেই তার সত্য রূপ। তার এ রূপের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। এ রূপকে ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি।

চায়ের আড্ডায়, তাসের আসরে, খেলার মাঠের হৈ-হৈ বা নিমন্ত্রণ বাড়ির হট্টগোলে, তাকে বড় একটা দেখা যেত না। পরনিন্দার গুজগুজ-ফুসফুসেও আনন্দ পেত না সে। নিজের চারিদিকে স্বাতন্ত্র্যের পরিবেশ

সৃষ্টি করে নিরালার নির্জন মহিমা উপভোগ করতেই সে ভালবাসত। পাদ-প্রদীপের সামনে এসে গলায় মালা পরে হাততালি কুড়োবার লোভ ছিল না তার। কোনও নামজাদা সাহিত্যসভায় তাকে সভাপতিত্ব করতে দেখি নি। ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবে একাধিক বার তাকে আমন্ত্রণ করেছি, কোনও না কোনও ছুতো দেখিয়ে সবিনয়ে সে এড়িয়ে গেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর লেখক ছিল সে—কিন্তু সে সম্বন্ধে তার মনে কোনও মোহ ছিল না। মনে পড়ছে একবার যেন সে আমাকে বলেছিল, "বলাইদা, আমি লেখক নই, পাঠক। পড়ত খুব। বস্তুত, বেশীর ভাগ সময়ই পড়ত। বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী, সংস্কৃত, ফরাসী ভাষা জানত সে। জার্মান এবং রুশ ভাষা শেখবারও চেষ্টা করছিল শুনেছি। কিন্তু বিদ্যের ভুড়ভুড়ি কাটতে দেখি নি কখনও তাকে। সে পূর্ণকুম্ভ ছিল, তাই বক বক করত না। তবে এই মৌন মহিমার, এই বিদগ্ধজনোচিত বিনয়ের সম্পূর্ণ মর্যাদা খুব কম লোকেই তাকে দিয়েছে। সে যেন সসঙ্কোচে একটু দূরে দূরে বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে আছে—তার এই ছবিটাই বার বার ফুটে উঠছে মনে। তবে কি পূর্ণিয়ায় সে একেবারে নিঃসঙ্গ ছিল? না ঠিক তা নয়। বন্ধু ছিল তার কয়েকজন। সবাই প্রায় বাল্যবন্ধু। ডাক্তার অমর ভট্টাচার্য, ন্যাড়া (ভাল নাম জানি না), এবং আরও দু-একজন। অমরের ডিসপেন্সারিতে রোজ সন্ধ্যাবেলায় একবার যেত সে। অমরই তার ডাক্তার ছিল। তার দাদা ভূতনাথের মুখে শুনেছিলাম একবার কলকাতায় এসে তার বুকটা এক্স্-রে দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। সে সময় তার মেডিয়াস্টাইনামে (mediastinum) একটি টিউমারের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। কিন্তু এ নিয়ে সে কোনও ধুমধাম চিকিৎসা করে নি। অমরের নির্দেশই মেনে চলত বরাবর। নামজাদা কোনও সাহিত্য-সভায় সে বড় একটা যেত না, কিন্তু একটি সাহিত্য-আসরের সান্ধ্যবাসরে নিয়মিত গতিবিধি ছিল তার। বাংলা সাহিত্য-সংসারের দাদামশাই শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রোজ সন্ধ্যাবেলায় মজলিশ বসত একটি। মজলিশে যোগ

দিতেন যুবকেরা। বৃদ্ধ দাদামশাই বৃদ্ধদের সংসর্গ পরিহার করে চলতেন, তাঁর বন্ধু এবং বয়স্য ছিল অপরিণামদর্শী যুবকেরা। এই দলে থাকত দাদামশায়ের দৌহিত্র তিনজনও। এরাও সাহিত্য-রসিক বঙ্কিম, পেনু আর একজনের নাম ঠিক মনে পড়ছে না। দাদামশাই পরিবেশন করতেন 'হিউমার' আর দিদিমা পরিবেশন করতেন নিখুঁত চা। সে চায়ের যেমন গন্ধ, তেমনি স্বাদ। এই মজলিশের সভ্য ছিল সতীনাথ।

সতীনাথের আর একদল বন্ধু ছিল অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত গ্রামের লোকরা। সে যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তখনই এদের সঙ্গে তার পরিচয়। এদের সঙ্গ পাবার জন্যে পায়ে হেঁটে হেঁটে সে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছে। এদের মুক্তির জন্যে সে জেল খেটেছে. অপমান নির্যাতন সহ্য করেছে। এ যুগের 'খেলোয়াড়' লোক হলে এইগুলোকে সে কাজে লাগাত। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলালের সহকর্মী ছিল সে, রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাকে স্নেহ করতেন হয়তো সে রাজনীতি জগতে হোমরা-চোমরা কেউ-কেটা হতে পারত। কিন্তু সে হয়নি। রাজনীতির সঙ্গে তার আদর্শ মেলে নি। তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টি মুখোশের আড়ালে মতলবটাকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তার এই অভিযান ব্যর্থ হয় নি। জনতা-সমুদ্র মন্থন করে যে সুধা সে পেয়েছিল তার নাম 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' আর জেলের তিক্ত অভিজ্ঞতার সুমধুর রসরূপ তার 'জাগরী'।

আর তার বন্ধু ছিল তার বাগানটি গোলাপ ফুল আর অর্কিড ভালবাসত। আমার সঙ্গে যখনই তার আলাপ হয়েছে তখন তা সাহিত্য বিষয়ে হয় নি, গোলাপ নিয়ে হয়েছে। আমার সঙ্গে যখন সে দেখা করতে এসেছিল আমার জন্যে বই আনে নি, এনেছিল একটি অর্কিড। সে অর্কিডটিকে আমি বাঁচাতে পারি নি। সেই অর্কিডদাতাটিও এবার চলে গেল। কিন্তু আশা আছে আবার সে আসবে, বার বার আসবে।

পাবই পাব তাকে
অফুরন্ত অশেষ সে যে
ফুরিয়ে গিয়েও থাকে।

সাধারণত আমি আমার সৃষ্টির জগতে কোন 'ইজ্‌ম' বা রাজনীতিকে প্রাধান্য দিই নি। প্রাধান্য দিয়েছি মানুষকে—নানা রঙের, নানা ছাঁচের, নানা ধাঁচের মানুষকে। আমার লেখায় এই মানুষদেরই ভিড়। এই ভিড়ের মধ্যে কমিউনিস্টও আছে দু-চারজন। আমার মনে হয়েছে, আলেয়া যেমন পথিককে পথভ্রান্ত ক'রে শেষে একটা পঙ্ককুণ্ডে নিয়ে যায় কমিউনিজ্‌মের অলীক আলেয়াও তেমনি অনেককে বিপথে নিয়ে গেছে। যারা বিপথে গেছে তাদের মধ্যে অনেকে আদর্শ-বাদী, তারা সত্যিই ভেবেছে কমিউনিজমই মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পন্থা। অনেকে আবার কমিউনিস্ট হয়েছে ফ্যাশনের খাতিরে, অনেক ঘোর ক্যাপিটালিস্টকেও কমিউনিজ্‌মের সস্তা বুলি কপচাতে শুনেছি। তৃতীয় আর একদল কমিউনিস্ট হয়েছে ওই লেবেল গায়ে মেরে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেবার জন্য। এরা স্বার্থপর। এরা আগে সমাজে ঘৃণিত জীব ছিল, আজকাল কমিউনিজ্‌মের দৌলতে এদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। এদের অনেকেরই অবশ্য ভুল ভেঙেছে শেষ পর্যন্ত। অনেকেই বুঝেছে, ভুল পথে এসেছি।

আমার 'অগ্নি' বইটি ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৩ সালে, ফাল্গুন মাসে। ওই বইয়ের নায়িকা 'অন্তরা'র কমিউনিজ্‌ম সম্বন্ধে মোহ অপসারিত হয়েছে।

সে একজায়গায় বলছে—"যে পরশ্রীকাতরতাটা প্রকাশ করতে আগে লোকে লজ্জিত হ'ত, একটা বড় নামের মুখোশ পরে তাই ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রচার করাটা গৌরবজনক হয়েছে আজকাল। কিন্তু, ভেবে দেখ, ধনী মাত্রেই পাজি, শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তি মানেই জুয়াচোর, এই নীতি প্রচার করা অন্য যে-কোন দেশের পক্ষে শোভন হোক, ভারতবর্ষের পক্ষে নয়। যে হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের পরম গৌরব, পরমতসহিষ্ণুতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সেই ভারতবর্ষের ধনী

মাত্রেই পাজি—এই মত প্রচার করতে যাওয়া কি লজ্জাকর!...প্রকৃত সাম্যবোধ আত্মানুসন্ধী হিন্দুধর্মেই আছে। কারণ, সাম্যবোধ জিনিসটা আধ্যাত্মিক; আধিভৌতিক পশু-জগতে ওর স্থান নেই। হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম, যে প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে শ্রদ্ধা করেছে, বেয়নেট উঁচিয়ে বলে নি—তুমি এই ইজমে বিশ্বাস করবে কি না, যদি না কর তা হলে তোমার বাঁচবার অধিকার নেই।...তুমি হয়তো বলবে, আধিভৌতিক জগৎটাও তো আছে, ওটাকেও তো অস্বীকার করলে চলবে না। বহু লোক দারিদ্র্যের চাপে মরে যাবে আর জনকতক ঐশ্বর্য ভোগ করবে এ রকম সমাজব্যবস্থাই কি ভালো? কে বলছে ভালো? আধিভৌতিক জগৎটা যে আছে তা তো প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি, অস্বীকার করব কি করে? আমার আপত্তি ভণ্ডামিতে। ক্ষুধার আহার, কামনার ইন্ধন সন্ধান করে বেড়াচ্ছি যখন, তখন আবার সাম্যের মুখোশ কেন! বিদ্যুতালোকিত সুসজ্জিত ঘরে ফ্যানের তলায় বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কিষাণদের দুঃখ, শ্রমিকদের কষ্ট নিয়ে অমুক দাদার সঙ্গে উত্তেজিত আলোচনার ছবিটা যে আধুনিক পরিবেশে দুষ্মন্ত-শকুন্তলারই সাবেক ছবি তা অস্বীকার ক'রে যে ভণ্ডামিটাকে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি, তাতেই আমার আপত্তি। মাছের লোভে ছিপ ঘাড়ে ক'রে টোপ নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছি, ওর মধ্যে আবার সাম্যের আস্ফালন কেন? দীনের দুঃখে সত্যিই যারা বিচলিত হয় তারা অত স্বার্থপর হয় না। হতে পারে না! নিঃস্বার্থপর ত্যাগী কমিউনিস্ট যে নেই, তা আমি বলছি না; অনেকে আছে হয়তো, কিন্তু আমাদের দলের যে ছবি দেখেছি তা শ্রদ্ধেয় সাম্যবাদীর ছবি নয়। আমাদের দেশের জনসাধারণের দুর্দশার সীমা নেই। সে দুর্দশা ঘোচাবার জন্য যাঁরা জীবন পণ করেছেন তাঁরা পূজনীয়; কিন্তু তোমাদের চেষ্টা কি করে তাঁদের খেলো করবে, কোন্ আধুনিক মুখস্থ-করা ফরম্যুলায় ফেলে তাঁদের কর্মপদ্ধতির দোষ বার করবে। স্বাধীনতা-অপহারক বিদেশী রাজাই আমাদের দুর্দশার আসল কারণ। সেই বিদেশী রাজা স্বদেশে-বিদেশে আমাদের নামে রটিয়ে

বেড়াচ্ছে যে মিথ্যা কথা, তোমারাও তাতে সায় দিয়ে চলেছ ক্রমাগত। তোমরাও বলছ যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন হচ্ছে না বলেই আমরা স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত নই; তোমরাও বলছ যে, অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দিলে অন্যায় করা হবে, পাকিস্তানই এর একমাত্র সমাধান। তোমরাও বুঝতে পারছ না যে, হিন্দু-মুসলমান কেন, ইচ্ছা করলে রাজশক্তি পিতাপুত্র স্বামী-স্ত্রীতেও মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিতে পারে অনুগ্রহ নিগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে। তোমরা 'ফুড ফ্রণ্ট' করে এ দেশের পুঁজিবাদীদের নাস্তানাবুদ করেছ, কিন্তু আসল পুঁজিবাদীর রোমটি পর্যন্ত স্পর্শ কর নি। ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ করবার জন্যে তোমরা একদিন উৎকণ্ঠিত ছিলে, সেই বিদ্রোহ যখন সত্যি সত্যি হল, তখন তোমরা শুধু সরেই দাঁড়ালে না, তার বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট অজুহাতে।···তোমাদের গুরু স্টালিন স্বদেশপ্রীতির জন্য মানব-প্রীতি বিসর্জন দিতে ইতস্তত করেন নি—এক কথায় থার্ড ইন্টার-ন্যাশনালের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন; কিন্তু তোমরা স্বদেশের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাকে বাধা দিলে বিদেশী ফ্যাসিজ্‌মকে ধ্বংস করবার অজুহাতে। এ তোমাদের কেমন গুরু-ভক্তি বুঝি না। সুতরাং সন্দেহ হয়, গুরুতর ভক্তি করবার মতো দেবতার সন্ধান পেয়েছ হয়তো কাছেপিঠে। আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। মানুষের মন শ্রদ্ধা করবার জন্য সতত উন্মুখ। দেহের ক্ষুধার মতো এটিও একটা ক্ষুধা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে শ্রদ্ধেয়কে খুঁজে বেড়ায়। সমাজ বা শাস্ত্র যাঁদের শ্রদ্ধা করতে বলেছেন, যেমন পিতা, মাতা বা স্বামী তাঁরা সত্যিই যদি শ্রদ্ধাস্পদ হ'ন তা হলে জীবন চরিতার্থ হয়ে যায়, কিন্তু যদি না হন তা হলে মন ভুল করে না। সমাজ বা শাস্ত্রের শাসন মেনে আমরা লেবেল-মারা পূজনীয়দের প্রতি মৌখিক একটা শ্রদ্ধা করি বটে, কিন্তু মনে মনে আমরা সন্ধান করে বেড়াই সত্যিকার শ্রদ্ধেয়কে। নিরন্তর এই সন্ধান চলেছে। দেহের ক্ষুধার মতো এ-ও অনিবার্য। এর প্রেরণায় মন ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে, পুস্তক থেকে পুস্তকান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরেও হয়তো।"

অন্তরায় মুখ দিয়ে আমি যে-সব কথা বলিয়েছি তা আমারও মনের কথা। কমিউনিস্টদের আচরণে বা দর্শনে আমি এমন কিছু খুঁজে পাই নি যা শ্রদ্ধেয়, যার সাহায্যে সত্য-শিব-সুন্দরের নাগাল পাওয়া যায়। আমার সৃষ্টির জগতে তাই যে-সব কমিউনিস্টদের আমি স্থান দিয়েছি তাদের কমিউনিজ্‌ম সম্বন্ধে ভুল ভেঙেছে। আমার সাহিত্যে আমি ভারতের ইতিহাসে প্রাপ্ত ভারতীয় আদর্শকেই মহিমান্বিত করবার চেষ্টা করেছি। সে আদর্শ আর ইতিহাস সম্বন্ধে আমার 'মানদণ্ড' গল্পের নায়ক হিরণ্যগর্ভ বলেছে—"সাহেবদের লেখা বইয়ে ভারতের ইতিহাস নেই। ভারতের ইতিহাস আছে রামায়ণে, মহাভারতে, উপনিষদে, জাতকে, পুরাণে, রূপকথায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটিতে, যাদের আমরা অশিক্ষিত জনসাধারণ বলি তাদের আচার-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় তাদের সামাজিক জীবনের কর্মসূচীতে। এই ইতিহাস যদি পড়ে দেখেন দেখবেন, ভারতীয় আদর্শে নীচতার স্থান নাই।"

এই আদর্শই আমার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, কমিউনিজ্‌ম নয়।

প্রতিমার আবরণ উন্মোচন

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। মৃন্ময়ী প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করবার জন্যে আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মৃন্ময়ী প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করা সহজ। কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত মৃন্ময়ী প্রতিমা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য চিন্ময়ী প্রতিমা। যে প্রতিমা আমাদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আমাদের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর সামনেও আমরা নানারকম আবরণ ঝুলিয়ে রেখেছি—অহঙ্কারের আবরণ, ষড়রিপুর, নানা রঙের নানা পরদা,

সেই আবরণ উন্মোচনই আসল উন্মোচন। কিন্তু তা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে, বাইরের কোনও লোক এসে তা করতে পারবে না সেই আবরণের বাহুল্য আজকাল বেশী হয়েছে, তাই আজ আমরা মহাশক্তি মহিমাকে উপলব্ধি করতে পারছি না, তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি ক্রমশ। আমরা পূজার নামে আত্মরতি করছি, আমরা মত্ত হয়েছি মিথ্যা আড়ম্বরে। তাই দুর্বল হয়ে পড়ছি ক্রমশঃ। যে বাংলাদেশ এককালে ভক্তির জন্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ছিল সে বাংলাদেশ এখন প্রাণহীন নির্বীর্য। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গাপ্রতিমাকেই দেশ বলেছিলেন

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্।

তিনি দেশকে আহ্বান করেছিলেন সর্বপ্রকার শক্তির সাধনায়। কিন্তু সে সাধনায় আমরা সফল হতে পারব না যতক্ষণ চিন্ময়ী মহাশক্তি আমাদের অন্তরে আবরণ মুক্ত না হন। সুতরাং সর্বাগ্র দরকার সেই আবরণগুলিকে উন্মোচন করা যা আমরা আমাদের চিন্ময়ী প্রতিমার সামনে ঝুলিয়ে রেখেছি—যা আমাদের মনুষ্যত্বকে মলিন হীনপ্রভ করে' দিয়ে আমাদের পশুত্বের স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। নমস্কার।

নহবত নাটকের শতবর্ষ পূর্তি

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। 'নহবত' নাটক মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছে। একশত রজনী সে বহু দর্শককে আনন্দ দান করেছে সেইজন্য আজ এই উৎসরের আয়োজন। এই উৎসব সভায় আপনারা আমাকেও যে স্মরণ করেছেন এর জন্য রঙমহলের কর্তৃপক্ষের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। 'নহবত' নাটক আমিও একবার দেখেছি। আমার বেশ ভালো লেগেছে। সূক্ষ্ম বিচারের মানদণ্ডে মাপলে অনেক জনপ্রিয় নাটকেরই অনেক অসঙ্গতি হয়তো ধরা পড়বে, কিন্তু যাঁরা নাটক নিয়ে ব্যবসা করেন তাঁদের কাছে নাটকের জনপ্রিয়তাই সবচেয়ে বেশী কাম্য। যে নাটক চলে না, সে নাটকের যতই সাহিত্যিক উৎকর্ষ থাকুক না কেন সে নাটক সাধারণের কাছে পরিবেশনের দায়িত্ব তাঁরা নিতে পারেন না। জনতার রুচির সঙ্গে তাল রেখে তাঁদের চলতে হয়। তবে একটা জিনিস অবশ্যই বলব যে জনতার রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাঁরা অনেক ভালো আদর্শও জনসাধারণের মনে সঞ্চারিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাঁদের সে প্রয়াস সার্থকও হয়েছে। 'নহবত' নাটকে সে আদর্শ আমরা পেয়েছি। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্বচ্ছন্দ, সাবলীল প্রাণবন্ত অভিনয়। অভিনয়ের গুণেই নাটকটি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। তাঁদের আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাই। এই উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ বন্যাত্রাণের জন্য ১০০০ — টাকা দান করছেন শুনে বড়ই আনন্দ হল।

আর আপনাদের সময় নিতে আমি চাই না। পুনরায় আপনাদের প্রীতি ও নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য সমাপন করলাম।

বিজয়া সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা সকলে আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। বিজয়া উপলক্ষ্যে আপনাদের সকলের সহিত মিলিত হয়ে অতিশয় আনন্দ লাভ করলাম। বিজয়ার তাৎপর্য কি এ নিয়ে অনেক পণ্ডিত অনেক আলোচনা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য লঙ্কায় রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং সে যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্য অকালবোধন করে' মা দুর্গার পূজা করেছিলেন। সে যুদ্ধে জয়লাভের পর এই বিজয়া উৎসব হয়েছিল। নর-বানরে পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়েছিলেন মহানন্দে। রাক্ষসদের নিধন করে নর-বানর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়েছিলেন এটাই বিজয়ার তাৎপর্য একথাও অনেকে বলেন। এর আর একটা তাৎপর্যও আছে। আমরা শক্তির পূজা করি শক্তি লাভ করবার জন্য। আমরা শত্রু বধ করতে চাই, আমরা জ্ঞানের শক্তি অর্জন করতে চাই, আমরা ঐশ্বর্যবান হ'তে চাই, আমরা পরাক্রমশালী হ'তে চাই, আমরা শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চাই। তাই একই প্রতিমায় আমরা অসুরদলনী দুর্গার, বিদ্যাদায়িনী বাণীর, ঐশ্বর্যময়ী লক্ষ্মীর, দেবসেনাপতি কার্তিকের এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করি। দুর্গা প্রতিমার মধ্যে আমাদের মনের কামনাই যেন মূর্ত হয়েছে। কিন্তু এ প্রতিমাকে আমরা দশমীর দিন বিসর্জন দিই—অর্থাৎ সেদিন যেন আমরা উপলব্ধি করি যে মনের বাসনা কামনাকে বিসর্জন না দিলে প্রকৃত যুদ্ধজয় হয় না, শত্রুর কবল থেকে প্রকৃত মুক্তি পাওয়া যায় না। কামনাই শত্রু। বিজয়ার আর একটা তাৎপর্য খুঁজে বার করা যায়। বিজয়া শব্দটির আর একটি অর্থ ভাং। দশমীর দিন স্বয়ং মহাদেব আসেন দুর্গাকে কৈলাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মহাদেব ভাং-ভক্ত। তাই তাঁকে সেদিন ভাং দিয়ে অর্থাৎ বিজয়া উৎসব করে অভ্যর্থনা করি আমরা। নিজেরাও ভাং খাই! তাৎপর্য যাই হোক আমরা সেদিন মিলিত হতে পারি। সেদিন প্রণাম, আশীর্বাদ আলিঙ্গন-বিনিময় করে আনন্দিত হই—এটাই পরম লাভ। কারণ উপলক্ষ্য যাই হোক আনন্দটাই পরম প্রাপ্তি। নমস্কার।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। অতুলপ্রসাদকে আজ প্রণাম জানাই তাঁর অপরূপ সুরসৃষ্টির জন্য, প্রণাম জানাই তাঁর নিখাদ বাঙালীত্বের জন্য, প্রণাম জানাই তাঁর মহৎ মনুষ্যত্বের জন্য। শুধু বাঙালীর নয়, তিনি ভারতের গৌরব। সুরের জগতে তাঁর অনন্যতা তাঁকে তো অমর করেছেই, তিনি এমন কয়েকটি গান রচনা করেছেন যে গানের ভাবসম্পদ ভাষাবিন্যাস বাঙালীর মনে, ভারতবাসীর মনে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে তাকে চিরকাল উদ্দীপ্ত করবে। 'উঠগো ভারত-লক্ষ্মী', 'আমরি বাঙলা ভাষা', 'হও ধরমেতে ধীর'—ইত্যাদি গান আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। অনেকে মনে করেন 'কত গানতো হল গাওয়া' গানটি নাকি বাংলা ভাষার প্রথম গজল। শ্রীযুক্তা রেনুকা দেবীর কণ্ঠে রেকর্ডে যেদিন প্রথম আমি 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' গানটি শুনেছিলাম সেদিন কি অপরূপ রূপে যে চিত্ত আকুল হয়েছিল তা বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই। তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমেই তাঁর মনের সংস্পর্শ পেয়েছি আমি বরাবর। একটি কথা মনে হয়েছে, সে কথাটি এই—তিনি চিরবিরহী ছিলেন। বেদনাই উৎকৃষ্ট গানের জন্ম দেয়—ইংরেজ কবির ভাষায়—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. এ বেদনা ব্যক্তিগতকে না পাওয়ার বেদনা। সুন্দরের নাগাল না পাওয়ার বেদনা, সুখের স্বপ্নকে বাস্তবে মূর্ত না দেখার বেদনা। এ বেদনা আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু আমরা সকলেই কবি নই, সকলেই সুরকার নই, তাই আমাদের বেদনা গানে কবিতায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে না। কবি ও গায়ক অতুল-প্রসাদ তাঁর বেদনাকে সাহিত্যে অবিনশ্বর প্রতিমারূপে স্থাপন করে

গেছেন। ভারতের রসিক সমাজ বিশেষ করে বাংলার রসিক সমাজ এজন্য তাঁর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

মানুষ হিসাবে অতুলপ্রসাদ অনেক বড় ছিলেন। লক্ষ্ণৌ শহরে এবং উত্তর প্রদেশে ব্যারিস্টার এ. পি. সেনের নাম শুধু সুদক্ষ ব্যারিস্টার হিসাবেই নয় মহানুভব মানুষ হিসাবেও সকলের নিকট সুপরিচিত ছিল। তিনি আর্তজনের বন্ধু ছিলেন, নিঃসহায়ের সহায় ছিলেন। দেশের সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যে অগ্রণী ছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেছিলেন তিনি, প্রাণপাত করে পরিশ্রম করেছিলেন তিনি। তাঁর আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট ছিলেন না। সঙ্কীর্ণ বাঙালীয়ানার চণ্ডীমণ্ডপে বসে তিনি কোনদিন মানবতার অপমান করেন নি। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসমান বাঙালী-অবাঙালীর কোন ভেদ ছিল না। তিনি সকলেরই বন্ধু হিসাবে ছিল, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁর বিরাট মহত্ত্বের বিশাল চত্বরে উপবেশন করে ভূরিভোজন করে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সব মহাত্মারা বাংলাদেশে নবযুগের উদ্বোধন করেছিলেন সেই মহাত্মাদের জীবনাদর্শই যেন অতুলপ্রসাদের জীবনাদর্শ ছিল। রাজা রামমোহন রায় বা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সে যুগে যা যা করেছিলেন তা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তা সকলের জন্য। প্রিন্স দ্বারকানাথ সে যুগের হিন্দু-মুসলমান তো বটেই আমাদের শাসক ও বিজেতা ইংরেজদেরও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর জীবনীতে আছে যে তিনি একজন ঋণগ্রস্ত বিপন্ন জজসাহেবকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে ঋণমুক্ত করেছিলেন। পূর্বসূরীদের এই মহত্ত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

'এপার বাংলা ওপার বাংলা সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এতে আমি খুব আনন্দিত।. এপার বাংলা ওপার বাংলা বাক্যটি খুব প্রচলিত হয়েছে ইদানীং। কিন্তু আমার খুব পছন্দ নয় ওটা। এপার এবং ওপার এই দুটি শব্দ যেন বাঙালীর ও বাংলার অন্তরকে ক্ষুণ্ণ করেছে। নদীরই এপার ওপার হয়, পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত রেখা চিহ্নিত

করে কোন নদী কি প্রবাহিত হচ্ছে? অবশ্য র‍্যাডক্লিফ সাহেবের শাণিত ছুরিকাঘাতে যখন আমাদের দেশমাতৃকার বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছিল তখন একটা রক্তের নদী বয়েছিল বটে কিন্তু সে ক্ষত, সে নদী কি এখনও আছে? আজ সম্পূর্ণ বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতি সংসদ তার-স্বরে আজ কি বলছে না, না, না, নেই, আমরা এক এবং অনন্ত। আমাদের এপার-ওপার নেই, আমরা সব সময় একত্র ছিলাম, সব সময় একত্র আছি, সব সময় একত্র থাকব। পৃথিবীর সব শিল্পীরা যে দেশে বাস করেন সে তাঁদের প্রাণের দেশ। ভূগোলে তার ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে দেশ মনের দেশ, প্রাণের দেশ, কল্পনার দেশ, প্রতিভার দেশ, সে দেশে অন্ধকার নেই, সেই বিদ্বেষ নেই, রাজনীতি নেই, সেই দেশের আমরাও অধিবাসী। আমরা নিজেরা আলো এবং আনন্দ বিকীর্ণ করব এবং অপরের বিদীর্ণ আলো-আনন্দ উপভোগ করব। এই সে দেশের রীতি এই সে দেশের নীতি। সেখানে জাতিভেদ নেই, নীচতা নেই, ভণ্ডামি নেই, মিথ্যা নেই, অশিব নেই, অসুন্দর নেই, অপ্রেম নেই। এই আদর্শ যেন আমাদের সংস্কৃতি সংসদকে উদ্বুদ্ধ করে। জয় বাংলা।

কোথায় গেল সেই মায়েরা

তখন সকাল দশটা। দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে যেয়ে দেখি সামনের পাঁচিল-ঘেরা খোলা ছাদে চুপচাপ একাকী বসে তিনি যেন কি ভাবছেন। খবর পেয়ে ভিতরে এলেন। একটি চেয়ার দেখিয়ে বললেন —বস।

—আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে এসেছি। বললাম—আপনার বাল্যজীবন সম্পর্কে যদি কিছু বলেন······।

আমার জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই, অর্থাৎ ৪ শ্রাবণ ১৩০৬ সন।

বাবার নাম সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী। পূর্বপুরুষদের আদিবাস ছিল হুগলী জেলার শিয়াখালা গ্রামে। বাবা বিহারের মণিহারীতে ডাক্তারী করতেন। আমাদের শৈশব ও বাল্যকাল এখানেই কেটেছে। আমাদের মা ছিলেন মমতাময়ী এক দেবী প্রতিমা, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অনন্যসাধারণ মহিলা। প্রধানত তাঁকে কেন্দ্র করেই আমরা ছয় ভাই ও দুই বোন বড় হয়েছি। চিকিৎসক হিসাবে বাবার যেমন খ্যাতি ছিল তেমন কর্মক্ষেত্রও ছিল বিস্তৃত। কেবলমাত্র মণিহারী অঞ্চলই নয়, পাশাপাশি তিনটি জেলার বিভিন্ন স্থানে রোগীদের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে মাঝে মাঝেই যেতে হত। মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জনের ব্যাপারে তাঁর ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা। আমাদের বাড়ীতে দিনরাত রোগীদের ভিড় লেগেই থাকত। তাঁদের নরনারায়ণ জ্ঞানে তিনি সেবা করতেন, আজকের মত ভিখারী বিদায়ের রেওয়াজ তখন ছিল না। ফলে বাবাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। আমাদের যা কিছু হয়েছে তার পিছনে ছিল এই অগণিত আরোগ্য-কামী মানুষের আশীর্বাদ ও শুভকামনা।

মণিহারীর বাড়ীটা ছিল পনের-ষোল বিঘা জমির উপর। নানা জাতীয় ফলের গাছ, ফুলের বাগান, বড় বড় পুকুর—সব নিয়েই এই বাড়ী। অদূরে শ্যামল বনভূমি। সব মিলিয়ে সে এক সবুজের বিপুল সমারোহ! এই পরিবেশেই আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি। শৈশবে বাগানের গাছপালার মধ্যে নাকি আমি ঘুরঘুর করতাম, বাড়ীর পরিচারকেরা আমর নাম দিয়েছিল "জংলীবাবু"। আমার জন্মের পর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন, এক মুসলমান রমণীর বুকের দুধ খেয়েই আমাকে বাঁচতে হয়েছে। আমার বিবাহের পর সেই 'চামরুর-বৌ' তাঁর তিন মাসের মাহিয়ানা পনের টাকা দিয়ে একটি শাড়ি আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন। উপহার অনেকেই পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি মাসের রোজগার এমন অক্লেসে দান করার কোন তুলনা নেই। এঁদের কথা ভোলা যায় না।

প্রশ্ন করলাম—'বনফুল' এই অভিধাতেই আপনি সাহিত্য জগতে

সমধিক পরিচিত। কোন রচনায় আপনার আসল নাম—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন ?

—না, সর্বদাই আমি ঐ ছদ্ম নামেই লিখেছি। বাল্যকাল থেকেই কবিতা লেখার দিকে আমার বিশেষ ঝোঁক। এজন্য পণ্ডিতমশাই একদিন আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেন। অভ্যাসটা ছাড়া চলবে না এবং পণ্ডিতমশাই-এর দৃষ্টিও এড়িয়ে চলতে হবে, তাই একটা মধ্যপন্থা আবিষ্কার করে নিলাম। তখনই নিজের নতুন নামকরণ করি বনফুল। গত ৬৪ বছর যা কিছু লিখেছি তা এই নামেই প্রকাশিত হয়েছে।

বনফুল মণিহারী থেকে ১৯১৪ সালে মাইনর পাশ করে সাহেবগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৮তে ম্যাট্রিক এবং হাজারিবাগ কলেজ থেকে আই.এস-সি পাশ করে ১৯২০ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন শুরু করেন। অসুস্থতার জন্য এক বছর বসে থাকতে হয়। পরে ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে এক নিয়োগপত্র এল, কিন্তু প্রথম দিনেই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তাঁকে চলে আসতে হয়। হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করে প্রচলিত প্রথায় তাঁকে অভিবাদন করলেন এবং তিনিও সংক্ষিপ্ত প্রত্যভিবাদন জানালেন। পর মুহূর্তেই বললেন—ডাঃ মুখার্জি, আপনি এখানকার আচরণবিধি জানেন ? বলেই টেবিলের দেরাজ থেকে একটা টাইপ-করা কাগজ বের করে হাতে দিলেন। তাতে প্রথমেই লেখা ছিল—"যখনই কোন উপরওয়ালার সঙ্গে দেখা হবে, তখনই কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানাবে"। বাকীটা আর পড়া হল না। ডাঃ মুখার্জি বললেন—সাধারণত হাত জোড় করে আমরা নমস্কার করি এবং প্রণম্য হলে পায়ের ধুলো নেই। কিন্তু 'সেলাম' দেবাব অবমাননাকর রীতি মেনে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

চলে এলেন ভাগলপুরে। ডাক্তারখানা ও রোগনিরূপণ-গবেষণাগার খুলে স্বাধীন পেশায় মনোনিবেশ করলেন। দিনের বেলায় ডাক্তারী এবং

রাত্রে সাহিত্য-চর্চা এই ছিল তাঁর নিত্যদিনের কর্মসূচী। সাহিত্য-সাধনার প্রকৃষ্ট সময় হিসাবে তিনি রাত্র ১২টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট সময় বেছে নিয়েছিলেন।

বনফুল-প্রণীত বই-এর মোট সংখ্যা ১১০, তার মধ্যে জঙ্গম, স্থাবর, উদয়াস্ত, ডানা, তৃণখণ্ড, দ্বৈরথ, ভুবনসোম, মন্ত্রমুগ্ধ, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি একসময়ে পাঠক-সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুধীমহল তাঁর ছোট গল্পকে উচ্চ আসন দিয়ে থাকেন। বহু রসোত্তীর্ণ কবিতা ও চিন্তাশীল প্রবন্ধের তিনি জনক। এ ছাড়াও আছে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

প্রশ্ন করলাম—সারা জীবন-ত সারস্বত সাধনায় কাটিয়ে দিলেন, বিরামহীনভাবে আমাদের জন্য লেখনী চালনা করেছেন। কিন্তু যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন কি ?

—সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে কিনা জানি না। তবে লিখে সর্বদাই মন তৃপ্ত হত, আনন্দ পেতাম। সৃষ্টির আনন্দ থেকে কেহ কোনদিন বঞ্চিত হয় না, এটা ভগবানের দান। নিজে আনন্দ পাওয়া এবং অপরকে আনন্দ দেওয়াই ছিল আমার সাহিত্য সেবার মূল লক্ষ্য। আমি বাঙালী। বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল তারা শিল্পী—সৌন্দর্য-প্রিয়। তারা সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী। আমি আমার শিল্পীচেতনা থেকে কোনদিন বিচ্যুত হই নি।

পাঠক-পাঠিকাদের সামনে সর্বদাই বলিষ্ঠ আদর্শ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। আমার লেখা তাদের নতুন নতুন চিন্তার খোরাক যোগাবে। জীবনপথে তারা এগিয়ে যেতে পারবে—এই বাসনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাছাড়া পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকেও আমি প্রভূত প্রেরণা লাভ করেছি। মানুষের ভালবাসাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তা আমি অকুণ্ঠভাবে পেয়েছি এবং তাতেই আমার মন ভরে আছে।

পদ্মভূষণ উপাধিলাভের প্রসংগ তুলতেই, বনফুল বললেন—এ বয়সে দিল্লীর খেতাব পাওয়া না পাওয়া সমান কথা। স্বীকৃতি ও সম্মান আমার ভাগ্যে অনেক জুটেছে।

'হাটেবাজারে' বই-এর জন্য তাঁকে ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার

দেওয়া হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট. উপাধিতে ভূষিত করেছে। জগৎতারিণী পদক এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পদকও তিনি লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ দুইটি স্মৃতিবক্তৃতামালায় বক্তৃতা দেবার জন্য দুইবার তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে এমন বহু স্বতোৎসারিত সম্মান তিনি জীবনে লাভ করেছেন।

বর্তমানে কোন লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন গত চার বছর যাবৎ দিনপঞ্জী লিখে যাচ্ছি। বই-এর নাম দিয়েছি 'মর্জিমহল'। গত তিন দিনের ডায়েরী পড়ে শোনালেন। একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রস্তুতির পথে। এতে বর্তমান কালের যেমন ছাপ থাকবে তেমনি প্রকারান্তরে রচিত হবে তথ্যবহুল এক জীবনচরিত।

শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য—এককথায় সমাজ ও সভ্যতার সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বস্তরের যে ব্যাপক দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, ভণ্ডামী শ্বাসরোধ করে আমাদের সমূলে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে সে বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন - আমার বিশ্বাস এই পাপ ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বাঙ্গালী একদিন রুখে দাঁড়াবেই। অত্যাচার ও শোষণ তারা বেশীদিন সহ্য করে না, প্রতিরোধ সংগ্রাম এখান থেকেই শুরু হবে। তবে সে-দিন হয়ত আমি বেঁচে থাকবো না। 'মাৎস্যন্যায়'-এর কৃষ্ণ যবনিকা বাঙ্গালীর সমাজ ও সংহতিকে এক সময় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। গোপালদেব নামে এক শক্তিধর কৈবর্ত-যুবককে সেদিন শাসক হিসাবে নির্বাচিত করে তারা সিংহাসনে বসিয়েছিল। একটানা চারশ' বছর রাজত্বের পর পালবংশের শেষ বংশধরদের লোভ ও অক্ষমতার ফলে আবার যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কর্ণাটক থেকে সেন রাজাদের এঁরাই ডেকে আনেন। পরবর্তী অধ্যায়ে নানা ধরনের অত্যাচার ও শোষণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে সঙ্গত কারণেই সুশাসন ও ন্যায় বিচারের আশায় বাঙ্গালী বিদেশী শাসকদের মনে মনে স্বাগত জানিয়েছিল। আবার এ দেশ থেকে ঔপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদের সংগ্রামে বাঙ্গালী-ই নিয়েছিল অগ্রণীর ভূমিকা। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে

আপসহীন সংগ্রামের ধ্বনি তুলে যিনি আন্দোলনের সুরটি উচ্চগ্রামে বেঁধে দিয়েছিলেন এবং নিজ শক্তিতে অর্জিত ক্ষমতাবলে ভারতের মাটিতে যিনি সর্বপ্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন—তিনিও বাঙ্গালী সন্তান, নেতাজী সুভাষচন্দ্র। হতাশ হয়ো না, সেদিন আসবেই।

তবে মূল সমস্যা কি জান? বাঙ্গালী তার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন—আমাদের চরিত্রবল কেবল ভারত-ই নয়, সারা পৃথিবীর মুক্তি আনবে। চরিত্র নির্মাণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শিক্ষার নামে এক গুচ্ছের সংবাদ ও তথ্য ছাত্রদের গিলিয়ে দেবার বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন দরকার।

দেশের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধের পথ নাকি তোমরা খুজে পাচ্ছ না। এজন্য কোন কমিটি-কমিশন নিয়োগের প্রয়োজন নেই। বিদ্যাসাগরের 'প্রথম ভাগ' খুলে দেখ সেখানেই সব পাবে।

সদা সত্য কথা বলিবে ঃ অপরের দ্রব্যে লোভ করিও না ঃ পরোপকার মহৎ ধর্ম ঃ পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবে ঃ চুরি করা মহাপাপ ইত্যাদি—পড় নি? চুরির সংজ্ঞাও তিনি বলে দিয়েছেন—না বলিয়া অপরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। এ সমস্ত আচরণ-বিধি যদি আমরা প্রচলন করতে পারি, তবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কি কুক্ষণেই আমরা বিদ্যাসাগরের 'প্রথম ভাগ' পুরোপুরি বাতিল করে প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও কল্পনাশক্তি বিকাশের ধূয়া তুলে আমাদের শিশুদের হাতে ছড়া ও ছবির বই তুলে দিয়েছিলাম!

সকলের এখন 'মটো' হওয়া উচিত—নিজে সৎ থাকবো, সন্তান-সন্ততিদের সৎ পথে পরিচালিত করবো। মা-বাবার আচার-আচরণে যদি সংযম ও শৃঙ্খলা থাকে তবে ছেলেমেয়ে কখনই উন্মার্গগামী হতে পারে না।

হিন্দি ছবির চটুল গান, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, অর্থহীন হুজুগ আর হুল্লোড়বাজি তরুণ-তরুণীদের শিরদাড়া যেন ভেঙ্গে দিয়েছে। জীবনের একটা 'সিরিয়াস' দিক আছে একথা তারা বুঝতেই চায় না। হাল্কা ধরনের আমোদ-ফূর্তি, বেপরোয়া ও বিকৃত চালচলনকেই এরা জীবনের মূল উপাদান বলে মনে করে। ন্যায়-নিষ্ঠা, মায়া-মমতা, বিনয়-শিষ্টাচার

সব কিছুই সেকেলে মূল্যবোধ বলে এরা উড়িয়ে দিতে চায়। আসল বিপদটা এখানে। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক কর্মহীন, তারা কাজ চেয়েও কাজ পাচ্ছে না। অথচ কত কাজ পড়ে আছে। দেশের সামগ্রিক বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা-মত ব্যাপক কাজকর্ম ত ভালভাবে আরম্ভই হয়নি। সমবায় প্রথায় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে যেমন দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়, তেমন বহুলাংশে বেকার সমস্যাও সমাধান হতে পারে। কিন্তু গঠনমূলক কার্য-সূচীতে যুবকদের মধ্যে তোমরা আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পেরেছ কি?

আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? কারা যেন চক্রান্ত করে গোটা বাঙ্গালী জাতটাকে শিকলে বেঁধে জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখনও যদি আমরা সম্বিৎ ফিরে না পাই, আমাদের জীবনবোধ, সামাজিক চেতনা ও নৈতিক কর্তব্য জাগ্রত না হয়, তবে অদৃষ্টে আরো অনেক দুঃখ আছে।

কাজ আমাদের প্রথম নিজ নিজ ঘর থেকেই শুরু করতে হবে। বিশেষ করে মায়েরা যদি ছেলেমেয়েদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তবে ক্রমেই একটা শান্ত সুস্থ পরিমণ্ডল গড়ে উঠবে। আমার মা লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন ছেলেকে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে, ঠাকুরঘরে প্রণাম করে পড়তে বসতে হবে। রাত্রে আমরা যতক্ষণ পাঠাভ্যাস করতাম মা পাশেই বসে থাকতেন। কর্মজীবনে কোন কোন দিন কাজ সেরে বাসায় ফিরতে বেলা গড়িয়ে যেত। মা না খেয়ে আমার অপেক্ষায় বসে থাকতেন। আর দেরী নয়, এখনই খেতে বসতে হয়। মা বলতেন, "কখন ফিরবি ঠিক আছে? আগেভাগে রুটী তৈরী করে কি হবে। হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে খেতে বস, আমি গরম গরম রুটী সেঁকে দিচ্ছি।" একটু থেমে তিনি বলে উঠলেন—কোথায় গেল সেই মায়েরা!

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ৭৬ বছরের বৃদ্ধের চোখে জল—বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। বোধ হয় 'ছায়ায়-মায়ায়-সুধায়' মাখানো দূর অতীতের স্বপ্ন দেখছিলেন। প্রণাম করে বললাম—এবার তা'হলে চলি। উনি বললেন—আবার এসো।

কবিতা জিনিসটা ঠিক যে কি তাহা বর্ণনা করিয়া বলা অবশ্য শক্ত। কারণ কোন বিশেষ ফরমুলায় তাহাকে বাঁধা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—যা কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে। অনির্বচনীয়কে, ইঙ্গিতময় অধরাকে বাক্যের বন্ধনে বাঁধিবার প্রয়াসই কবিতা। এই প্রয়াসে তিনিই ততটা সফল যিনি পাঠককে যতটা সেই অসীমচারীর নিকটে লইয়া যাইতে পারেন। পাহাড় দেশে এক ঝাঁক উড়ন্ত হাঁসের পক্ষধ্বনি অন্ধকারে কবির চিত্তকে আকুল করিল। কিন্তু সে আকুলতা তিনি ব্যক্ত করিলেন এই বলিয়া—হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনওখানে। আকুলতাটা কিন্তু ব্যক্ত হইল না, কিন্তু ওই আকুলতার ছোঁয়াটা পাঠকের মনকে আকুল করিয়া তুলিল। ইহাই কবিতা। কবির আকুতি কবি সত্যেন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন ঃ

ফুলের যা দিলে হবে না কো ক্ষতি
অথচ আমার লাভ
আমি চাই সেই সৌরভটুকু
অতনু অতল ভাব
আমি চাই সেই দূর হতে চাওয়া
আমি চাই শুধু মশগুল হাওয়া
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব
যাহা দিলে কারো কোনো ক্ষতি নাই
অথচ আমার লাভ।

লালন ফকিরের কবিমানস মনের মানুষের খোঁজে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তবু তাহার নাগাল পাইত না। তাহার মনের খাঁচার ভিতর অচিন পাখীর আনাগোনা, তাহার পায়ে মনোবেড়ি পরাইয়া দিবার সাধ, কিন্তু অচিন পাখী কিছুতেই ধরা দেয় না। এই আকুলতা এবং তাহা কবিতার মুখ দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টাই কবিতা।

সে আকুলতাও একরকম নয়। বহু রকম। কাহারও ভূমার জন্য আকুলতা, কাহারও দেশের জন্য আকুলতা, কাহারও নিখিল বিশ্বের জন্য আকুলতা, কাহারও প্রেমের জন্য আকুলতা, কাহারও বৃহতের জন্য আকুলতা। কাহারও আকুলতা আলোর জন্য। গ্যয়টে তো তাঁহার মৃত্যুকালেও বলিয়াছিলেন "Light more fight" শেলীও আলোক তীর্থের যাত্রী, তবু তাঁহার মনে রাত্রির অন্ধকারের জন্যও আকুলতা জাগিয়াছিল একবার। রাত্রিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

when I arose and saw the dawn
I sighed for thee
when the light rode and
the dew was gone
And noon lay heavy on
flower and tree
And the weary day
turned to her rest
Lingering like an
unloved guest
I sighed for thee.

কবির এই দীর্ঘনিশ্বাসই কবিতা। আকুলতার রূপ অসংখ্য। এবং সে আকুলতা প্রকাশের অক্ষমতাই কবির জীবনের ট্রাজিডি। যদিও সব কবিতায় এ ট্রাজেডি স্পষ্ট নয় তবু মনে হয় একটা প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ যেন কবিতার প্রতি চরণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—পারিলাম না, যাহা অনুভব করিতেছি তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না
ও কি মায়া কি স্বপ্ন ছায়া ও কি ছলনা
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে
গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে।
ও যে চির বিরহেরই সাধনা।

কীট্‌স নাইটিংগিলের গান শুনিয়া যে বিখ্যাত ওডটি লিখিয়াছিলেন তাহার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি এই—

"My heart aches and a drowsy
numbness Dains

তাঁহার মনে হইতেছে তিনি যেন কোন নেশা করিয়াছেন, সেই নেশায় যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছেন। তাঁহার সমস্ত প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে এ অনুভূতিকে মূর্তি দিবার জন্য কিন্তু তিনি যেন পারিতেছেন না। এই প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ কাব্যের মধ্যে একটা বেগ সৃষ্টি করে, তাহাকে অলঙ্কৃত করে নূতন রূপে।

বস্তুত সব কবিই বড় অসহায় জীব : বড় দাম্ভিক, বড় বেশী স্পর্শ-কাতর বড় বেশী কল্পনাতুর। তাহারা যতটা অনুভব করে ততটা প্রকাশ করিতে পারে না, যতটা পারে তাহারও শ্রোতা পায় না। তবু এই অসহায় কবিরাই যুগে যুগে অন্ধকারে দীপ জ্বালাইয়াছে, সভ্যতার ললাট চন্দন-চর্চিত করিয়াছে। কুৎসিত পরিবেশের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতেও বলিয়াছে—

"A thing of beauty is joy forever :
Its loveliness increases.

বলিয়াছে, আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দুর্ভাগ্যের কবলে কবলিত হইয়াও উচ্চারণ করিয়াছে—উদ্যোগি পুরুষসিংহ লক্ষ্মী লাভ করে। মানুষের হস্তে বারম্বার লাঞ্ছিত হইয়াও বলিয়াছে—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। রঙ্গমঞ্চের উপরই যাঁহাকে প্রায় সারা জীবন কাটাইতে হইয়াছে সেই শেক্সপীয়ারই এই মহা সত্য লিখিয়া গিয়াছেন—

Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing.

এই সকল সত্যনিষ্ঠ কল্পনা-বিলাসী, দুঃসাহসী সংস্কৃতি-পথিকদের তুলনা কোথাও নাই। তাঁহারা কোন বিশেষ কালে আবদ্ধ নন, তাঁহারা কোন বিশেষ গোষ্ঠীরও নন। তাঁহারা সকলের, তাঁহারা চিরন্তন। তাই তাঁহারা নমস্য।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

বিজ্ঞানী বা রাজনীতিবিদের চক্ষে সমাজের যে রূপ প্রতিভাত হয়, সমাজের পরিবর্তনের যে কারণ তাঁরা নির্ণয় করেন, যেসব উপাদান নিয়ে যেসব সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হন তা মান্য করেও সাহিত্যিক বলবেন— আপনারা যা বলছেন তা যথার্থ, কিন্তু সব কথাটা আপনারা বলছেন না। বলছেন না কারণ আপনাদের ফরম্যুলায় সেটা ধরা পড়ছে না। জীবনের বহুমুখী বহু-বিচিত্র প্রকাশকে কোনও বাঁধা-ধরা ছকে ধরা যায় না। জীবন-ধারা প্রমত্তা পদ্মার মতো কখন যে কোন্ কূল ভেঙে কোন্‌দিকে ছুটবে তা আগে থাকতে বলা শক্ত। কবি-সাহিত্যিকের চোখে জীবন তাই লীলা। সে লীলার ব্যাখ্যা করবার জন্যে তাঁরা খুব ব্যস্ত নন, কারণ তাঁরা জানেন তাকে সব সময়ে ব্যাখ্যা দিয়ে স্পষ্ট করা যায় না. তার চেয়ে সেটাকে উপভোগ করাই ভালো। এই নির্বিকার মনোভাব অবশ্য সব সাহিত্যিকের নেই, আমারও নেই। তাই বর্তমান সমাজের চেহারা দেখে আমরা কেউ হৃষ্ট, কেউ ক্লিষ্ট হই।

আমার বয়স একাত্তর (৭১) বছর। আমি যে সমাজ দেখেছিলাম সে সমাজ লোপ পেয়েছে।

খুব ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে পূজোর সময় গিয়েছিলাম! তখন আমার বয়স সাত আট বছর। এর একটা স্মৃতিচিত্র এঁকেছিলাম গদ্য কবিতায়। উদ্ধৃত করছি সেটা।

চণ্ডীমণ্ডপে পূজো হচ্ছে
গ্রামের সবাই
সমবেত হয়েছে সেখানে
অসীম আগ্রহ ভরে।

ছেলেমেয়েদের ছুড়োছুড়ি
হাসি কলরব ;

গ্রামের ঢুলিরা বাজনা বাজাচ্ছে
ঢোলের পালক দুলিয়ে দুলিয়ে,
নেচে নেচে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে
একটা মেলা বসে গেছে যেন
মাটির পুতুলের কি সমারোহ
খাবারের দোকান সারি সারি
নানা রঙের খাবার সাজানো।

আর এক পাশে
পল্লী শিল্পের নানা নিদর্শন,
ঝুড়ি, কুলো, মাদুর চাটাইয়ের
নানা নমুনা;
সবার মুখে হাসি।

প্রকাণ্ড সামিয়ানা বাঁধা হচ্ছে
যাত্রা হবে
দশখানা গাঁয়ের লোক দেখবে।

গ্রামের বউ গিন্নিরা
ভার নিয়েছেন ভোগের।

কোথাও ফল কুঁচোনো হচ্ছে,
তরকারি কোটা হচ্ছে কোথাও,
কোথাও রান্না চড়েছে।

লুচি-ভাজার গন্ধে
চতুর্দিক আমোদিত

ফুল-বেলপাতা স্তূপাকার।
ভারে ভারে দুধ দই আসছে
মিষ্টান্নও নানা রকম।

গয়লা, ময়রা দোকানী, কুমোর
সবাই শশব্যস্ত
মায়ের পূজো নির্বিঘ্নে হওয়া চাই,
সবারই মুখ উদ্ভাসিত।

পূজোর ক'দিন কারো বাড়িতে
রান্না হবে না
সবাই মায়ের প্রসাদ পাবে।

পট্টবস্ত্র-পরিহিত পুরোহিতরা
তারস্বরে পাঠ করছেন চণ্ডী
উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে
।

ছোট ছোট মেয়েরা শুদ্ধ কাপড় পরে'
গাঁথতে বসেছে
শিউলি ফুলের মালা
বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একধারে দাঁড়িয়ে
নাম শোনাচ্ছে খঞ্জনি বাজিয়ে।
মাইক নেই।

বর্তমানে কোনও গ্রামে ঠিক এই ধরনের পূজা অনুষ্ঠিত হয় কি না জানি না। বোধহয় হয় না। আজকাল পূজোর সময় কেউ বাড়িতে থাকে না। নানা জায়গায় বেড়াতে বেরোয়। মুসৌরি, নৈনিতাল, দার্জিলিং বা দক্ষিণ ভারত। হোটেলে খায়। বড় বড় শহরে পূজোর চেহারা দেখে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম—

বৎসরান্তে একবার প্রতিমা সাজায়ে
উচ্চনাদে 'মাইক' বাজায়ে
কাঁপাইয়া চারিদিক ঢোলে আর ঢাকে
রোগজীর্ণ দেহটাকে সাজাইয়া আজব পোশাকে
তোমার সম্মুখে নাচি কুঁদি
রামা, শামা, পট্‌লি, খেঁদি, ভুঁদি।

রঙীন মাসিকপত্রে বাজে লেখা করিয়া বাহির
ফি বছর নিজেদের করিতেছি কেবল জাহির।
কিছু বল না তুমি ; আস্পর্ধা বাড়িতেছে তাই।

এবারে দোহাই
অসুরকে ছেড়ে তুমি আমাদের ধর
ঠেঙাইয়া লাস কর।

চড় মেরে লাথি মেরে কান মলে' মলে'
বার বার দাও দেবি ব'লে
তোমাদের এই রং চং
মনোরম নয় বাপ
ইহা শুধু পশুর প্রলাপ
তোমরা মানুষ নও, হাস্যকর সং।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বর্তমান সভ্য সমাজের 'লীলা' দেখে মুগ্ধ হ'তে পারি নি। কষ্ট হয়েছে, রাগ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মনের সঙ্গে আপস করেছি—যা হচ্ছে তা অনিবার্য। ঝড় এলে, ভূমিকম্প হলে তা যেমন সহ্য করি এসবও তেমনি সহ্য করছি। আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজে যে দুটি জিনিস সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে তা হচ্ছে রাজনীতি এবং সিনেমা। বিবেকানন্দ বলে' গিয়েছিলেন—ধর্মই এ

দেশের প্রধান প্রেরণা। রাজনীতি এবং সিনেমার প্রভাব বেশী স্পষ্ট ছিল শহরের সমাজেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত। এখন তা পল্লীগ্রামেও পরিব্যপ্ত হয়েছে। রাজনীতি এবং সিনেমা মানুষের ক্ষুধাকে উত্তেজিত করে, তার অভাববোধকে জাগ্রত করে, নিজেও অশান্ত হয় এবং নিজের চারিদিকে অশান্তির বীজ বপন করে। নিজের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করবার শিক্ষা দেয় যে ধর্ম সেই ধর্মকেই বিপর্যস্ত করে এই দুটো জিনিস। এ দুটোর প্রভাব বেশী হয়েছে বর্তমান সমাজে তাই সমাজের চেহারা বদলে গেছে। কেউ সন্তুষ্ট নয়, সবারই মুখে বুলি কিম্বা মনে কামনা—আরও চাই, আরও চাই। সদা-সন্তুষ্ট থাকা উচিত, না জীবনযুদ্ধে সদা-উন্নতি-কামী হয়ে যুযুধান হওয়া উচিত এ প্রশ্নের নানা মুনির নানা মত চিরকালই শোনা গেছে। একদল যে মত প্রকাশ করেছেন, আর একদল তা খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। আমি এ মতবিরোধের মধ্যে না গিয়ে এইটুকু শুধু বলতে চাই অতিরিক্ত সন্তুষ্টি মানুষের চরিত্রে ঘুণ ধরিয়ে দেয়, আর অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পশু করে তোলে। এই দুই 'অতি'র মধ্যবর্তী যে পথ তাই সভ্য মানুষের পথ। আপাতত আমাদের সমাজে সে পথ দেখা যাচ্ছে না। নানারকম অভাবের তাড়নায়, নানারকম উত্তেজনার বশে আমরা পশুই হয়ে গেছি। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি খুব হতাশ নই। কারণ বিবেকানন্দ যে কথা বলে' গেছেন তা মিথ্যে নয়। আমাদের অন্তরের অন্তরতম লোকে ধর্মের শিখা এখনও জ্বলছে। কি ভালো, কি করা উচিত তা এখনও আমরা বুঝি, কিন্তু যে অন্যায় অবিচার অত্যাচারের তোড়ে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি তা এমন শ্বাসরোধকর যে আমরা মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস একদিন আমরা সুস্থ হতে পারব। আমরা অনেকবার এরকম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে আবার সামলে নিয়েছি ইতিহাসে এর অনেক নজির আছে। ধর্মবুদ্ধি শেষ পর্যন্ত জাগ্রত হয়, বৃহৎ আদর্শ যে অমর তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের এই দুর্যোগের দিনেও অনেক তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি যে তাঁরা আদর্শবাদী। গুণ্ডামি, নোংরামি,

অশালীনতাকে তাঁরা ঘৃণা করেন। তারা সেই সনাতন ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী যার কথা বিবেকানন্দ বলে' গেছেন। কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে দেখে আমরা মনে করি যে তারা সংখ্যাগুরু কিন্তু সমস্ত দেশের জনসংখ্যার কথা ভাবলে আমাদের সে ভুল ভেঙে যায়। রাজনীতির সভায় বা সিনেমার টিকিট ঘরে অশালীন জনতার ভীড় হয়, কিন্তু কুম্ভমেলার ভীড় বা গঙ্গাসাগর স্নানের ভীড় বা তীর্থে তীর্থে প্রতিদিন পুণ্যার্থীদের ভীড়ের তুলনায় সে ভীড় কি খুব বেশী? তাছাড়া দেশের মানসিক ভিত্তির খবর কি রাখি আমরা? রাখলে দেখতে পেতাম বিবেকানন্দ যে ধর্মের কথা বলে' গেছেন তার মর্মবাণীই সে ভিত্তিকে নির্মাণ করেছে। তাই মনে হয়, কেটে যাবে মেঘ—।

বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীদের প্রতি

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ আপনাদের বার্ষিক উৎসবে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন, এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দেশের আজ বড় দুর্দিন। শুধু আমাদের দেশের নয় সর্বদেশের আজ বড় দুর্দিন। পৃথিবীর কোথাও যেন শান্তি নেই। কোথাও যেন মনুষ্যত্বের মহান পতাকা আর উড়ছে না, সবাই যেন পশু। কিন্তু এই শোচনীয় পরিবেশের মধ্যেও আমাদের কর্তব্য করে যেতে হবে।

আপনারা এ দেশে বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মী। আপনাদের খুব বড় দায়িত্ব। কারণ আপনারা আলোর বাহক। মনুষ্যসমাজের এমন একদিন ছিল যখন তাদের নিজেদের আলো ছিল না, চন্দ্র-সূর্যের আলোর উপর নির্ভর করত তারা। ঐতিহাসিকেরা বলেন কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করে' যে আগুনের এবং আলোর উৎপত্তি স্বাভাবিক ভাবে মাঝে মাঝে দাবানল সৃষ্টি করত তার থেকেই মানুষ আলোক-উদ্ভাবনের

প্রথম ইঙ্গিত পেয়েছিল। সেইদিন থেকে বিদ্যুৎ-উদ্ভাবনের ইতিহাস পর্যন্ত যে ইতিবৃত্ত তা চমকপ্রদ। এখন আমরা বিদ্যুৎ যুগে রয়েছি, আগামী কাল হয়তো আণবিক যুগে উপনীত হব। কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, যন্ত্রসভ্যতা আমাদের পঙ্গু করেছে, আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করেছে। ব্যক্তিগত নয় ব্যষ্টিগত উদযোগের উপর আমরা নির্ভরশীল। এখন একদিন যদি কলে জল না আসে, একদিন যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, একদিন যদি বাস ট্রাম না চলে তাহলে আমাদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ে। তাই আমাদের বুদ্ধি এবং প্রতিভার অগ্রগতির সঙ্গে চারিত্রিক অগ্রগতিও নিতান্ত আবশ্যক। যাঁরা এই যন্ত্রসভ্যতার ধারক এবং বাহক তাঁরা যদি বিবেকী না হন তাঁরা যদি তাঁদের দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি না করেন তাঁরা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে বৃহত্তর কর্তব্য থেকে চ্যুত হন তাহলে এই যন্ত্র-সভ্যতা আমাদের কাছে আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে উঠবে। এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো এই যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধেই একদিন মানুষের স্বাধীন মন বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, কারণ স্বাধীনতাই মানুষের সবচেয়ে কাম্য জিনিস।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎপর্ষদ আমাদের দেশের অনেক কাজ করেছেন, গ্রামে গ্রামে তাঁরা বিদ্যুতের আলো জ্বেলেছেন, মাঠে মাঠে বিদ্যুৎ-চালিত সেচ-প্রকল্পে দেশের অনেক উপকার হচ্ছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী, এখনও অনেক অন্ধকার বিদূরিত করতে হবে, এখনও অনেক ফসল ফলাতে হবে। সে দায়িত্ব আপনাদের, আশা করি আপনারা সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে প্রমাণ করবেন যে আপনারা এই যন্ত্রসভ্যতার সুযোগ্য সভ্য। নমস্কার।

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনারা যে উদ্দেশ্যে এই পাঠাগারটি স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা মহৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানে একটি জিনিস বাঙ্গালীদের কাছে এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে প্রচলিত পদ্ধতিতে লেখাপড়া শিখিয়া আমরা জীবন সমস্যা সমাধান করিতে পারিতেছি না। সুতরাং আপনারা যদি আপনাদের প্রতিষ্ঠানে এমন কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন যাহাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বল্প ব্যয়ে হাতে কলমে কাজ শিখিয়া রোজগার করিতে পারে, তাহা হইলে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জনসাধারণের বহুত উপকার হয়! উচ্চশিক্ষার যে প্রয়োজন নাই তাহা আমি বলিতেছি না, খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু এ কথাটা মনে রাখা উচিত উচ্চশিক্ষা সুলভ নহে। অনেকে সে শিক্ষালাভের উপযুক্তও নন। সকলের সে বিষয়ে তেমন আগ্রহও নাই। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ করা। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য চাকরি। কিন্তু তাহা আজকাল পাওয়া যায় না তাই নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য ছোট-খাটো ব্যবসা—যেমন সাইকেল প্রস্তুত, রেডিও মেরামত, ইলেকট্রিকের কাজ, মোটরের কাজ প্রভৃতি শিখাইবার জন্য যদি কোনও ব্যবস্থা এখানে হয় তাহা হইলে স্বাবলম্বী হইবার সুযোগ পাইয়া আমাদের ছেলেমেয়েদের অনেক দুঃখ লাঘব হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীকে এখন কাজ করিতে হইবে, মূল্যহীন ডিগ্রী লইয়া, চাকরি-আলেয়ার পিছনে ছুটিলে আমাদের দুঃখ বাড়িবে।

স্বামীজি কর্মনিষ্ঠ হইবার জন্য আমাদের বার বার আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আহ্বান আমরা শুনি নাই। চাকরি-লোভী হইয়া আমরা আজ যে সমস্যা-পঙ্কে ডুবিতেছি তাহা ভয়ঙ্কর।

এবার কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। সমাজের ইষ্ট হয় এরকম যে কোন কাজই মহৎ কাজ, যত ছোটই হোক কোন কাজই হেয় নয় এ বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হোক এই কামনা করি। আপনারা তাহারই সুব্যবস্থা করুন এই আমার অনুরোধ। নমস্কার।

উদয় সংঘের বার্ষিক কবিসভায় সভাপতির ভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের বার্ষিক উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। মানব সমাজের দীর্ঘ-ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া আমরা মানবদের প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছি। একদল ভদ্র, আর একদল অভদ্র। একদল সভ্য, আর একদল অসভ্য। বলা বাহুল্য এখনও অভদ্র এবং অসভ্যদের সংখ্যা বেশী, ভদ্র এবং সভ্যরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। তবু এই সংখ্যালঘিষ্ঠরাই আমাদের আদর্শ, ইহারাই চিরকাল আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। এই ভদ্রশ্রেণীর মানবেরা পরের দুঃখে কাতর হন, পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, পরের জন্য আত্মবিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। আপনারা আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাই আপনারা পৃথিবীর ভদ্রসমাজে শ্লাঘনীয় পূজনীয়। মানুষের মহত্তম আবিষ্কার আত্ম-আবিষ্কার, মানুষের উজ্জ্বলতম কীর্তি লুণ্ঠনে নয় ত্যাগে, মানুষের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা—প্রেম, ঘৃণা নয়। ইতিহাসের মহাশ্মশানে যে সব দস্যুদল আজ নিশ্চিহ্ন—সেই চেঙ্গিস, আলেকজাণ্ডার, নপোলিয়ন, হিটলার—ভদ্রসমাজে সম্মানিত নন। ভদ্রসমাজে পূজিত বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য, নানক। ভদ্রসমাজে সম্মানিত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, নফর কুণ্ডু—ভোটজয়ী অসাধু রাজনৈতিক নেতারা নন।

ভদ্রসমাজের ধারক ও বাহক মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবন। যুগে যুগে যৌবনই আদর্শের শিক্ষাকে প্রাণবহ্নি দিয়া উজ্জ্বল করিয়াছে। বাংলাদেশে আজ চিরন্তন আদর্শের বহ্নি আজ যেন নিষ্প্রভ।

বাংলা দেশের নিষ্প্রভ যৌবন আবার উজ্জ্বল হোক প্রভাময় হোক এই কামনা করছি।

পাহাড়ী সান্যাল মহাশয় সম্বর্ধনা সভায়

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনারা আজ শ্রীমান পাহাড়ী সান্ন্যালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছেন এতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। গুণীকে নিশ্চয় শ্রদ্ধা করা উচিত। কিন্তু এই শ্রদ্ধা-নিবেদন যখন সভার রূপ ধারণ করে তখন তা একটু জটিল হয়ে পড়ে। সভার জন্যে একটা ঘর চাই, সভাপতি চাই, প্রধান অতিথি চাই, বিশিষ্ট অতিথি চাই, গাইয়ে-বাজিয়েদের চাই, আলোকসম্পাত করবার জন্যে হয়তো আলোক-শিল্পীকেও চাই। ফোটো তোলবার জন্য ক্যামেরা তো চাই-ই। এই সব নানা-রকম গোল-হরিবোলে আসল শ্রদ্ধা অনেক সময় মারা যায়। কারণ শ্রদ্ধা অতি সুকোমল, অতি সুপবিত্র জিনিস। ভীড়ে গোলমালে তার প্রকাশ হওয়া শক্ত। আজকাল গুণীদের জীবনেও এই সম্বর্ধনা ব্যাপারটা একটা অনিবার্য ঝঞ্ঝাট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ সম্বর্ধনা দেব বললে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এক সভার সম্মুখীন হয়ে ক্রমাগত আত্মপ্রশংসা শুনতে শুনতে যে কি অস্বস্তি হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না। তা অন্তরের জিনিস—

সে ফুল বাজারে নাই
মনে তাহা ফোটে
সুগোপন পথ বেয়ে
অলি তার জোটে—

বহুলোকের এইরকম সুগোপন শ্রদ্ধাই কালক্রমে ঐতিহ্যে পরিণত হয়। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, কাশীরাম দাস, তানসেন, এইরকম ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছেন। বিখ্যাত ফরাসী লেখক Alexander Dumas-কে একবার তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন—তোমার তো, সব হয়েছে, খ্যাতি

পেয়েছ, টাকা পেয়েছ আর তোমার কি কার্য আছে? ডুমা উত্তর দিয়েছিলেন, আছে—আমি tradition-এ পরিণত হতে চাই। এই tradition বহু মনের অকপট গভীর শ্রদ্ধারই নামান্তর।

শ্রীমান পাহাড়ী সত্যই একজন প্রথম শ্রেণীর গুণী। তিনি যে শুধু বড় অভিনেতা তা নন। তিনি ভাল গায়ক, তিনি সুরসিক, তিনি সাহিত্য-বোদ্ধা, বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ইংরেজি, ফরাসী এই পাঁচটি ভাষার সাহিত্যে তিনি বিচরণ করেন। এমন সুমিষ্ট নিরহঙ্কার স্বভাব খুব কম লোকেরই দেখেছি। অর্থাৎ তিনি শুধু যে বড় শিল্পী তা নন, তিনি মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। আজকাল পথেঘাটে অনেক লোকের ভীড়, কিন্তু ভদ্রলোক ক্বচিৎ দেখা যায়। পাহাড়ী ক্বচিৎ-দৃষ্ট ভদ্রলোক একজন। তাকে ভালবাসি, তাকে শ্রদ্ধা করি।

তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি। আশীর্বাদ করছি সে যেন এই যুগে—যে যুগে আলকাতরারই প্রাধান্য বেশী—সে যুগে সে যেন তার জীবনের সাতরঙা ইন্দ্রধনুর জয়ধ্বজাটি উঁচু করে রাখতে পারে।

ভগবান তাকে সুস্থ দীর্ঘায়ু দান করুন এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার।

সমাজ ও চিকিৎসক

সমাজের সঙ্গে চিকিৎসকের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শুধু আজ নয়, সেই আদি যুগ থেকে। যখন আমাদের নাম ছিল 'উইচ্ ডকটরস্'। সেই উইচ্ ডক্টার্সই কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান যুগের সুশিক্ষিত সুবিজ্ঞানী ডাক্তারে পরিণত হয়েছেন। সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁরা ছাড়তে পারেন নি, ছাড়া সম্ভব নয় বলে। সমাজহিতব্রতী সমাজসেবী হ'তে হলেও সমাজ চাই, আবার ডাক্তারি পেশা চালাতে হলেও চাই। সন্ন্যাসীরাই সমাজে ত্যাগী হতে পারেন, ডাক্তাররা সন্ন্যাসী নন। সমাজের

পক্ষেও ডাক্তার অপরিহার্য, কারণ শরীরং ব্যাধি মন্দিরং। বাড়িতে ডাকাত পড়লে লোকে যেমন পুলিশে খবর দেয়, অসুখে পড়লে তেমনি ডাক্তার ডাকে। ডাক্তার ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এদেশে ডাক্তারদের সঙ্গে রোগীর একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। ডাক্তারকে রোগীরা বাড়ির আপনজন মনে করতেন। বিশ্বাস করতেন ডাক্তারবাবু তাঁর হিতৈষী আত্মীয়, অর্থ-লোভী প্রতারক নন। সে সম্পর্ক এখন মলিন থেকে মলিনতর হয়ে যাচ্ছে। এখন সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছে—ফেল কড়ি মাখ তেল—গোছের। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোকই গরীব। আধুনিক যুগের ট্যাবলেট-প্রধান ল্যাবরেটরি-নির্ভর দুর্মূল্য চিকিৎসা ক্রয় করবার শক্তি অনেকেরই নেই। কম পয়সায় সুচিকিৎসা হবার কোনও ব্যবস্থা নেই এদেশে। যা আছে তা ভড়ং এবং ভাঁওতা। যে কটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তাতে ভিখারী-বিদায় করা হয়, সুচিকিৎসা হয় না। সেখানে ডাক্তারের সংখ্যা কম, ওষুধ অপ্রচুর। যেটা প্রচুর পরিমাণে আছে সেটা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা, অসাধুতা আর গরীব রোগীদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার। সুতরাং দরিদ্র জনসাধারণ আগে ডাক্তারদের যে ভক্তিশ্রদ্ধা করত এখন তা আর করে না। তাদের মনে ডাক্তারদের সম্বন্ধে একটা ভীতি ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হচ্ছে ক্রমশ। তাই তারা এখন সেই সব ডাক্তারদের কাছে গিয়ে ভীড় করছে যাদের ফি কম, ওষুধের দাম কম। প্রতি গ্রামেই তাই কোয়াক এবং হোমিওপ্যাথদের কদর ক্রমশ বাড়ছে। অ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা খুব বিজ্ঞান-সম্মত মানছি, কিন্তু ক্রমশ এ চিকিৎসা এত ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ছে যে আমাদের গরীব সমাজের মাথার উপর তার ভার পর্বতের ভার-সদৃশ হয়েছে। আগে তারা শুধু মারা যেত। এখন ধনে-প্রাণে মারা যাচ্ছে। ডাক্তারদের এখন প্রকারভেদও হয়েছে নানারকম। আগে একটা ডাক্তার ডাকলেই চলত, এখন তাতে চলে না। এখন স্পেশালিস্টদের যুগ—যিনি চোখ দেখেন তিনি গলা দেখেন না। এমন

একদিন হয়তো আসবে যেদিন বুড়ো-আঙুল স্পেশালিস্ট আর কড়ে-আঙুল স্পেশালিস্টও আসবেন। আসুন, ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের এ হয়তো অনিবার্য ফল—কিন্তু গরীব সমাজের সাধ্যে সে কুলুচ্ছে না। এতে শুধু যে সকলের সুচিকিৎসা হচ্ছে না তাই নয়, ডাক্তার-রোগীর সম্প্রীতির বন্ধনটাও আলগা হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তাররা আর noble profession-এর লোক বলে সম্মান পাচ্ছেন না, সাধারণ ব্যবসাদারদের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছেন তাঁরা। ডাক্তাররা আজকাল অর্থের দাপটে, খ্যাতির জৌলুসে, বা ডিগ্রির পেখম বিস্তার করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করছেন, কেউ কেউ কিছুটা হয়তো সফলও হয়েছেন, কিন্তু সে সাফল্য সমাজ-হিতকর নয়। কারো হিত করতে গেলে তাকে ভালবাসতে হবে, তার দুঃখের দুঃখী হতে হবে, উচ্চ বেদীর উপর দাঁড়িয়ে অনুগ্রহ বিতরণ করলে মনের চাবিটি খুলবে না, আর সে চাবিটি যদি না খুলতে পারেন তাহলে আপনার অগাধ ঐশ্বর্য সত্ত্বেও সেই মণিটি আপনি পাবেন না যার নাম ভালবাসা—যে ভালবাসা আপনাকে মুকুটহীন সম্রাটের সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারে, যে ভালবাসার স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হয়। এ ভালবাসাও অর্জন করতে হয়। করতে হয় মহৎ চরিত্র দিয়ে।

সমাজেরও কর্তব্য আছে ডাক্তারদের প্রতি। এ কর্তব্যেরও ভিত্তি ভদ্র চরিত্র। বস্তুত কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের সমাজ ভদ্রতারই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি সে সমাজ আর নেই। একটা ভাষাহীন নিদারুণ নৈরাশ্যে তাদের সমস্ত ভদ্রতা যেন অবলুপ্ত। নিছক বেঁচে থাকবার তাগিদে তারা আজ বিশৃঙ্খল, উচ্ছৃঙ্খল। তাদের চোখের সামনেই আজ সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিমাগুলি বিসর্জিত হচ্ছে, তারা দেখছে অসত্য-অশিব এবং অসুন্দরই আজ পূজিত-সম্মানিত ও গৌরবান্বিত। সমাজের লোক আজ সুস্থ নয়। তারা অসুস্থ, তারা আত্মরক্ষার জন্য কেউ তাই দুর্বিনীত, কেউ ঈর্ষাক্লিষ্ট, কেউ দাম্ভিক, কেউ খোশামুদে। সকলেরই এক লক্ষ্য—টাকা। যেমন করে হোক টাকা চাই। টাকাই এখন ধর্ম, টাকাই এখন একমাত্র

উপাস্য দেবতা। এ সমাজে গুণীর আদর নেই, এ সমাজে ধনীরাই আদৃত। ধনীরাই হয় খোলাখুলি—না হয় নলচে আড়াল দিয়ে—সমাজ শাসন করছেন। বাজারে প্রত্যেকটি জিনিসের আকাশ ছোঁয়া দাম, স্কুল-কলেজের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ। সে মহার্ঘ শিক্ষাও যাঁরা কিনছেন তাঁরা শিক্ষিত হচ্ছেন না, গুণ্ডা হচ্ছেন। কারণ এ বাজারে শিক্ষিত ভদ্রলোকের চেয়ে বেপরোয়া গুণ্ডারই বেশী আধিপত্য। চতুর্দিকে নানারকম দুর্নীতি। একটা হুঙ্কার জনক ঘূর্ণাবর্তে সমাজ আজ আবর্তিত হচ্ছে। কিছুর উপরই—কারো উপরই কারো বিশ্বাস নেই। আশা করা গিয়েছিল আমাদের স্বাধীন সরকার আমাদের দেশে আদর্শ সমাজ স্থাপন করতে পারবেন। কিন্তু তা তাঁরা পারেন নি। অভাব-অনটন-হতাশা-দুর্গতি বেড়েই চলেছে। অনেক জায়গায় সর্ষের ভিতরই ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এ সমাজ যে ডাক্তারদের প্রতি কর্তব্য-পরায়ণ হবেন সে আশা দুরাশা।

এ অবস্থায় তাহলে উপায় কি? আমরা হাল ছেড়ে এই পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসিয়ে দেব? না তা দেব না। অনেকদিন আগে আমার অগ্নীশ্বর পুস্তকের নায়ক ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁর ছাত্রকে যে কথা লিখিছিলেন তাই আজও বলছি আপনাদের সভায়। প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করেই মানুষ সভ্য হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির সব চেয়ে যেটা কড়া নিয়ম যা অনিবার্য যা অমোঘ ডাক্তাররা অস্ত্রধারণ করেছে তারই বিরুদ্ধে। তাদের লড়াই মৃত্যুর সঙ্গে। এই লড়াই করতে করতে তারা নিজেরাও দলে দলে মরছে, কিন্তু তার পিছনে আসছে আর একদল, তুমিও এবার সেই দলে যোগ দিয়েছ। ডাক্তারদের বাজার দর যদিও বা কমে আসছে, আসল দর কোনও দিনই কমবে না যদি তারা অমানুষ না হয়। মানুষ অসুখে পড়বেই এবং সে আর্ত হয়ে তোমার কাছে আসবেই তখন তুমি যদি তার সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার কর তাহলে তুমি শুধু যে তাদের রোগ চিনতে পারবে তা নয় তাদেরও চিনতে পারবে। ডাক্তাররাই লোকেদের স্বরূপ চিনতে পারে। সেই রূপ যদি বিকৃত বা কদর্য হয় সেটা সংশোধন করবার

ভার নিতে হবে আমাদের। বর্তমান যুগে যখন সমাজকে সুস্থ রাখবার কোন ব্যবস্থাই কোনও দিকে দেখা যাচ্ছে না যখন আমাদের দেশের শাসকেরা এ বিষয়ে উদাসীন। আসুন আমরাই বদ্ধপরিকর হই এই রোগ সারাবার জন্যও। এ রোগের ওষুধ antibiotic Tublet বা injection নয় এ রোগের ওষুধ সংগ্রহ করতে হবে হৃদয়-ভাণ্ডার থেকে। হতে হবে নিষ্কলঙ্ক মহৎ চরিত্রের অধিকারী। ভালবাসতে হবে হীন অধঃপতিতকেও। সমাজের এই নিদারুণ অবস্থা একটা ব্যাপক মানসিক রোগেরই বহিঃ-প্রকাশ। সে রোগের চিকিৎসাও আমাদেরই করতে হবে। নিজেদের স্বার্থের জন্যই করতে হবে, কারণ সুস্থ-ভদ্রসমাজ না থাকলে সুস্থ-ভদ্র ডাক্তারও লোপ পাবে। সেই পুরাতন বাণী দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করি। 'আপনি আচরি ধর্ম শিখাও আপরে'। আমি জানি একথা বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। সহজ নয় বলেই আমার বিশ্বাস ডাক্তাররা তা পারবেন। পৃথিবীর ইতিহাস ডাক্তারদের অসাধ্য সাধনের কাহিনীতে সমুজ্জ্বল। নমস্কার।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সাহিত্য সভায়

প্রীতিভাজনেষু,

সাহিত্য সভ্যতার সৃষ্টি। তাহার উদ্দেশ্য মানুষের মনকে সত্য-শিব ও সুন্দরের দিকে উন্মুখ করা। অসভ্যতা বা অশালীনতা সাহিত্যকে কলঙ্কিত করে। যাহা কিছু লেখা যায় বা ছাপা হয় তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে। সাহিত্য-রসিকরা এ সত্যটি জানেন। যাঁহাদের প্রতিভা নাই তাঁহারা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনা করিতে পারেন না। কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া সুখপাঠ্য প্রবন্ধাদি রচনা করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। আর একটা জিনিস স্মরণ রাখা দরকার। সাহিত্যিক হইতে হইলে সাধক হইতে হইবে। ইহার জন্য

প্রচুর অধ্যয়ন, নিরবচ্ছিন্ন মনন এবং অনলস প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শুধু সাহিত্য রচয়িতা নহে ভাল সাহিত্য পাঠকদেরও জন্য এই সাধনা আবশ্যক। সাহিত্য জগতে স্রষ্টা এবং রসিক উভয়েরই প্রয়োজন, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক।

আপনাদের সাহিত্য সাধনা নির্মল ও ফলপ্রসূ হোক এই কামনা করি।

কবি করুণানিধানের স্মৃতিচারণ

বাংলা দেশে কবি হয়ে জন্মগ্রহণ করা এক পরম দুর্ভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথ যদি নোবেল পুরস্কার না পেতেন? ভাগ্যিস পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বড় কবি। তাঁর প্রতিভার দিকনির্ণয় করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের বাংলাসাহিত্যে আর যে অনেক বড় কবি জন্মেছেন আমরা তাঁদের কজনকে আর মনে রেখেছি! অক্ষয়কুমার বড়াল আজ বিস্মৃত। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও আমরা কজন আর জানি! অনেকেই ভুলে গেছেন।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-পরবর্তী যে কয়জন কবি ছিলেন যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, কালিদাস রায়—এঁদের মধ্যে সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন একজন।

অনেক বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার সামনাসামনি পরিচয় ও আলাপ হয়েছে। এটা আমার সৌভাগ্য।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সৌভাগ্য একবার সামনা-সামনি দেখা হয়েছিল। তাঁকে আমি প্রথম দেখেছিলুম কোথাও গিয়ে নয়, তিনি হঠাৎ—হ্যাঁ হঠাৎই তিনি আমার ভাগলপুরের বাড়িতে

এসেছিলেন একদিন কোনো খবর না দিয়ে। তিনি যাচ্ছিলেন মধুপুর। তিনি ভাগলপুর স্টেশনে পুর শব্দ দেখেই ভাবলেন মধুপুর।

কবি করুণানিধানের আমার ভাগলপুরের বাড়িতে যাওয়টা সত্যিই আকস্মিক। অন্যান্য সাহিত্যিকরা প্রায় কোনো-না-কোনো সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ভাগলপুরে গিয়েছেন এবং আমার বাড়িতে সেই সময় আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু করুণানিধান তা করেন নি। তিনি হঠাৎ গিয়েছিলেন।

একদিন সন্ধ্যের সময় বাড়িতে বসে আছি। দেখি একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। একটি ছেলে গাড়ি থেকে নেমে এসে বললে—কবি করুণানিধান এসেছেন।

কবি করুণানিধান! অবাক হয়ে ছেলেটিকে প্রশ্ন করলুম। আমি বুঝতেই পারি নি। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় তিনি?

সে বললে—গাড়িতে।

আর বললে—হ্যাঁ তিনি ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন মধুপুর। ট্রেনটা অনেকক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটাই মধুপুর স্টেশন? ছেলেটা বলেছিল—ভাগলপুর। শুনে তিনি বললেন—এটা ভাগলপুর! তা হলে তো এখানে বনফুল থাকে। এখানেই নামবো। বনফুল যেখানে আছে সেইখানেই মধুপুর।

যাই হোক তারপর তিনি সেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে জিনিসপত্তরসহ একটা ঘোড়ার গাড়ি করে এলেন আমার ভাগলপুরের বাড়িতে। তিনি গাড়িতে বসে আছেন শুনে আমি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলুম। আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার দুগালে —এগালে ওগালে কপালে, ঠিক ছোট ছেলেকে যেমন ভাবে চুমু খায় ঠিক তেমনি ভাবে চুমু খেলেন।

আমি বললুম—আপনি হঠাৎ এলেন?

বললেন—অনেকদিন থেকে ভাই তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। ভাবলুম ভাগলপুর স্টেশনে ট্রেন এসেছে যখন তোমাকে দেখেই যাই। এ সুযোগ আর ছাড়লুম না। ভারী খুশি হলুম তোমাকে দেখে। তুমি

আমার জন্যে কিছুমাত্র-ব্যস্ত হয়ো না। আমার রাত্রিতে খাবার লাগবে না, কিছু লাগবে না। আমার সঙ্গে বিছানা-টিছানা আছে। তোমার লেখা পড়ে আমার এত ভাল লেগেছে যে তোমায় দেখার আমার বড় আগ্রহ ছিল। ট্রেনটা ভাগলপুরে থামায়, আমি বললুম এ সুযোগ আমি ছাড়বো না। আমি নেমে পড়লুম।

আমি বললুম—আপনি আমার অগ্রবর্তী, আমার জ্যেষ্ঠ। আপনি আমায় এত পরপর ভাবছেন কেন? কিচ্ছু খাবেন না, সেকি হয়? রাত্রে ভাত বা রুটি, দুধভাত বা সাবু যা বলবেন তাই হবে।

অনেক পেড়াপেড়িতে বললেন—আমার জন্যে বিশেষ কিচ্ছু ব্যস্ত হতে হবে না, আমি একটু দুধ আর খৈ খাবো। কই, বৌমাকে ডাকো। আমি বুঝিয়ে বুলে দিচ্ছি।

বৌমা এলেন। বললেন—আমার জন্যে কিচ্ছুমাত্র ব্যস্ত হতে হবে না বৌমা। আমি সামান্য দুধ খৈ খাই। আমার সঙ্গেই বিছানা মশারী সবই রয়েছে। আমি এই বারান্দায় একধারে রাত কাটিয়ে দেবো।

আমি বললুম—না-না, আপনি বারান্দায় শোবেন কেন? ঘরের মধ্যে খাট রয়েছে খাটের ওপর শুয়ে থাকবেন। বারান্দায় কেন?

অনেক গল্প, আর কবিতা নিয়ে সে তো কত কথা, কত গল্প। আমার মনে হল যেন একটা সুন্দর কোনো পর্বতের একটা ঝর্ণা যেন একেবারে আমার ছোটো বাড়িতে এসে হাজির হল—ঝর-ঝর, ঝর-ঝর করে ঝরছে। তিনি অনর্গল কথা বলছেন, কবিতা বলছেন। কখনো হাসছেন কখনো কাঁদছেন।

তারপর রাত্রিতে তাঁকে খাইয়ে-দাইয়ে শোয়ালুম।

সকালে উঠেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি, তিনি ঘরে নেই। এত সকালে কোথায় গেলেন? এঘর-ওঘর দেখি, না, কোনো ঘরেই নেই। বুড়ো মানুষ, একা কোথায় গেলেন? তখন রাস্তায় বেরিয়ে এলুম। চারদিকে দেখছি। আর একটুখানি এগিয়েই চললুম। বেশ খানিকটা গিয়ে একটা চৌরাস্তা থেকে খুব সরু গলি বেরিয়েছে। সেই

গলিতে মিউনিসিপ্যালিটির একটা প্রকাণ্ড নালি আছে। দেখি কবি করুণানিধান সেখানে মাটিতে উঁচু হয়ে বসে থেলো হুকোয় তামাক খাচ্ছেন আর কেশে কেশে কফ-গয়ের ফেলছেন।

আমি বললুম—সে কি, আপনি এখানে চলে এলেন কেন?

—তোমার বাড়িটা খারাপ করবো না, তাই।

আমি বললুম—না, খারাপ করবার কি আছে? বাড়িতে লোকজন রয়েছে, তারাই সাফ করে দিতো, আপনি এখানে এলেন কেন?

বললেন—তোমার বাড়িটা কেন ময়লা করবো? আমার সকাল বেলা এটা বেরিয়ে না গেলে অস্বস্তি কাটে না।

তখনও তিনি হাঁপাচ্ছেন। আমি একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে এলুম। আমি বললুম—না, না, আপনি চলুন।

আমি তখন সঙ্গে করে আবার বাড়িতে নিয়ে এলুম। আমি বললুম—আপনি থাকুন এখানে, আপনি এত সংকোচ করছেন কেন?

তিনি বললেন—সংকোচ কিচ্ছু নয়। আমি ভাবছি কি জানো? তুমি আমার সুন্দর দিকটা শুধু দেখেছো তোমাকে খারাপ দিকটা দেখাতে চাই না। আমার কবিতা পড়েছো, আমার ভালো দিকটা দেখেছো, নোঙরা দিকটা কাউকে দেখাতে চাই না।

বাড়িতে এসে বললেন—বৌমাকে ডাকো। বেশি কিচ্ছু যেন খাওয়ার আয়োজন না করেন। আমি বেশি কিছু খেতে পারি না। শরীরে সব কিছু সয় না। তাই বলে, তিনি কি কি খেতে পারেন সব কিছু একে একে বলে গেলেন শুকতো-টুকতো ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুদিন ছিলেন আমার বাড়িতে। কত গল্প করলেন। আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলুম তাঁর সঙ্গে আলাপ করে। যাবার সময় দুহাত দিয়ে আমার মাথায় আশীর্বাদ করে গেলেন।

হ্যাঁ, আর একবার দেখা হয়েছিল কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেবার রেডিয়োর কবি সম্মেলনে ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ অনেকেই। তবে সে এক ভয়াবহ কবি সম্মেলন।

করুণানিধান এক দীর্ঘ কবিতা লিখে নিয়ে এসেছিলেন। আমায় দেখাতে, আমি বললুম —এতে যে অনেক সময় লাগবে। আপনি প্রথম অংশটা পড়লেই বোধ হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিক হবে। তিনি তো পড়তে লাগলেন। কিছুটা পড়ার পরই তাঁর শরীর খারাপ করতে থাকায় তখন সজনী-প্রেমেন তাঁকে নিয়ে পাশের একদিকে শোবার ব্যবস্থা করলে। তিনি তো প্রায় শয্যা নিলেন। কবি সম্মেলনে কবিতাপাঠ সকলের চলতে লাগলো। সেই শেষ দেখা আমার সঙ্গে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং কবি জীবনানন্দ দাশেরও। কারণ তার পরই ট্রামের ধাক্কায় চোট খেয়ে মারা গিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। সেইদিনই জীবনানন্দকে প্রথম ও শেষ দেখি। সজনী এমন কাশতে আরম্ভ করলে যে সে আর থামে না। আমার গলাও সেদিন ভাঙা ছিল। তাই ভয়াবহ কবি সম্মেলন বলেছি।

সেই মানুষটি এত সরল এবং শিশুর মতো ছিলেন যে সে রকম লোক আর দেখতে পাই না।

তাঁর ছবিতে দাড়িটাড়িগুলো বেশ বাগিয়ে আঁচড়ানো কিন্তু তা এলোমেলো উড়ো উড়ো থাকতো।

সেই মহাকবিকে স্মরণ করে প্রণাম জানাচ্ছি, এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য কারণ মহৎলোককে প্রণাম করবার সৌভাগ্য বা প্রণাম করবার বুদ্ধি অনেকেরই হয় না। মহৎলোক তার জন্যে গ্রাহ্যই করেন না—কে তাঁকে প্রণাম করলো বা না করলো। কিন্তু যে প্রণাম করে সেই মহত্ত্ব লাভ করে।

আমরা যদি আমাদের চোখ কান খুলে রাখি তা হলে আমাদের এই একঘেয়ে জীবন নানা রঙের নানা রসের নানা সুরের স্পর্শে মধুময় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমরা অধিকাংশ লোকই চোখ কান খুলে রাখি না, যা চোখে পড়ে, কানে ঢোকে সে সম্বন্ধে ঔৎসুক্যও নেই আমাদের। আমাদের চারিদিকে এত গাছ রয়েছে তাদের সম্বন্ধে আমরা প্রায় উদাসীন। দু-চারটি অতি-পরিচিত গাছ ছাড়া অন্য গাছের নামও জানি না। বোটানিকেল গার্ডেনে গিয়ে পিকনিক করি কিন্তু গাছের খবর নিই না। রোজ আকাশে কত তারা ওঠে তাদের চেনেন কি? চেনেন না। আমাদের কৌতূহল নেই। আমাদের চারিপাশে কত পাখি আছে, তাদের আমরা প্রায় দেখি কিন্তু তাদের চিনি না, তাদের পরিচয় জানি না। তাদের কয়েকটির কথাই বলব এই নিবন্ধে।

কয়েকটা পাখিকে অবশ্য না চিনে উপায় নেই। তারা জোর করে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যেমন কাক, চিল, শালিক, চড়াই। কাককে আপনারা রোজই দেখেন। কিন্তু জানেন কি তাদের ডাক শুধু কা কা নয়? কক্ কক্, ক্র ক্র, কোঁয়াক্ কোঁয়াক্, এ রকম ডাকও ডাকে সে। কাকরা মাঝে মাঝে বড় সভা করে। দেখেছেন কি? চিলদের আমরা আকাশে উড়তে দেখেছি। মাঝে মাঝে ছোঁ মেরে তারা যখন ছিনতাই করে তখনও তাদের জ্বালায় বিব্রত হয়েছি, কিন্তু চিলের জীবন চরিত জানবার চেষ্টা আমরা কখনও করি নি। সে সাধারণত উচ্চ-বিহারী। উঁচু জায়গায় বসে থাকে, উঁচু গাছে বাসা করে, কিন্তু দরকার হলে সে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাঠে নেমে কেঁচো ধরেও খায়। বস্তুত, সে যা যখন পায় তাই খায়। কেঁচোও খায়, মুর্গির বাচ্চাও খায়। তার নিকট-আত্মীয় শঙ্খচিলের—(মাথা সাদা, বুক সাদা) স্বভাবটা অবশ্য একটু ভিন্ন ধরনের। যদিও শহরে বা গ্রামে তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু সে জোলো পরিবেশ বেশি পছন্দ করে। তার পছন্দ

নদীর ধার, সমুদ্রের ধার, ঝিলের ধার। তারা খাবারও সাধারণত জলের উপর থেকেই সংগ্রহ করে। সেইজন্য জাহাজঘাটে বা নৌকার ভিড় যেখানে সেখানে ওদের দেখা যায়। ওরা মানুষের হাত থেকে ছোঁ মেরে খাবার কেড়ে নেয় না। চিলেদের আর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে—তাকে ছোটোখাটো ঈগল বলাই সঙ্গত—তার নাম 'খোক্‌না'। এদেশে বড় একটা দেখা যায় না। বিহারে মাছের ভেড়ির কাছে এদের দেখেছি।

শালিক পাখি আমরা রোজ দেখি। শালিক সংস্কৃতে সারিকা। বাংলা কাব্যে শুকসারির কবিতাতেও এই শালিকেরই প্রধান ভূমিকা। পুষলে পোষ মানে। মানুষের কথার নকল করতে পারে। এরা মানুষ-ঘেঁষা গৃহস্থ পাখি। মানুষের বাসার কাছেই, অনেক সময় মানুষের বাড়িতেই এরা বাসা বাঁধে। মানুষের বাড়ির উঠোনে চরে, রান্নাঘরে ঢুকেও চুরি-চামারি করে। এদের ডিম দেখেছেন কখনও? চমৎকার নীল রঙের। এদেরও ডাক এক রকম নয়। আদরের ডাক এক রকম। রেগে গেলে আর এক রকম। ওড়বার সময় পিং করে শব্দ করে। এদের জাতভাইও আছে কয়েকটি। গোশালিক, গঙ্গাশালিক, পাওয়াই। পাওয়াই বাংলাদেশে বড় একটা দেখা যায় না। গঙ্গাশালিক নদীর ধারে থাকে, নদীর পাড়ে গর্ত খুঁড়ে বাসা করে তারা। দেখতে সাধারণ শালিকের মতোই কিন্তু শালিকের চোখের পাশে আর ঠোঁটে হলদে রং, গঙ্গাশালিকের সেখানে কমলা রং। গায়ের রংও যেন একটু অন্যরকম। এদের গায়ের রং প্রায় অবর্ণনীয়। খয়েরি নয়; চকোলেটও নয়। কিন্তু চমৎকার। গোশালিক কালোয় সাদায়। চোখের নীচে সাদার ছোপ, ঠোঁটটি কমলা-রঙের হলদে-রঙের সংমিশ্রণ। চমৎকার দেখতে। সাধারণত বাড়ির আনাচে-কানাচেই থাকে। খুব কলরব করে। মাঝে মাঝে 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলে চেঁচায়। ও কিন্তু গায়কও খুব উঁচু দরের। ওর গান শোনবার সৌভাগ্য যদি হয়—মুগ্ধ হয়ে যাবেন। অপূর্ব গান গায় গোশালিক। সকালের দিকে প্রায় ওর গান শোনা যায়।

চড়াই পাখি আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন। ওরকম মানুষ-ঘেঁষা পাখি আর নেই। কুকুর বিড়াল আমরা পুষি, কিন্তু চড়াই পাখি পুষতে হয় না, ওরা নিজেই এসে আমাদের সঙ্গী হয়। ওরা গায়কপাখি নয়। কিন্তু যখন নির্জন দুপুরে—একটি চড়াই চুনুক-চুনুক শব্দ করে যখন তার সঙ্গিনীকে ডাকে—তখন তার মধ্যে একটা আকুলতা ফুটে ওঠে। মনে হয় বিরহী যক্ষ যেন পাখির ভাষায় মেঘদূতের ব্যাকুলতা সঞ্চারিত করতে চাইছে তার সঙ্গিনীর মনে। চড়াই পাখির কয়েকবার বাচ্ছা হয় বছরে। চোদ্দ পনের দিনের মধ্যেই ওদের আঁতুড় শেষ হয়। ওদের ছোট ছোট ডিমগুলিও সুন্দর। সবুজাভ সাদা। আমাদের বাড়ির আনাচে-কানাচেই তো ওরা বাসা করে কিন্তু ওদের ডিম কেমন তা দেখবার কৌতূহল আমাদের নেই।

শহরের ভিতর ফিঙে, ঘুঘু,· বুলবুল, হলদে পাখি, এমন কি দোয়েলেরও দেখা পাবেন আপনি। কলকাতা শহরেও ওদের আমি দেখেছি। কাজল পাখিও (Shrike) দেখেছি আমি কলকাতায়। কলকাতার একটু বাইরে গেলে বকও দেখতে পাওয়া যায়। এদের মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি।

ফিঙে কুচকুচে কালো পাখি। লেজটি দ্বিধা-বিভক্ত। মনে হয় যেন এক জোড়া ছোরা পাশাপাশি ঝুলছে। ওরা পাহারাদার, হিন্দীতে এদের নাম কোতোয়াল। শত্রু দেখলেই হানা দেয়। প্রায়ই দেখবেন ইলেক্‌ট্রিক তারের উপর বা অন্য কোন উচ্চ স্থানে বসে আছে। গরু বা ছাগলের পিঠের উপরও বসে থাকে অনেক সময়। এদের ডাকও নানারকম। কখনও ঝঙ্কার দেয়, মনে হয় সেতারের সব তারের উপর কে যেন মেজরাপ বুলিয়ে গেল। কখনও বলে মেকি কি, মেকি কি। গলার স্বর ভারী মিষ্টি। এর আর একটা বিশেষত্ব—এ খুব ভোরে ওঠে। রাত আড়াইটের সময় এর ডাক শুনেছি। বিখ্যাত ভিংরাজ-এর আত্মীয়।

ঘুঘুর অস্তিত্ব আমরা টের পাই তার ডাক থেকে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে—ঘু ঘু ঘু ঘু—ঘু নিশ্চয় শুনেছেন আপনারা। ঘুঘু দেখতেও খুব চমৎকার—

বাদামীর সঙ্গে ঈষৎ গোলাপী এবং ছাই-ছাই রং, গলায় পিঠে অসংখ্য কালো আর সাদা ফুটকি। এদের অনেক সময় টেলিগ্রাফ তারে বা উঁচু বাড়ির আলসেতে দেখা যায়। উঁচু গাছেও এরা থাকে। তবে মানুষের সঙ্গে এদের ভাব করতে আপত্তি নেই। কিছুদিন আগে এক জোড়া ঘুঘু প্রায়ই আমার শোবার ঘরে ঢুকত। ঘুঘু সাধারাণত নির্জন স্থান ভালবাসে। কয়েক রকম ঘুঘু আছে এদেশে। লাল ঘুঘু, তিলে ঘুঘু, ধাওয়াল ঘুঘু। চেহারার একটু-আধটু তফাত। ডাকের ধরনও একটু পৃথক। লাল ঘুঘু অতি চমৎকার দেখতে। তবে খুব কম দেখা যায়।

এইবার বুলবুলি পাখিদের কথায় আসা যাক। বুলবুলি মোটেই বিরল নয় আমাদের দেশে। ছোট ছোট পাখি কিন্তু ভারী ছটফটে। সাধারণ বুলবুলের মাথাটি কালো, ঝুঁটি আছে একটি। গায়ের রং ধোঁয়াটে বাদামী, তার উপর আঁশের মত দাগ কাটা। লেজের তলায় লাল। বুলবুল অনেক রকম ডাক ডাকে। কুটুর কুটুর, কটর মটর, কৃষ্ণ প্রিয়, চরাক্ চরাক্—নানারকম বুলি বেরোয় তার মুখ দিয়ে। আমাদের ভাষায় সব বুলি লেখাও শক্ত। প্রাণবন্ত সদা-চঞ্চল পাখি বুলবুলি। দু-সেকেণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকে না। ওর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ল্যাজের তলায় টুকটুকে লাল রঙ। ওদের জ্ঞাতি সিপাহী বুলবুলের গালেও লালের ছোপ। সিপাহী বুলবুল আজকাল বড় একটা দেখতে পাই না। মনে হয় ওরা সংখ্যায় কমে এসেছে। একবার একটা ছোট কাঁটাঝোপের ভিতর বুলবুলের বাসা দেখেছিলাম। ছোট্ট বাটি মতো বাসা। তার মধ্যে ছোট ছোট দুটি ডিম, ডিমের সর্বাঙ্গে ফুট ফুট দাগ। ডিমের রংটা সাদায় গোলাপীতে মেলানো।

হলদে পাখির অস্তিত্বও প্রায় জানা যায়—তার 'টিউ' ডাক থেকে। পাখিটিকে কিন্তু সহজে দেখা যায় না। ডালপালার আড়ালে প্রায়ই আত্মগোপন ক'রে থাকে। হঠাৎ উড়ে যখন এক ডাল থেকে আর এক ডালে যায় তখন দেখা যায় তার অপরূপ স্বর্ণকান্তি। সারা গায়ে হলদে রং, মাথাটি কালো, ডানার পাড়গুলোও কালো। হলদে পাখির অনেক নাম এদেশে। বেনে বউ, ইষ্টি কুটুম, খোকা হোক, কৃষ্ণ গোকুলে— সবই

হলদে পাখির নাম। ও ডাকেও নানারকম—ইষ্টি কুটুম, খোকা হোক, কৃষ্ণ গোকুলে ও বউ হলুদ তোলা—এ সবই হলদেপাখির ডাক। চমৎকার পাখি। মানুষের কাছাকাছি আসে বটে, কিন্তু মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলে। একবার দেখা পেলে মনে হয় নয়ন সার্থক হয়ে গেল। ওর একজন আত্মীয় আছে—তার নাম কাজল গৌরী। তার মাথাটা কালো নয়। অনেক বড় গাছের উঁচুতে ডিম পাড়ে ওরা। ডিম দেখিনি কখনও।

দোয়েল পাখিও লাজুক পাখি। কাক শালিকের মতো যেখানে সেখানে দেখতে পাবেন না ওকে। বসন্তকালে বা গ্রীষ্মকালে দেখতে পাবেন কোন উঁচু জায়গায় বসে ও গানের রেওয়াজ করছে। সত্যিই ওস্তাদের মতো গানের রেওয়াজ করে দোয়েল পাখি। আর প্রায় প্রতিদিনই নূতন ধরনের সুর আলাপ করে। পুরুষ পাখিরাই গান গায়। মেয়ে দোয়েল নীরব। পুরুষ দোয়েল সাদায় কালোয় চিত্রিত ছোট পাখি। শালিকের চেয়ে ছোট। চড়াই পাখির চেয়ে বড়। ল্যাজটি পিঠের উপর বার বার উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। সাধারণত ঝোপঝাপের ধারে আত্মগোপন করে থাকে। গান গাইবার সময় উঁচু জায়গায় গিয়ে ওঠে। মেয়ে দোয়েলটি অত মিশমিশে কালো নয়, শ্লেটের মতো রং। ভারি স্নিগ্ধ দেখতে। ওকে দেখলে মনে হয় ওর মুখভাবে যেন একটা চতুরতাও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

শ্রাইক পাখির কথা আগে বলেছি। এর বাংলা নামকরণ করেছি: 'কাজল পাখি'। কারণ এদের চোখের তলায় কালো কাজলের রেখার মতো কালো রং থাকে। কাজল পাখি নানারকম আছে। কিন্তু সাধারণত যেটা বেশি দেখা যায়—এমন কি শহরের ভিড়ের মধ্যেও যাদের দেখেছি তার হিন্দী নাম টেটা। মাথাটা ছাই ছাই রঙের, পিঠটা বাদামী, বুক-পেটা সাদা। ছোট্ট পাখি। সাত আট ইঞ্চির বেশী নয়। ছোট্ট ঠোঁটটি বঁড়শীর মতো। ল্যাজটি বেশ বাহারের। সাদা-কালো-বাদামী তিনটি রংই অংশ নিয়েছে তাতে। এরাও উঁচু জায়গায় বসে থাকে এবং মাটিতে পোকামাকড় দেখলে ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে গিয়ে আবার

স্বস্থানে বসে। বসবার ভঙ্গিটিও অপরূপ। ঘাড়টি ঈষৎ বেঁকিয়ে বসে—ল্যেজটি ধীরে ধীরে দোলায়। এরা গায়ক নয়। একটা তীক্ষ্ণ সরু আওয়াজ ক'রে মাঝে মাঝে। শহর থেকে বাইরে গেলে বড় জাতের কাজল পাখি ক্যারকাটার দেখা পাবেন। এরা একটু বড়—প্রায় দশ এগারো ইঞ্চি। গায়ে ছাই ছাই রং। চোখের কাজলটি খুব স্পষ্ট। ডানার পাড়েও কালো রং। এদের গলার স্বর মিষ্ট নয়, বেশ কর্কশ।

মাঠের দিকে যদি যান—যেখানে গরুমহিষ চরে—তাহলে সেখানে গরু মহিষদের সঙ্গে বককেও দেখতে পাবেন। এদের নাম গাই বক। হলদে ঠোঁট, রং ধবধবে সাদা। এরা গরু মহিষের পিছু পিছু ঘোরে। গরু মহিষরা যখন ঘাস ছিঁড়ে খায় বা ঘাসের উপর চলে তখন ঘাসের ভিতর থেকে নানারকম কীটপতঙ্গ লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। বকেরা সেগুলি ধরে ধরে খায়। আপনার ভাগ্য যদি ভাল হয় তাহলে আপনি মাঠে 'হাড়গিলে'র দেখা পেয়ে যেতে পারেন। হাড়গিলে আমাদের দেশে সারস পাখিদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। লম্বা লম্বা লালচে পা, পিঠের ডানাটি কালোয় সাদায়, বুকটি সাদা, প্রকাণ্ড হলদে চোখ, চোখ ছুটি মনে হয় চশমার মতো, মাথায় মনে হয় চুল নেই আর সবচেয়ে যেটা অদ্ভূত গলা থেকে প্রায় দশ বারো ইঞ্চি লম্বা একটা থলি ঝুলছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। শকুনের মতো এরাও পচা মরা জিনিস খায়। এই লম্বা থলিটি প্রকৃতি কেন ওদের দিয়েছেন, বোঝা যায় না। হয়তো ওটা ওদের অলঙ্কার। বিজ্ঞানীরা নাকি নাকের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আবিষ্কার করেছেন। মাঠে আরও কয়েক রকম পাখি সাধারণত দেখা যায়। মুনিয়া পাখির দল হঠাৎ হয়ত উড়ে এসে বসবে দূরে। কিন্তু শীতকালে যদি মাঠে যান খঞ্জন পাখি দেখতে পাবেন। খঞ্জন নানারকম আসে শীতকালে। সাদা-মাথা, কালো-বুক, হলদে নানা রকম খঞ্জন এদেশে আসে বিদেশ থেকে। সাদার সঙ্গে ছাই ছাই রং মেশানো এক রকম দেশী খঞ্জন এদেশেই থাকে। চমৎকার পাখি। ল্যাজ তুলিয়ে তুলিয়ে খুর খুর করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে লাফিয়ে ওঠে। মুনিয়ারাও চমৎকার দেখতে। মুনিয়া

অনেকে পোষে। দু'তিন জাতের মুনিয়া আছে। তারা চমৎকার শিস্ দেয়। মাঠে আর একরকম পাখি দেখেছি আমি বিহারে। বেড়াতে বেড়াতে মনে হল সামনের খানিকটা ধুলো যেন পাখি হয়ে উড়ে গেল। ওরা চড়াই পাখির চেয়েও ছোট পাখি। পিঠের রং ধূসর, বুকের কাছটা কালো। ওর নাম জগদানন্দ রায় দিয়েছেন ধুলা-চট্। মাঠে আরও একরকম চমৎকার পাখি দেখা যায়। তার নাম বাঁশ-পাতি। এরা সাধারণত উড়ে উড়ে বেড়ায়। সবুজ রং। ল্যাজের মাঝখান থেকে সরু একটি পালক বেরিয়ে এসেছে। ট্রি ট্রি করে ডাকে। দল বেঁধে উড়ে বেড়ায়। মাঠে আর এক রকম ছোট পাখিকে উড়তে দেখা যায়—কাছেপিঠে যদি তাল গাছ থাকে তাহলে তো নিশ্চয়ই পাবেন—সে পাখির নাম হচ্ছে তালচোঁচ। এরা তালগাছেই থাকে, সেখানেই বাসা বানায়। এদের একটা জাত পুরোনো বাড়িতেও নিজেদের আস্তানা করে। এদের রং কালচে, ল্যাজ দ্বিধা-বিভক্ত, ডানাগুলি সরু, অনেকটা ছুরির ফলার মতো। সর্বদা উড়ে উড়ে বেড়ায়। এদের ভালো করে দেখবার সুযোগ বড় একটা পাওয়া যায় না। দূরবীন দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হয়। বাঁশপাতিকেও কাছাকাছি দেখা শক্ত। দূরবীন না হলে দেখা যায় না। যদি কখনও দেখবার সুযোগ পান দেখবেন কি চমৎকারই না দেখতে। সবুজ নীল হলদে কালো লাল সব রকম রং-ই আছে ওর গায়ে। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। সুন্দর দেখতে। ওরা সাধারণত উড়ন্ত ফড়িং ধরে খায়। ইংরেজি নাম—BEE EATER—তাই মনে হয় পিঁপড়েও খায় ওরা। ওরা বাসা করে দল বেঁধে। মাটিতে ইঁদুরের মতো গর্ত করে তার ভিতর ডিম পাড়ে ওরা। আর একরকম বাঁশপাতি আছে। তারা আকারে একটু বড়। চেহারা প্রায় একরকম। অনেকখানি জুড়ে একটা কলোনি সৃষ্টি করে। বকরাও দল বেঁধে বাসা করে। বিরাট একটা সমাজ গড়ে ফেলে সেখানে। ইংরেজিতে একে বলে Heroury। বকেরাই কেবল ডিম পাড়ে না সেখানে সারস, পানকৌড়িও এসে ডিম পাড়ে। বিরাট একটা কলোনী গড়ে ওঠে একটা নয়, অনেকগুলো। মাঠে বেরুলে আরও কয়েক রকম পাখি

চোখে পড়ে। নীলকণ্ঠ, হুপো, টিয়ার ঝাঁক, শকুনি, গৃধিনী। টিয়ার ঝাঁক দল বেঁধে টিয়া টিয়া শব্দ করতে করতে উড়ে যায়। এদের তো আপনারা চেনেন। এদের জ্ঞাতিগুষ্টি অনেক আছে। তার পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধ বড় হয়ে যাবে। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন টিয়া গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে বাসা করে। টিয়ার ডিম ধপধপে সাদা। নীলকণ্ঠকে গ্রামের ভিতর বা শহরের ভিতরও দেখা যায়, কিন্তু মাঠেই ওদের প্রধান বিহারস্থল। নীলকণ্ঠ পাখির কণ্ঠ নীল নয়। পেটটি নীল। কণ্ঠ আর বুক ধূসর বাদামী রঙে ঢাকা। মাথায় নীল টুপি আছে। ডানা এবং ল্যাজেও নীল আছে। কিন্তু নীলের বাহার দেখা যায় ও যখন ওড়ে। এদের প্রায় একলাই দেখা যায়। বড় জোর দুটি একসঙ্গে থাকে। নীলকণ্ঠের ঝাঁক কখনও দেখিনি। ওরা পোকা-মাকড় ফড়িং খায়। একটু উঁচু জায়গা দেখেই বসে ওরা। কম ডাকে। যখন ডাকে তখন বোঝা যায় কণ্ঠটি কর্কশ। এরাও গাছের গুঁড়ির ভিতর ডিম পাড়ে। সাদা ডিম। হুপোও অতি চমৎকার পাখি। এরা গ্রামের ভিতরও ঘোরাফেরা করে। তবে নির্জন স্থান এদের পছন্দ। এরা প্রায় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এদের রংটি বাদামী—বুক, মাথা, পিঠের খানিকটা বাদামী রঙেরই। কিন্তু এদের পিঠের ডানা দুটি জেব্রার গায়ের মতো ডোরা কাটা কাটা। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে এর মাথার ঝুঁটিটি - ঠিক যেন ছোট্ট একটি জাপানী পাখা। ফরফর করে খুলে যায় যখনই একটু উত্তেজিত হয়। ওদের ঠোঁটও খুব মজবুত। ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁড়ে ওরা পোকা বার করে আর সেই পোকা খায়। বেশ জোরে জোরে হাঁটে। একটু হাঁটে আর মাটি খোঁড়ে। ওদের ডাক বড় একটা শোনা যায় না। ডাক অনুসারেই ওদের নাম—ওদের ডাকও হু—পো, কখনও বা হুপো—পো—। হিন্দীতে এ পাখির নাম হুদ হুদ। এদের ডিম দেখিনি। এরাও শুনেছি গর্তের মধ্যে বাসা বানায়। কোনও বাড়ির দেওয়ালের গর্তে, বা গাছের কোটরে। সেখানে খড় কুটা, উল, চুল, ন্যাকড়া যা পায় জমা করে বাসা বানায়। তার উপর ডিম পাড়ে।

শকুনিকেও মাঠে দেখতে পাবেন, যদি সেখানে কোন মৃত জন্তু

থাকে। শকুনিদের তো চেনেন। ওদের বিশেষ পরিচয় দেবার দরকার নেই। ওদের মধ্যে বামুন শকুনি বলে একরকম শকুনি দেখতে পাওয়া যায়। তাদের লাল গলা, লাল পা। শকুনি সমাজে এরা মাননীয় ব্যক্তি। আমি দেখেছি যখন কোন মড়া বামুন শকুনি খাচ্ছে তখন অন্য কোন শকুনি তার কাছে যায় না। সে পেট ভরে খেয়ে যখন সরে আসে, তখন অন্য শকুনি খায়। শকুনিদের আর একটা বৈশিষ্ট্য দেখেছি তাদের বাসা নির্মাণের ব্যাপারে। তারা সাধারণত তালগাছে বা উঁচু ঘাসের মতো গাছে বাসা বানায়। অনেক সময় দেখেছি একসঙ্গে তিন চারটে বাসা বানায়, তারপর যে বাসাটা পছন্দ হয় সেখানে ডিম পাড়ে। শকুনি একটি মাত্র সাদা ডিম পাড়ে। শকুনি কয়েক রকমের আছে তার বিবরণ আর দিলাম না। শকুনির আর এক আত্মীয় আছে— গৃধিনী। এদের চেহারা সুন্দর। শরীরের বেশির ভাগই সাদা, মুখের দিকটা, ঘাড়ের দিকটা হলদে। ডানার নীচের দিকটা কালো। এরা পোষ মানে। পক্ষীতীর্থে এই গৃধিনীই এসে রোজ খাবার খেয়ে যায়। এরা সাধারণত উঁচু বাড়ির কার্নিসে বাসা বানায়। উঁচু গাছেও ওদের বাসা দেখেছি। শকুনির বাসার মতোই। কোনও কারুকার্য বা নৈপুণ্য নেই। এদের ডিম কিন্তু চমৎকার দেখতে। ইটের মতো লাল রং, তার ওপর চমৎকার ফুট ফুট। মাঠে সন্ধ্যার সময় যদি বেড়ান আর একটা জিনিস দেখতে পাবেন। বাদুড়রা উড়ে যাচ্ছে। প্যাঁচার ডাকও শুনতে পাবেন। প্যাঁচার দেখা পাওয়া কিন্তু সহজ নয়।

এবার চলুন কোন বড় বড় গাছওয়ালা বাগানের ভিতর যাওয়া যাক। যদি বসন্তকাল হয় কোকিলের ডাক শুনতে পারেন। কোকিলকে নিশ্চয় দেখেছেন। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখেছেন কি? পুরুষ কোকিলের গায়ের রং কালো তো বটেই কিন্তু তার উপরও একটা সবুজাভ নীলের আভাস আছে। ঠোঁটটি সবুজ, চোখ দুটি লাল, পা দুটি সীসের মতো রং। মেয়ে কোকিল কিন্তু কালো নয়, বাদামী গোছের আর তার উপর কালোর ফুট ফুট। মনে হয় যেন একটা জমকালো জংলি শাড়ি পরে আছে। কোকিলরা সাধারণত কাকের

বাসায় ডিম পাড়ে। অন্য পাখির বাসাতেও পাড়ে। এদেশে আরও তিনরকম কোকিল জাতের পাখি আছে। চোখ গেল, চাতক বা পাপিয়া এবং বউ কথা কও। চোখ গেল পাখির ডাক বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় নিশ্চয় শুনেছেন। ওরা যখন ডাকতে শুরু করে তখন সুরের একটা ফোয়ারা ছুঁড়ে দেয় যেন আকাশে। তারপর অবিশ্রান্ত ডেকে চলে—চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল। এর ডাক অনেকেই শুনেছেন, পাখিটিকে কিন্তু অনেকেই দেখেন নি। ডালপালার আড়ালে প্রায়ই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। দেখতে অনেকটা বাজপাখির মতো। তাই ওর ইংরেজী নাম Hawk-cuckoo। পিঠটা কালচে ছাই-ছাই রঙের। বুক পেট সাদা, আর তার উপর বাদামী রঙের ডোরা কাটা। ল্যাজেও ডোরা আছে। শীতকালে এরা প্রায় নীরব থাকে। এরা প্রায় ছাতারে পাখির বাসায় ডিম পাড়ে গ্রীষ্মকালে। এদের ডিম শুনেছি ঘন নীল রঙের। ছাতারে পাখির ডিমও নীল। ছাতারে পাখিরাও সাধারণত বাগানে, জঙ্গলে বা ঝোপে থাকে। পাড়াগাঁয়ে পুকুরের ধারে গাছতলায় বা বাড়ির পাশেও ওদের দেখেছি। গায়ের রং মেটে মেটে, পেটের কাছটা সাদা। ঠোঁট চোখ দুই-ই হলদে রঙের। ওরা ক্বচিৎ একা থাকে। ছ'সাতটা পাখি মিলে একসঙ্গে থাকে, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আর কচবচ করে। হিন্দীতে তাই ওর নাম 'কাচবাচিয়া'। ওদের নিজেদের মধ্যে ভাব খুব। ঝগড়াঝাঁটিও করে। কিন্তু কোনও বহিঃশত্রু এলে সবাই রুখে দাঁড়ায়। ওদের আর একটা নাম সাতভাই। এদের ডিমের রং নীল। এদের বাসাতেই চোখ গেল পাখিও নীল ডিম পাড়ে। পাপিয়ারাও পাড়ে। তাদের ডিমও নীল। পাপিয়ার আর একটা নাম চাতক এদের বৈশিষ্ট্য এদের মাথায় ঝুঁটি আছে, চেহারাটি সাদায় কালোয়। পিঠ-মাথা কালো, বুক-পেট সাদা। কালো লেজে সাদার দাগ আছে, ল্যাজের ডগাটি একদম সাদা, ওড়বার সময় স্পষ্ট দেখা যায়। ওরা বসন্তের পাখি নয়, বর্ষার পাখি। আষাঢ়-শ্রাবণে এদের ডাক শোনা যায়। এরা শুনেছি এদেশে থাকে না। আফ্রিকা বা সিংহল থেকে এদেশে আসে।

এদেশে ছাতারের বাসায় ডিম পেড়ে আবার উড়ে চলে যায় বর্ষার শেষে। ওদের ডাক অতি সুন্দর। ডাকটা পি—পি—পিউ, পি—পি—পিউ। কিন্তু মনে হয় ডাকের সঙ্গে অতি মৃদু টুনটুন্ করে একটা ঘণ্টাও যেন বাজছে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে না। উড়তে উড়তেই ডাকে অনেক সময়। তৃতীয় যে কোকিলটির কথা বলেছি—সেটির নাম 'বউ কথা কও'। এরাও বিদেশী পাখি। বর্ষার সময় এদেশে আসে। এদেরও ওড়ার ধরন অনেকটা বাজপাখির মতো। পিঠের উপরটা কালচে, পেট বুক সাদা, তাতে ডোরা ডোরা দাগ। এরা প্রায় গাছের অনেক উঁচু ডালে বসে থাকে। সহজে এদের দেখা যায় না। অনেক চেষ্টা করে দেখতে হয় বাইনাকুলার সহযোগে। এরা প্রায় সন্ধ্যার দিকে বা নিস্তব্ধ দুপুরে ডাকে। এরা বউ কথা কও—ডাকটির 'কথা' শব্দটির উপর জোর দেয়। কোকিল জাতের আরও কয়েক রকম পাখি আছে, কিন্তু তারা এদেশে প্রায় আসে না। বাগানে গিয়ে আরও কয়েক রকম পাখির দেখা পেতে পারেন। প্রথমে কুকোর কথা বলি। কুকোকে অনেকে বন-কাকও বলে। কালো আর বাদামী রঙের চমৎকার পাখিটি। প্রায় হেঁটে হেঁটে বেড়ায়। হাঁটা দেখে মনে হয় বুঝি হাঁটুতে বাত হয়েছে। চালচলনে বেশ একটা আভিজাত্য আছে কিন্তু। মাথাটি কালো, বুক আর ল্যাজও কালো, ডানাটি বাদামী। কালো লেজটি বেশ লম্বা। পাখিটা সবশুদ্ধ প্রায় দেড় ফুট লম্বা। ডাকটা অদ্ভুত—গুপ্ গুপ্ গুপ্ গুপ্। হঠাৎ ডেকে ওঠে। প্রায় ১৫।২০ টা গুপ্ গুপ্ শোনা যায়, মাঝে মাঝে বিরাম থাকে অবশ্য। এরা কোকিল জাতের। কিন্তু পরের বাসায় ডিম পাড়ে না। নিজেরাই প্রকাণ্ড গোলাকৃতি বাসা বানায় লতা-পাতা দিয়ে। বাসায় ঢোকবার দরজাটা থাকে পাশের দিকে। এদের ডিমের রং সাদা। বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা সুদীর্ঘ একটা কর্কশ চীৎকার শুনে হয়তো আপনি চমকে উঠবেন। মনে হবে কেউ বুঝি ধমকে উঠল। পরক্ষণেই হয়তো দেখতে পাবেন কাঠঠোকরা পাখিটি উড়ে যাচ্ছে, কিম্বা কোন গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে এবং ঠক ঠক করে গুঁড়িটাকে ঠোকরাচ্ছে। দেখতেও চমৎকার।

এর নাম সোনা-পিঠ লালঝুঁটি কাঠঠোকরা। দেখতে যেন রাজপুত্রের মতো। মাথায় লাল ঝুঁটি, পিঠে সোনার রং, তার সঙ্গে কালোও মিশেছে ঘাড়ের দিকে। গলার নীচটি কালো এবং ফুট ফুট, বুকটি সাদা তাতে ডোরাকাটা। লম্বা প্রায় দশ এগারো ইঞ্চি। এদের আর একটি জাতিকেও দেখতে পাওয়া যায়। এদের ইংরেজি নাম Marhatta Wood Pecker—হিন্দীতে বলে চকরবৎ। অর্থাৎ চকরাবকরা। এর পিঠ সোনালি নয়, বাদামী কালো তার উপর সাদায় ফুট ফুট। ঝুঁটি লাল নয়, বাদামী-হলদে। পেটটি সাদা। পেটে নীচের দিকে একটু লালের ছোঁয়াচ আছে। এরও ডাক বেশ কর্কশ। ক্লিক্ ক্লিক্—কিররর গোছের। এরা সাধারণত গাছের গুঁড়ি থেকে পোকা বার করে খায়। এরা গাছের ডালে গর্ত করে তার ভিতর সাদা ডিম পাড়ে। কাঠঠোকরা একটি চমৎকার পাখি। বাগানে হলদে পাখি, বুলবুল, দোয়েলের দেখাও পেতে পারেন। আর পাবেন দাঁড়কাককে। সাধারণ কাকের চেয়ে একটু বড়—রং কুচকুচে কালো। ডাক কা-কা নয়। খা—খা। এরা যদিও শহরে বা গ্রামে যায় কিন্তু বাগানে থাকতেই বেশি ভালবাসে। এর ইংরেজি নাম Jungle Crow। এরা অনেক সময় শকুনিদের দলে ভিড়ে তাড়া খায়। এদের বাসা সাধারণ কাকেরই মতো, ডিমও প্রায় এক ধরনের, মানে সাদা। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আর এক জাতীয় পাখি দেখতে পাবেন—যারা গাছের মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। এরা কখনও মাটিতে নামে না। এদের হিন্দী নাম ফুৎকি। এরা পাখিদের মধ্যে বোধহয় ক্ষুদ্রতম। এই বাগানেই আরও কয়েকটি ছোট পাখির দেখা পেতে পারেন—টুনটুনি, দরজি, মুনিয়া, ফটিকজল, শ্বেতাক্ষী (White eye), চোরপাখি। আর শীতকালে যদি যান আলতাপরীকেও (Minivet) দেখতে পেতে পারেন। ভাগ্য ভালো থাকলে বাবুই পাখিকেও। এই ছোট প্রবন্ধে এদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাবে না। একটু আধটু পরিচয় দিচ্ছি। সাধারণত দু'রকম টুনটুনি দেখি আমরা। দুর্গা টুনটুনি (Purple Sunbird) আর বাহারে টুনটুনি (Purple Rumped Sunbird)। এদের মধুচুষকি বা মৌচাষাও বলে অনেকে।

কারণ এরা এদের সরু বাঁকানো লম্বা ঠোঁট ফুলের ভিতর ঢুকিয়ে মধু খায়। সাধারণত যে সব গাছ ফুলে ভরা সেইখানেই এদের ভিড়। দুর্গা টুনটুনি সাধারণত দেখতে হালকা কালচে বাদামী রঙের পেটের দিকটা ফিকে হলদে গোছের। বুকের মাঝখানে একটা কালো রেখা। কিন্তু প্রজনন কালে পুরুষ দুর্গা টুনটুনির রং বদলে যায়। তখন সর্বাঙ্গ কালো। ডানার রং ছাতার মতো কালো। গলা আর পিঠে কালচে নীল। ডানার উপরে একটু লালের পোঁচ। মেয়ে টুনটুনি আর একটু বেশি সুন্দর হয়—তবে রং বিশেষ বদলায় না। গাছের ডালে এদের ছোট্ট দোলনার মতো বাসাটি চমৎকার দেখতে। এদের ডিমের রং পাঁশুটে আর সবুজ মেশানো। তার সঙ্গে একটু বাদামীরও আভা থাকে। এদের পুরুষরাই সাধারণত ডাকে। টী হুইট—টী হুইট—টী হুইট। মেয়েরা প্রায়ই নীরব। পুরুষ বাহারে টুনটুনির গায়ে অনেক রং। মনে হয় নানা রঙের রাংতা দিয়ে তৈরি হয়েছে পাখিটি। মাথার উপরটি নীল। বুকের খানিকটা আর পিঠের খানিকটা বেগুনী লাল, লেজটি কালো ডানা বাদামী রঙের কিন্তু তাতে লাল-নীল পাড় আছে। মাথার দুপাশ তাম্রবর্ণ। পেটটি হলদে। সারা বছরটা এই সাজে সেজে থাকে বাহারে টুনটুনি। মেয়ে পাখিটি কিন্তু এত সুন্দর নয়—পাঁশুটে আর বাদামী রংই বেশি। ল্যাজটি কালো। ঠোঁট কালো আর বাঁকা দুজনেরই। চোখ লাল। এদের বাসা আর ডিম প্রায় দুর্গা টুনটুনির মতোই।

দরজি পাখি খুব ছোট পাখি। এত ছটফটে যে এদের দেখা পাওয়া বেশ শক্ত। দুরবীন দিয়েও 'ফোকাস' করা যায় না। ছোট্ট বাদামী রঙের পাখি—চার পাঁচ ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। এর পিঠটির রং সবুজ বাদামীতে মেশানো (Olive green), বুকটি সাদা। মাথাটিতে কালচে লালের ছোপ। লেজটিও কালচে গোছের। কিন্তু সর্বদা উৎক্ষিপ্ত। একে দেখতে পাওয়া যদিও সহজ নয় কিন্তু এর ডাক শুনতে পাবেন সহজেই। অনেক রকম ডাক এর। বেশ জোরে জোরে ডাকে। টুইট টুইট টুইট। চিপ্ চিপ্ চিপ্। কিম্বা প্রেটি প্রেটি প্রেটি। চক্ চক্ চক্—ডাকও শুনেছি।

এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা গাছের চওড়া পাতা শেলাই করে বাসা বানায়। তাই এদের নাম দর্জি পাখি—ইংরেজিতে Tailor Bird। এরা আমাদের বাড়ির আশেপাশেই অনেক সময় ঝোপঝাড়ে বাসা বাঁধে, মাটির খুব কাছেই। কিন্তু খুব লুকিয়ে বাঁধে। এরা সম্ভবতই একটু গোপনচারী। এদের ডিম লালচে বা নীলচে রঙের হয়, গায়ে ফুটফুট থাকে বাদামী রঙের।

ইংরাজীতে আর একটি পাখির নাম—Weaver Bird। কিন্তু তাকে আমরা 'তাঁতি পাখি' বলি না। বাবুই পাখি বলি। বাবুই পাখি দেখতে অনেকটা চড়াই পাখির মতো। কিন্তু প্রজনন সময়ে—গ্রীষ্মকালে—পুরুষ পাখিটি বরবেশ ধারণ করে। মাথার দুপাশ, চিবুক গলা কালো রঙে ঢেকে যায়। মনে হয় মুখোস পরে আছে। মাথার উপরটি এবং বুকেরও খানিকটা উজ্জ্বল হলুদ রঙ। ডানা বাদামী রঙের কিন্তু ডানাতে সাদা ডোরা, হলুদ রঙের পাড়। এরা প্রায় দল বেঁধে থাকে। বাবুই পাখির বাসা একটা দেখবার মতো জিনিস। বাবলা গাছে বা তালগাছে এরা দল বেঁধে বাসা বানায়। বাসাটি ঘাস দিয়ে বোনা। তাতে বসবার বারান্দা পর্যন্ত থাকে। বাসাগুলো যেন ওলটানো বোতল। একগাছে অনেক বাসা দেখতে পাওয়া যায়। শুনেছি পুরুষ-পাখিরা আগে থাকতে বাসা বানিয়ে রাখে, তারপর মেয়ে পাখিরা এসে সে বাসাগুলো পরিদর্শন করেন, যে বাসাটা পছন্দ হয় সেই বাসার নির্মাতাকে প্রণয়ীরূপে বরণ করেন তিনি। বাবুই পাখি কয়েক জাতের আছে—তাদের বর্ণনা আর দেব না। বাবুই পাখির ডিমের রং সাদা।

মুনিয়া পাখিরাও দল বেঁধে থাকে। কয়েক রকম মুনিয়া দেখা যায় সাধারণত। বাদামী, কালো, সবুজ, লাল, সবারই গায়ে ফুটফুট——নানাজাতের নানারকম বৈশিষ্ট্য আছে। এরা দল বেঁধে একসঙ্গে মাটিতে চরে। ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। লাল মুনিয়া চমৎকার শিস্ দেয়। এরা সাধারণত মাঠেই থাকে। বড় বাগানেও দেখা যায়। এদের ডিম সাদা রঙের।

ভাগ্য যদি ভালো থাকে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ফটিক জল পাখির সুমিষ্ট ডাক শুনতে পাবেন। ফটি ই-ই-ই-ই ক—জ্—। ডাকটা অনেকটা এই ধরনের। ফটিকজল পাখি দেখতেও খুব সুন্দর। পুরুষ পাখিটির হলদে বুক, মাথা পিঠ কালো, ডানায় কালোর উপর সাদার ডোরা। ল্যাজের নীচে একটু সবুজেরও আভাস আছে, ঠোঁটের ধারেও হলদে রং আছে। মেয়ে পাখিটিও সুন্দরী। পিঠের উপর সবুজ, পেটে আর বুকে হলদে রঙ। ডানা সবুজ-বাদামী, তাতে কালো দাগও আছে। এরা সাধারণত বড় বড় গাছের উপরের দিকে থাকে। দূরবীন না থাকলে দেখা শক্ত। এদের বাসাও চমৎকার। ছোট একটি বাটির মতো। ডিম মাখনের মতো রঙ, কখনও সাদা-পাঁশুটে। ফটিক জল ছোট পাখি। প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আর একরকম পাখিও হঠাৎ চোখে পড়ে যেতে পারে। এরা ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়। বেশ ওড়ে না। এদের নাম চোর-পাখি। ইংরেজি নাম Nuthatch। সাধারণত যেটা দেখা যায় সেটার পিঠ ছাই ছাই রঙের, বুক পেট আরশোলা রঙের (Chestnut)। ডালে ডালে চোরের মতো ঘুরে বেড়ায় এবং গাছের ডাল থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা গাছের ডালের গর্তেই ডিম পাড়ে। সাদা ডিম, গায়ে লাল ফুটফুট। এরা মাটিতে কদাচিৎ নামে।

শীতকালে Minivet পাখী দেখতে পারেন। এরা শীতকালে হিমালয় থেকে নেমে আসে। আমি এর নাম দিয়েছি আলতাপরী। আর একটা বাংলা নাম আছে।—সাতসায়েলি। এরা প্রায় দল বেঁধে থাকে। বড় আলতাপরীর পুরুষগুলি—কালো আর টকটকে লালের অপূর্ব সমন্বয়। মাথাটি বুকের উপরটা ডানার ধারগুলি কুচকুচে কালো, শরীরের বাকি অংশ লাল। আর মেয়ে আলতাপরীর বুক পেট হলদে, পিঠ এবং ডানা পাঁশুটে। এদের ডাক শুনিনি। এরা হিমালয়ে ডিম পাড়ে। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আর একটি সাধারণ পাখির দেখা পেয়ে যেতে পারেন—হাঁড়িচাচা। প্রায় দেড় ফুট লম্বা পাখিটা।

মাথা ঘাড় গলা কালো। পেট এবং বুক বাদামী রঙের। ডানা বাদামী, কিন্তু তাতে সাদা খানিকটা এবং কালো খানিকটা আছে। লেজটি বেশ লম্বা এবং বাহারে, সাদা কালো এবং বাদামীর সংমিশ্রণ। লেজের ডগাটি কালো। সাধারণত—চ্যা—চ্যা—চ্যা—চ্যা করে ডাকে। তাই বোধ হয় এর নাম হাঁড়িচাঁচা। কিন্তু এর মিষ্টি ডাকও একটা আছে। কক্‌রিং, কক্‌রিং, কক্‌রিং। এরা শুধু পোকামাকড় ধরেই খায় না, অন্য পাখির বাসা থেকে ডিমও চুরি করে খায়। এরা সাধারণত গাছের উপর দিকে কাকের বাসার মতো বাসা বানায়। এদের ডিমের রং সাধারণত দুরকম—একরকম ফিকে সবুজ তার উপর বাদামী রঙের ফুটফুট। আর একরকম লালচে সাদা তার উপর ফুটফুট।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে বাগানে হরবোলা পাখিরও দেখা পেতে পারেন। চমৎকার দেখতে পাখিটি। প্রায় ছ সাত ইঞ্চি লম্বা। সবুজ রং—গলার নীচে চোখের নীচে কালো রং, তার ভিতরে আবার একটা নীলচে বেগুনী রঙের রেখা আছে, অনেকটা গোঁফের মতো। ডানাতেও ঘন-নীলের একটা ছোপ আছে। এদের দেখা পাওয়া সহজ নয়। আমবাগানে দেখেছি এদের। এদের ডাক সুমিষ্ট এবং অবর্ণনীয়। এরা নানারকম ডাক ডাকে। অনেক রকম পাখির ডাক নকল করতে পারে। ডিম সাদা।

আরও দু'রকম পাখি বাগানে সাধারণত দেখা যায় বসন্তবৌরি আর স্যাকরা পাখি। বসন্তবৌরির ইংরেজি নাম—Green Burbet। পাখিটার ডানার উপরটি সবুজ, মাথা গলা এবং বুকের খানিকটাও বাদামী রঙের। তার ভিতর সাদার ডোরা। ল্যাজটিও সবুজ। প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা। কুটুর-কুটুর-কুটুর এদের ডাক। গলার স্বরটি বেশ চড়া। বাগানকে মুখরিত করে দেয়। শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে এদের কণ্ঠস্বর প্রায়ই শোনা যায়। এদের ঠোঁট বেশ মজবুত এবং বোধহয় বাদামী রঙের। চোখের চারপাশে সাদা দাগ আছে, মনে হয় চশমা পরে আছে। গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে তার ভিতর ডিম পাড়ে। ডিমগুলি সাদা। এরা সাধারণত অনেক উঁচুতে বাসা বানায়।

স্যাকরা পাখিও একজাতের Burbet, হিন্দীতে এর নাম ছোটা বসন্ত। বাংলায় এর স্যাকরা পাখি নাম ছাড়াও আরও অনেক নাম আছে। ব্যায়লাবুড়ী, ভগীরথ, জোকারে পাখি—সব একই নাম। ছোট্ট পাখিটি, দেখতে চমৎকার। এদের ডাকও অদ্ভুত—টং টং টং—এক নাগাড়ে ডেকেই চলে। এই জন্যেই বাংলায় এর নাম স্যাকরা পাখি আর ইংরেজিতে Coppersmith। এদের দেখা পাওয়া শক্ত। গাছের উঁচু ডালে পাতার আড়ালে বসে থাকে। দেখতে পেলে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। পাখিটি সবুজ, পেটের দিকে সবুজের সঙ্গে একটু সাদাটে রং মিলেছে। মাথার উপরে একটু লাল রঙের টুপি, বুকের উপর লাল রঙের একটি হাঁসুলি। হাঁসুলির উপরে ও নীচে হলুদ রং, চোখের চারপাশেও হলুদ রং। হলুদের নীচে ঠোঁটের কাছ থেকে একটি কালো রেখা ঘাড় পর্যন্ত। ল্যাজটি ছোট, নীল রঙের। এরাও গাছের ডালে গর্ত করে ডিম পাড়ে। লম্বাটে ছোট ডিম, সাদা রঙের।

এইবার বাগান থেকে চলুন নদীর ধারে যাওয়া যাক। সেখানে বক দেখতে পাবেন। মাঠেও বক দেখেছেন, কিন্তু এ বকগুলির ঠোঁট কালো, হলদে নয়। আর এদের প্রজনন-সময়ে যদি দেখা পান—মাথার উপর থেকে দুটি লম্বা সাদা পালকের মতো নেমে এসেছে ঘাড়ের দিকে। পিঠের এবং বুকের পালকগুলিও বেশ বড় বড় এবং ফাঁপানো। এদের পাগুলিও কালো। এরা প্রায় দল বেঁধে থাকে। প্রায় তিন চারটি বককে কাছাকাছি দেখতে পাবেন। এরা বকের কলোনীতে (Heronry) গিয়ে ডিম পাড়ে। ডিমের রং সবুজাভ নীল।

আর একরকম বকও দেখতে পাবেন নদীর ধারে। এরাও পুকুরের ধারেও থাকে, ধানের ক্ষেতেও থাকে। এদের নাম কোঁচ বক্। ইংরেজি নাম Pond Heron বা Paddy Bird। এর সংস্কৃত নাম ক্রৌঞ্চ। পাখিটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এর গায়ের রং এমন যে এরা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে পারে এরা যে বসে আছে তা অনেক সময় চোখেই পড়ে না। এদের মাথা আর ঘাড়ের রং গাঢ় বাদামী রঙের, তার উপর পীতাভ রঙের ডোরা আছে। থুতনি এবং

গলার রং সাদা, কাঁধের পিছনদিকটা ছাই-ছাই আর বাদামী। শরীরের বাকি অংশটা সাদা। কিন্তু যখন ঘাপটি মেরে বসে থাকে সাদা রংটা দেখা যায় না। উড়লে বোঝা যায়। গলাটিও বেশ লম্বা, কিন্তু যখন বসে থাকে, তখন গলাটি গুটিয়ে বসে থাকে, দেখা যায় না। যখন শিকারের উপর ছোঁ মারে তখন বোঝা যায়। বক-কলোনিতে এরাও ডিম পাড়ে। ডিমের রং সবুজাভ নীল।

নদীর ধারে গিয়ে গাং চিলকে দেখতে পাবেন। নদীর উপর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এদের ইংরেজি নাম Teru। চমৎকার ছিপছিপে পাখিটি। সাদা আর ছাই ছাই রঙ গায়ে। ল্যাজটি ফিঙে পাখির ল্যাজের মতো দ্বিধাবিভক্ত। মাথার উপর কালো টুপি। পা দুটি লাল, ঠোঁট হলদে। এদের আর এক জাতির পেটের নীচেও কালো রঙ থাকে। আরও দু'তিন রকমের গাং চিল দেখা যায় এদেশে। তাদের বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না। এরা বালির চরে গিয়ে দল বেঁধে ডিম পাড়ে। চরের উপরেই পাড়ে। বাসা বা গর্ত করে না। সবুজাভ ছাই ছাই বাদামী রঙের ডিম, তার উপর কালো এবং বাদামী ফুটফুট। এরা মাছ ধরে খায়।

নদীর ধারে টিটিভ পাখির দেখা পেতে পারেন। এদের ইংরেজি নাম Lupwing। দুজাতের আছে, লাল ঝুঁটি আর হলদে ঝুঁটি। লাল-ঝুঁটিই বেশি দেখা যায়। এদের মাথা, ঘাড় আর বুকের উপরটা কালো। চোখের নীচে থেকে দু'দিকে সাদা চওড়া পাড় কাঁধের পাশ দিয়ে এসে মিলেছে ঠোঁটের সাদার সঙ্গে। পিঠের উপর বাদামী রঙ, তার সঙ্গে ব্রোনজ এবং লালের আভা। ডানার ধারে একটি সাদা পাড় আছে। কিন্তু ওড়বার পালক অধিকাংশই কালো। পিছনের দিকটা সাদা। ল্যাজের পালকও সাদা। চোখের সামনে ঠোঁটের উপর টকটকে লাল ঝুঁটি। কারো কারো হলুদ রঙের থাকে। এদের ঠোঁট লাল, কিন্তু ঠোঁটের ডগাটি কালো। পা হলুদ রঙের। এদের ডাক—did he do it—বাংলায় টি টি টি টিট। এরাও মাটিতে ডিম পাড়ে। ডিমের রং সবুজ ধরনের—তার উপরে বাদামী ফুটফুট।

নদীর ধারে শীতকালে বাটানকেও দেখতে পাবেন। ছোট ছোট

পাখি। তিন চারটি একসঙ্গে থাকে। মাথাটি কালো। বুকের খানিকটাও কালো। কিন্তু তার উপর একটি সাদা হার আছে। পাখিটি ঘাড়ে গর্দানে গোছের। ঘাড় খুব ছোট। পিঠের উপরটি বাদামী রঙের। পিঁ পিঁ করে ডাকে। এরা এদেশে শীতের অতিথি।

শীতের সময় কাদাখোঁচাও অনেক আসে। দেখবেন নদীর ধারে ব্যস্তভাবে কাদা খুঁচিয়ে বেড়াচ্ছে। এদের কয়েক রকম জাত আছে। তাঁদের বিস্তৃত বর্ণনা দিলাম না। এদের লম্বা ঠোঁট, বাদামী রঙের উপর কালো ছিট দেওয়া ডানা। ঠোঁটের দিকটা সাদা। অনেক শিকারী এদের মেরে খায়। এদের একটা জাতের নাম 'চাহা'।

নদীর ধারে মাছরাঙাও দেখতে পাবেন। সাধারণত দু'জাতের দেখা যায়। একটা হচ্ছে—সাদায় কালোয় আর একটির সর্বাঙ্গে নানা রং কিন্তু বুকের মাঝখানটি সাদা। এদের ইংরেজি নাম—White brausted king fisher। সাদা-বুক মাছরাঙা গ্রামের ভিতর শহরের ভিতরও আসে। এদের ডাক একরকম কর্কশ, কির—কির—কির—কির। বেশ জোরে জোরে ডাকে। আর এক রকম বহু বর্ণাঢ্য ছোট মাছরাঙা আছে সেটিকে ক্বচিৎ দেখা যায়। সাদায় কালোয় মাছরাঙারা অনেক নদীর উপর উড়ে উড়ে বেড়ায়, তারপর হঠাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ ধরে। অনেক সময় এরা উঁচু জায়গায় স্থির হয়েও বসে থাকে। এরা নদীর ধারে কাদায় লম্বা গর্ত করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিমের রং সাদা। তিন রকম মাছরাঙার বাসা এবং ডিম এক রকম।

আমাদের চারদিকে সাধারণত যে সব পাখি দেখা যায় তাদের দিকে পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। যে পরিচয় দিলাম তা অসম্পূর্ণ। কারণ লিখে পাখির পরিচয় দেওয়া শক্ত। ওদের নিজের চোখে দেখে ওদের পরিচয় পেতে হবে। সে কৌতূহল যদি আপনাদের কারো মনে জাগে আর তাদের যদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন ওদের সম্পূর্ণ পরিচয় জানা কত শক্ত। আর এই শক্ত ব্যাপারে যদি আপনি লিপ্ত হন তাহলে বুঝতে পারবেন বাইনাকুলার নিয়ে ওদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ানোতে কত আনন্দ।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রধান অতিথির ভাষণ

সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ছাত্রছাত্রীগণ,

আপনাদের বাংলা সাহিত্য সমিতিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বক্তা নই, সেজন্য যা বলতে চাই তা লিখে এনেছি। আমার প্রথম বক্তব্য, যদিও সাহিত্য-সভা আজকাল সর্বত্র হচ্ছে তবুও মনে হয় বাংলা সাহিত্যকে কেউ তেমন ভালবাসে না। প্রকাশকেরা বলেন ভালো বই বিক্রি হয় না। সাহিত্যিকদের যারা ভালবাসে তারা তাদের বই কেনে, শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা নিবেদনের কোনও স্থায়ী মূল্য নেই।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য—সাহিত্য কোন শৌখীন ব্যসন নয়, সাহিত্য-চর্চা সাধনা, তার জন্যে নিষ্ঠা চাই, পরিশ্রম চাই, অধ্যবসায় চাই। বাঙালীদের সর্বপ্রধান কীর্তি তার সাহিত্য, যে সাধকদের সাধনায় এ কীর্তি সম্ভব হয়েছে। তাদের পরিচয় লাভ করবার জন্যে যে নিষ্ঠা পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন তা ছাত্রছাত্রীদের নিকটই আমি আশা করি।

আমার তৃতীয় এবং শেষ বক্তব্য—সাহিত্য, বিশেষ করে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য, শাশ্বতের বাণী বাহক। তা আমাদের মনকে সত্য শিব সুন্দরের দিকে আকর্ষণ করে। যে সাহিত্য তা করতে পারে না সে সাহিত্য উচ্চাঙ্গের নয়। সুতরাং মহাকালের বিচারে যে সব বই সম্মানিত, সেই সব বইই সর্বাগ্রে পাঠ্য। নমস্কার।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঁচাশীতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ*

সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঁচাশীতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে আপনাদের অভিবাদন করিয়া আমি শুধু এই নিবেদন করিতেছি যে এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বাঙালীর গৌরবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, আপনাদের শুভ ইচ্ছা এবং আন্তরিক সহযোগিতা ইহার উপর বর্ষিত হউক।

তাহার পর প্রণাম করিতেছি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। ছাত্রজীবন হইতে আমরণ তিনি পরিষদের সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বিগত চারি বৎসরের অধিককাল সর্বসম্মতিক্রমে পারষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি আজ নাই, কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি তাঁহার আশীর্বাদ আমাদের সতত রক্ষা করিবে।

রাজনীতি, ব্যবসায়, সমর-নৈপুণ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা—এসব কোনও ক্ষেত্রেই আজ বাঙালী অগ্রগণ্য নহেন। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালীর মহিমা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙালী-প্রতিভার এই মণিমাণিক্যগুলি রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সে প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে হয়তো সফল হয় নাই, তবু ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা বাঙালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালীর সাহিত্য, বাঙালীর শিল্প, বাঙালী প্রতিভাবান্ গুণীদের চিত্ররাজি সসম্মানে রক্ষা করিতেছে। এ পরিষদ্ আপনাদেরই কৃতী পূর্বপুরুষদের মহিমা-তীর্থ। আসুন, এই পরিষদ্‌কে আমরা প্রণাম করি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রথম বাংলা গদ্য-লেখক রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সে পুস্তকের বাংলা যদি পড়েন, অনেকেই বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন না। তাহার পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদীপ্ত প্রকাশ এবং তাহার পর পরই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সমারোহ বঙ্গ সাহিত্যকে পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে যে আভিজাত্য দান করিয়াছে তাহার তুলনা অন্য কোনও সাহিত্যে নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স প্রায় দেড়শত বৎসর—এই স্বল্প সময়েই সে পৃথিবীর সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে।

বহুকাল পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে সাহিত্য যতক্ষণ না ব্যবসায়ে পরিণত হইতেছে ততক্ষণ সাহিত্যের সম্যক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন দেখিতে পাইতেন ব্যবসায়ের কবলে পড়িয়া সাহিত্যের কি দুর্দশা হইয়াছে। যে দেশে অধিকাংশ লোকই সুশিক্ষিত সে দেশের পক্ষে তাঁহার উক্তি হয়তো সত্য, কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই মূর্খ, খুব কম লোকই সুসাহিত্যের আস্বাদন লইতে সক্ষম। তাই ব্যবসায়ীরা নিম্নমানের কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য ছাপাইতে ব্যস্ত। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজের মনকে উন্নত করা, সাহিত্যের আদর্শ সত্য-শিব-সুন্দরের রূপকে সৃষ্টির ব্যঞ্জনায় অপরূপ করিয়া পাঠক-পাঠিকাদের মনে নির্মল আনন্দ সঞ্চার করা—কিন্তু আমাদের সাহিত্য ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীদের কবলে পড়িয়া ক্রমশঃ আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের মনকে পশুত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা ক্ষোভের বিষয়। তবে আমি আশাবাদী আমার মনে হয় শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের এ দুর্দিন কাটিয়া যাইবে। যাঁহারা প্রকৃত সাহিত্য-রসিক তাঁহাদেরও এ বিষয়ে একটা দায়িত্ব আছে বলিয়া আমি মনে করি। প্রকৃত সাহিত্যিককে উৎসাহিত করিতে হইলে তাঁহাদের বই কিনিতে হইবে। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া বই কেনা সব সময়ে সুসাধ্য নহে। আমি তাহা জানি; তবু আমি তাঁহাদের অনুরোধ করিব মাঝে মাঝে, বৎসরে অন্তত একবারও কোনও

সংগ্রহ কিনিয়া প্রকৃত সাহিত্যসেবকদের আপনারা উৎসাহিত করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গত বৎসর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল কাজ করিয়াছেন এবং পরিষদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য প্রয়াস পাইতেছেন তাহার পরিচয় পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের বার্ষিক প্রতিবেদন হইতে আপনারা পাইবেন। আর্থিক অসচ্ছলতা ও নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও পরিষদের অগ্রগতি লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও জনসাধারণের সহায়তায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ উত্তরোত্তর শ্রীমণ্ডিত হইবে ইহাই আমাদের আশা। সাহিত্যিক ডক্টর শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার সহৃদয় সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইবে না, আশা করি।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্য ইত্যাদি বহু দুষ্প্রাপ্য উপকরণ বিভিন্ন স্থান হইতে পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরিষদের শরৎ-প্রদর্শনীটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সেই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন কুমার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে পুস্তকটি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ এবং নানা চিত্রে সুশোভিত। এরূপ আর দ্বিতীয় কোনও পুস্তক আমার চোখে পড়ে নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে শ্রীনিরঞ্জন সরকার রচিত 'জগদানন্দ রায়' পুস্তকখানি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকটি যদিও ছোট কিন্তু জগদানন্দ রায় সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ঐ পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

আর একটি অমূল্য পুস্তক 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বর্তমান বর্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। এই 'প্রস্তাব'টি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেডিক্যাল

কলেজ থিয়েটারে প্রথম পাঠ করিয়াছিলেন এবং পাঠের পর উহা মাত্র দুইশত কপি মুদ্রন করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন—এ পর্যন্ত ঐ সংস্করণের পুস্তক বহু গবেষকের অজ্ঞাত ছিল। পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বহু অনুসন্ধানে সংগ্রহ করিয়া ও বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় তাঁহার সংশোধিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের পাঠান্তরসহ সম্পাদনা করিয়াছেন। পরিষৎ প্রকাশিত এই বইটির আরও আকর্ষণ যে ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন ভাষাচার্য সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়—ইহাই তাঁহার রচিত সর্বশেষ গ্রন্থভূমিকা।

পরিশেষে এই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি যে আপনারা সকলে যদি ঐকান্তিকভাবে ইচ্ছা করেন আমাদের সমস্ত অভাবই দূর হইবে। এই ঐকান্তিক ইচ্ছার উৎস, আগ্রহ ও ভক্তি। নমস্কার।

এ নহে কাহিনী

"ইংরেজের আমলে আমরা এর চেয়ে ঢের বেশী সুখে ছিলাম। এখন আমাদের জীবন দুর্বহ। বাঁচবার জন্য যা যা দরকার তা এখন দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য এবং ভেজাল। খাবারে, ওষুধপত্রে, এমন কি শিক্ষাতেও ভেজাল। এর উপরি কর-ভারে আমরা প্রপীড়িত। শাসন-যন্ত্রের প্রায় সব বিভাগে মরচে ধরেছে। কোথাও চিঠি লিখে উত্তর পাওয়া যায় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন প্রকৃত ব্যবস্থা নেই। সর্বত্রই ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা, শুধু মৌখিক আস্ফালন বা মিথ্যা স্তোকবাক্য। চীন এসে আমাদের দেশের অনেকটা জায়গা অধিকার করে আছে এবং চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে আরও করবে, আমাদের দেশের অনেক বীরপুরুষ তাঁদের হাতে বন্দী হয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন, আমাদের আত্মসম্মান তো ভূলুন্ঠিত। এর জন্য মূলত দায়ী সরকারী অসতর্কতা এবং গাফিলতি। কিন্তু তার জন্যে শাস্তি ভোগ করছি আমরা জনসাধারণরা। ট্যাক্সের জোঁক আজ

আমাদের সর্বাঙ্গে। আমাদের স্ত্রী-ভগিনী-মা-বোনদের গা থেকে সোনা-দানা পর্যন্ত সরকার আইন করে কেড়ে নিচ্ছেন। অথচ শাসকদের বিলাস এতটুকু কমে নি। ইংরেজ রাজত্বে আমরা কি এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় ছিলাম ?"

সাধারণ লোকেরা এই ধরনের আলোচনা পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে প্রাসাদে কুটিরে সর্বত্র সর্বদাই করছে।

তাদের এ অভিযোগ সত্য জেনেও আর একদল লোক তার প্রতিবাদ করছেন, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, মহৎ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে।

এঁরা কবি, এঁরা সাহিত্যিক। তাঁরা বলছেন—"এখন আমাদের অনেক দুঃখকষ্ট আছে তা স্বীকার করছি, কিন্তু সব দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও এখন এমন একটা জিনিস আমাদের আছে যা ইংরেজের আমলে ছিল না। তার নাম স্বাধীনতা। চিন্তার স্বাধীনতা, যা ভালো বলে মনে করি তা অকুতোভয়ে ব্যক্ত করবার স্বাধীনতা, শিল্পীর স্বাধীনতা, সাহিত্যিকের স্বাধীনতা, গভর্নমেণ্টকে সমালোচনা করবার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই প্রত্যেক সভ্য মানুষের কাম্য, এ স্বাধীনতা না থাকলে জীবন বিস্বাদ, প্রাণ-প্রেরণাহীন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিরানন্দ। এই স্বাধীনতার জন্যই একদা শহীদরা দলে দলে হাসিমুখে কারাবারণ করেছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে উঠতেও ইতস্তত করেন নি। কিন্তু এ স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না, এর জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়। যে কষ্ট-স্বীকার তুমি করছ তাকে এই স্বাধীনতার মূল্য বলে মনে কর। তুমি স্বাধীন এই গর্বে তুমি মাথা উঁচু করে থাক। যদি কোথাও অন্যায় দেখ, তারস্বরে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে তার প্রতিবাদ কর। সে অধিকার তোমার আছে। সে অধিকার ভালোভাবে অর্জন করতে তোমাকে আরও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং তা হলেই তুমি আত্মার বলে বলীয়ান হয়ে আরও শক্তিশালী হবে। স্বাধীনতাই তোমার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ, এ সম্পদ রক্ষা করবার জন্য দুঃখ বরণ তো তুচ্ছ, মৃত্যু বরণও শ্লাঘনীয়। স্বাধীনতাই শুভ্র, স্বাধীনতাই উজ্জ্বল, স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের আদর্শ। যেমন করে হোক এর

দীপ্তি তোমাকে অম্লান রাখতে হবে। এ স্বাধীনতা কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, এ স্বাধীনতা সকলের। এ স্বাধীনতা চিরন্তন মনুষ্যত্বের শাশ্বত আদর্শকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বদা-পূজ্য বলে মনে করে, এর জন্যে যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকো—"

কবিরাই এ কথা নানা সুরে, নানা ভঙ্গীতে, নানা বর্ণে, গল্পে-উপন্যাসে, কাব্যে-নাটকে বারবার বলছেন। গণতন্ত্রের, স্বাধীনতার, মানবিকতার তাঁরাই সবচেয়ে বড় প্রচারক, সবচেয়ে বড় উপাসক। শুনে বিস্মিত হয়েছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এঁদের কণ্ঠরোধ করবার আয়োজন করছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিল, ১৯৬২ নামে একটি অস্ত্র নাকি তৈরী হচ্ছে। অতঃপর বাংলা দেশের নাট্যকাররা পুলিসের হুকুম না নিয়ে এবং অভিনয় করবার জন্য কিছু সেলামি না দিয়ে তাঁদের নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবেন না। কর্তৃপক্ষরা ভুলে গেছেন, যে স্বাধীনতার দৌলতে তাঁরা আজ উচ্চ গদিতে সমাসীন সে স্বাধীনতাকে বাস্তবে মূর্ত করতে বাংলা দেশের নাট্যকাররা কি করেছেন। এ দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। নাট্যকাররা চিরকাল স্বাধীনতার চারণ ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন। এ তাঁদের বিধিদত্ত অধিকার।

আমার শুধু একটি প্রশ্ন—গণতন্ত্রের উদগাতা এই কবিদের কণ্ঠ যে স্বাধীন গণতন্ত্র আইন করে রোধ করতে চায়, আধুনিক সভ্য সমাজে গণতন্ত্র বলে পরিচয় দেবার তার কি কোনও অধিকার আছে?

['ছত্রপতি শিবাজী রাজ্যারোহণ ত্রিশতাব্দী সমারোহ সমিতি'-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্তৃক ২২ জুন, ১৯৭৫ কলকাতার মহাজাতি সদনে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ]

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। সত্যিকথা বলতে কি কলকাতা শহরে সভার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি। এখানে আত্মোন্নতির জন্য সভা হয় না, হুজুগের জন্য সভা হয়। এখানে এসে যত সভায় যত মনীষীর বক্তৃতা শুনেছি তা যদি আমাদের চারিত্রিক উন্নতির সহায়ক হোতো তাহ'লে বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের ভিড় হয়ে যেত রাস্তায় রাস্তায়। তা হয়নি। এর উল্টোটাই হয়েছে। আমরা ক্রমশ ভ্রষ্টচরিত্র পশু হয়ে যাচ্ছি। আমরা জানি বক্তৃতা দিয়ে পশুকে মানুষ করা যায় না, ভাল সাহিত্য রচনা করাও যায় না, চোরারা ধর্মের কাহিনী শোনে না। সব সিদ্ধি যেমন সাধনাসাপেক্ষ তেমনি মনুষ্যত্ব লাভও সাধনাসাপেক্ষ। কিন্তু আমাদের দেশে মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্য কোনও প্রয়াস নেই, কোনও সাধনা নেই। আমাদের দেশে যখন প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন অগ্নিমন্ত্রের উপাসকেরা, তার আগে তাঁরা স্থাপন করেছিলেন অনুশীলন সমিতি যে অনুশীলন সমিতিতে দৈহিক উন্নতি, মানসিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা ছিল। অনুশীলন সমিতির নামও আজকাল অনেকে জানেন না। সে অনুশীলন সমিতির স্মৃতিরক্ষাকল্পে কোনও ব্যবস্থা আমাদের গভর্ণমেণ্ট করেন নি।

যে ছত্রপতি শিবাজীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তিনি ও তাঁর অনুগামীরা মনুষ্যত্বের অনুশীলন করেই বড় হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী রামদাসের শিষ্য। তাঁর পাতাকা ছিল গেরুয়া রঙের। তাঁর আদর্শ ছিল সমস্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে তিনি ধর্মপাশে বেঁধে মানবতার বিরাট মণ্ডপের তলায় সমস্ত ভারতবর্ষকে একত্রিত করবেন। তিনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর স্বপ্ন

কিন্তু সফল হয়নি। সমস্ত ভারতবর্ষকে একসূত্রে বেঁধেছিল ইংরেজ। তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য বেঁধেছিল, কিন্তু তাদের রাজত্বকালেই আমরা বিরাট ভারতবর্ষের স্বাদ পেয়েছিলাম। এখন আমাদের দেশ পশ্চিমবঙ্গ নামক ক্ষুদ্র ভূখণ্ড। এর বাইরে গিয়ে কোথাও আমরা স্বস্তি পাই না, আর কোথাও আমাদের সম্মানের আসন নেই। পশ্চিমবঙ্গেও আমরা পরস্পর খেয়োখেয়ি করছি। আমাদের শিক্ষামন্দিরে আগুন জ্বলছে। নানারকম ধাপ্পা, ভাঁওতা, জুয়াচুরির বিষাক্ত আবহাওয়ায় ভদ্র মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসছে। কারো ওপর কারো বিশ্বাস নেই। এ যেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে কংসের আমলের রাজত্ব। এই পরিবেশে ছত্রপতি শিবাজীকে আমরা স্মরণ করবার জন্য সমবেত হয়েছি। কি বলব? বলতে ইচ্ছে করছে—

ছত্রপতি মহারাজ হে শিবাজী বীর,
রচেছিলে যে আদর্শ
দেখেছিলে যে মহাস্বপ্ন
সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেছে বহুকাল আগে ;
সে আদর্শ চুরমার ভগ্ন।
মহিমার ভগ্নস্তূপে
অসহায় বসে আছি আজি,
তোমারে স্মরণ করি।
রক্ষা কি পাব মোরা
কহ কহ হে বীর শিবাজী?

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছে আমরা রকবাজী, ধাপ্পাবাজী, বোমবাজী, ফটকাবাজী, মিছিলবাজী প্রভৃতি নানারকম বাজী নিয়ে বাজীমাৎ করতে অভ্যস্ত। আমাদের মধ্যে শিবাজী কি মানাবেন? তাঁকে আমরা সম্যক মর্যাদা দিতে পারবো কি? যদি সত্যিই তাঁকে মর্যাদা দিতে চাই তাহলে আমাদের মানুষ হতে হবে, বীর হতে হবে। শুধু সভা করে তা হবে না।

জানি না আমার এ আবেদন কারো প্রাণে সাড়া তুলবে কি না।